সহরে প্রায় দশ হাজার হইতে বিশ হাজার অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে অসদভিপ্রায়ের জন্য রাখা হইয়াছে। Sppression of Immoral Traffic Act প্রবর্ত্তন করিয়াও আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাইতেছে না।"

অসহায় বালকদিগকে আশ্রয় দিয়া, অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষা দানে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবার প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে কিছু কিছু আছে; যদিও উহাদের সংখ্যা ও কার্য্যের প্রসারতা অতি অল্প। কিন্তু ঐ জাতীয় বালিকাগণকে আশ্রয় দিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান দেশে নাই বলিলেই চলে। এইরূপ একাধিক প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে প্রয়োজন। বাল্যাবধি যদি বালিকাগণ সৎসংসর্গ ও শিক্ষা লাভ করে তবে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের প্রভূত উন্নতি আশা করা যায়। 'পাতিতা' সমাজ-শরীরে কুষ্ঠব্যাধি বিশেষ। কুষ্ঠ রোগীর সন্তান-সন্ততিকে জন্মের পরই স্থানান্তরিত করিয়া সুস্থদেহা ধাত্রীর দ্বারা লালন পালন করাইলে শিশু-শরীরে মাতাপিতার রোগ কোনদিন প্রবেশ করে না—ইহা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত মত। সেইরূপ সামাজিক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মায়ের নিকট হইতে অতি শৈশবেই বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করিয়া নৈতিক স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে রাখিলে তাহারা সমাজের ব্যাধিবিশেষ বলিয়া আর গণ্য হইবে না।

কিন্তু, এইরূপ কার্য্যের ভার গ্রহণ করা—অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। নিরাশ্রয়া রমণীগণকে আশ্রয় দিবার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে বিষময় ফল দেখা গিয়াছে। এইরূপ একাধিক দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় কোন আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান পুরুষগণের দ্বারা পরিচালিত না হওয়াই উচিত। আশ্রম-কর্ম্মী ও আশ্রিতা উভয়ের পক্ষেই তাহা কল্যাণকর। অথচ পতিতা ও অনাশ্রিতা নারীগণের মানসিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য সহরে এবং দেশের সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানেরও অত্যন্ত আবশ্যক। অনেকের মতে, দেশের শিক্ষিতা নারীগণ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে ভাল হয়। মহিলাগণের দ্বারা পরিচালিত মহিলা-আশ্রম অপেক্ষা পুরুষ-পরিচালিত মহিলা-আশ্রমের অধিক সাফল্য কখনই আশা করা যায়

না। বাংলা দেশের কোন কোন ক্ষেত্রে আজকাল মহিলাকর্ম্মী দেখা যাইতেছে। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। দেশের বিদুষী মহিলাগণ যদি নিজ জাতির দুরবস্থার বিষয়ে সম্যক অবহিত হইয়া উহার অপনোদন মানসে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। যে সব ক্ষেত্রে কেবল মহিলাগণের দ্বারা কোন মহিলা-আশ্রম পরিচালিত হওয়া সম্ভবপর নহে, সে সব ক্ষেত্রে মহিলাকর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে পুরুষপরিচালকগণের সহিত শুধু তাঁহাদেরই আবশ্যক মত সম্পর্ক থাকিবে। আশ্রিতাগণের সহিত পুরুষকর্ম্মীর কোনরূপ সংস্রব না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অভিরামের গীতি

(এক)

এসো চলে এসো দ্রুত, সাকী সুধাপাত্রে তরঙ্গ তুলিয়া—
কণ্ঠে মোর আজি হলাহল তীব্র তেজে উঠেছে জ্বলিয়া।
জলধি-মন্থন-শেষ, ওগো, কোথাও সে পায় নাই স্থান!
কর মোরে মৃত্যুঞ্জয় তুমি করায়ে তোমার সুরাপান।
দেবতা চলিয়া গেছে ঘরে, দানব করেছে পলায়ন;
মাঝে ওই অলস আকাশে নাচিতেছে অশান্ত পবন।
নিশ্বাসের মৃদুল চুম্বনে, শান্ত কর শান্ত তারে প্রিয়া
নব জীবনের পাশে বসে এ যেন গো না যায় মরিয়া।

*

নিকটকে আরো কর কাছে, কেন ও-পঞ্জর ব্যবধান?
তোমার ও-পিয়ালায় ভরা কেঁদে ওঠে ভুল-ভরা গান।
শান্ত কর, শান্ত কর সাকী ফাঁকের এ নির্ম্মম পীড়ন;
দাও পাত্র, লও বক্ষ, কর প্রাণের স্পন্দন আচমন।
মৃদুগতি আরো কেন মৃদু? দুনিয়া ত আছে ঘুমাইয়া,
তোমার ও-পানপাত্র মাঝে কায় মন বচন সঁপিয়া!

ঘুমন্তের পেয়ালা গো ও-যে, কার ভয়ে চাও পাছু পানে ?
পূর্ণতায় পূর্ণ কর প্রিয়া এ পিয়ালা চুম্বনে চুম্বনে ।

*

লাজ-নত আঁখি দুটি আজি কি হেতু, কি হেতু ওগো প্রিয়া ?
বেঁধেছ ত আদর-অধরে দুনিয়াকে স্বপন সঁপিয়া !
ফিরে দাও বালকত্ব তারে, আজি এই জীবন-সন্ধ্যায়,
তব ওই পাত্রের সুধায় জাগন্ত করিয়া দুনিয়ায় ।
পান-আশে কৃপাপাত্র তব প্রতীক্ষায় রবনা গো আর,
প্রাণ মন এই তব করে দিতেছি দিতেছি উপহার ।
তোলো আঁখি আমি দেখি সাকী, মোর সঙ্গে দেখুক দুনিয়া
জীবন-প্রবাহ ছুটে চলে তোমার ও-পাত্রমধ্য দিয়া ।

*

চারিদিকে নাচে মুখরতা, মাঝে তুমি নীরব সুন্দর !
কি হেতু আকাশ-বেণু সাকী চুমিতেছে তোমার অধর ?
রহস্য কি রেখেছ লুকায়ে স্পন্দিত ও-হৃদয়ের ঘরে ?
কাহিনী কি এতই গোপন, চাপিয়া রেখেছ ওষ্ঠাধরে ?
দাও হাসি ভিক্ষা তারে সখি, পূর্ণ কর শূন্য হিয়া তার,
চলে যাক্ নীরব কাহিনী হেথা হ'তে সপ্তসিন্ধু পার ।
সুরা সুরা—এক বিন্দু সুরা, হে প্রাণদে, লও পাত্র হ'তে,
বেণু-মুখে কর গো নিক্ষেপ, ডুবে যাক' সপ্তসিন্ধু তাতে ।

*

বসন্তের নূতন আলাপ, পবনের লুকানো চুম্বন,
লতা-মুখে উঠেছে যে ফুটে মিলনের নগ্ন আবেদন !
তোমারে কি দেখেছে সজনি ? তোমারে কি দেখেছে পাপিয়া ?
বকুলের পত্র অন্তরালে— ঈর্ষায় ভরিল তার হিয়া ?
চোখ গেলো চোখ গেলো, তার, আর বুঝি বাঁচে না সে সাকী !
করুণার একবিন্দু দানে করগো লালিম তার আঁখি ।
বসন্ত ভিখারী তব দ্বারে অবশেষে তারে কর দান,
আর, যদি কিছু থাকে বাকি দাও সাকী, আমি করি পান ।

পণ্ডিত—শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

পূর্ব্বস্মৃতি

আজ ত্রিশ বছরের কথা। এই সবে মাত্র বরাহনগরের ভাঙ্গা বাড়ী থেকে মঠ আলমবাজার "ভূতের বাড়ীতে" উঠে এসেছে। স্বর্গীয় নাগ মহাশয় লেখককে শশী মহারাজ ও যোগীন মহারাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে দেশে চলে গেছেন। তখনকার মঠের একটু হালচাল বল্‌লে, অত্যুক্তি হবে না। অন্ততঃ আমি প্রথমটা যেমন দেখেছিলুম তাই কিঞ্চিৎ এখানে লিপিবদ্ধ কোরছি। মঠে তখন চাকর বা বামুন কেউ ছিল না। শশী মহারাজ ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন; কানাই মহারাজ হাটবাজার ও বাসনমাজা, যোগীন মহারাজ, হরি মহারাজ, সুশীল মহারাজ স্বামী প্রকাশানন্দ), আরো দুই একজন সাধু ব্রহ্মচারী ঘর ঝাঁট দেওয়া কুটনা কুটা, মসলা বাঁটা প্রভৃতি কাজ করতেন। লেখক যখন-যখন মঠে যেতো ও থাকতো, তখন শশী মহারাজের আদেশে সে হেঁসেলে গিয়ে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতো; শশী মহারাজ প্রাত্যহিক রান্নার কাজ থেকে একটু অব্যাহতি পেতেন।

লেখক মধ্যে মধ্যে কানাই মহারাজের সঙ্গে হাট বাজার করতো এবং কখনো বা তাঁর সঙ্গে সাধুদের উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে নিজেকে ধন্য মনে করতো। তখনো লেখক স্বামিজীকে দেখে নাই বা তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন তাও জানতো না। তখন স্বামিজী ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করছিলেন এবং তার কিছুদিন পরে আমেরিকা যান, একথা লেখক পরে মঠধারী সাধুদের প্রমুখাৎ শুনেছিল।

একদিন মঠে কানাই মহারাজ শিব মহিম্ন-স্তব পাঠ করছিলেন, লেখক একমনে শুনে বুঝতে পারলো, পাঠকের সংস্কৃত জ্ঞান তত নেই। কিন্তু তাঁর পঠনের একাগ্রতা দর্শনে লেখক বিস্মিত হয়ে গেল। শশী মহারাজ বলেছিলেন, ভাষাজ্ঞান না থাকলেও ভক্তের

একাগ্র হৃদয়ই ভগবান গ্রহণ করেন। এই বলে "অসিত গিরিসমং স্যাৎ" শ্লোকটি পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কিরূপে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন সেই গল্পটি বল্লেন। শশী মহারাজই তখন মঠকে জাগিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠা একাগ্রতা ও সেবা দর্শনে লেখক কখনো বিস্মিত হোত, কখনো বা মনে করতো, তাঁর মাথায় একটু ছিট্ আছে। কারণ এক ছিলিম্ তামাক সেজে ভোগান্তে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ছবির কাছে ধরে থাকা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে লেখকের মনে হোত। ক্রমে আসা যাওয়া করতে করতে লেখকের সেই ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং সে বুঝতে পারে, সেবা ও নিষ্ঠা এরূপ ঐকান্তিকতাতেই পূর্ণতা লাভ করে। তখনকার ঠাকুর-ঘরে আরাত্রিক দর্শনও উপভোগের জিনিষ ছিল। কয়েকজন বালসন্ন্যাসী, যাঁদের সম্বল বলতে কিছুই ছিল না, যাঁরা অন্নবস্ত্রাভাবে অদ্ধাশন ও প্রায় কৌপীন মাত্র সম্বল করেছিলেন, তাঁরা যখন "জয় জয় জয় গুরুদেব" রবে মঠ ও পল্লী মুখরিত করতেন তখন লেখকের মনে হোত, এঁরা দেবতা—মানবাকারে, এঁদের সঙ্গ দর্শন ও স্পর্শনে সত্য সত্যই মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সত্য সত্যই ঈশ্বরানু-রাগে হৃদয় উদ্বেলিত হয়। এমন সুখের দিন মঠে কত যে অতিবাহিত করা গেছে, তার স্মরণেও হৃদয় পবিত্র করে। মনে হয়, পূর্ব্বে এই সব সাধুদের সঙ্গ ও কৃপালাভ করাতেই পরে সাক্ষাৎ শঙ্কর স্বামিজীকে মন্ত্রগুরুরূপে পাওয়া গিয়েছিল। ঠাকুরের গৃহীভক্ত স্বর্গীয় সুরেশ দত্ত ও হরমোহন মিত্রের সঙ্গে লেখক অনেক সময় আলমবাজার মঠে যেতো। আবার যখন নাগ মহাশয় কলিকাতায় থাকতেন তখন লেখক তাঁর সঙ্গেই প্রায় দক্ষিণেশ্বর ও আলমবাজার মঠে যেতো। নাগ মহাশয়ের সঙ্গে মঠে যাওয়া এক আনন্দের ব্যাপার ছিল। ভাবাবেশে তিনি এখানে সেখানে পড়ে যেতেন, মঠের সাধুরা তাঁকে অতি সন্তর্পণে ধরে বসাতেন। নাগ মহাশয়কে দেখে কি আনন্দের উৎসই যে শশী মহারাজের হৃদয়ে বয়ে যেতে দেখেছি, তা বলতে পারি না। উভয়ে মুখোমুখী বসে "জয় গুরু জয় গুরু" বলতে বলতে সাশ্রুনয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে অবস্থান করতেন। ভাব ও ভাষা উভয়ের রুদ্ধ হয়ে যেত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় উভয়ে যেন

উন্মাদ হয়ে উঠতেন। আমি তখন সব ভাল বুঝতে পারতুম না। ক্রমে কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলুম।

মঠে তখন বিবেকচূড়ামণি পাঠ হোত। কালী মহারাজকে (স্বামী অভেদানন্দ) পাঠ করতে শুনেছি। তাঁর বেশ পাণ্ডিত্য ছিল। বিকালে শাস্ত্র পাঠ আলোচনা হোত। দুপুরে আহারের পর সকলে একটু বিশ্রাম করতেন। সকাল সন্ধ্যায় খুব জপ ধ্যানাদি চলতো। উপস্থিত সকলকেই তাতে যোগ দিতে হোত। গৃহী ভক্তদের মধ্যে গিরীশবাবু, অতুল বাবু, নব গোপাল বাবু, হুটকো গোপাল, নিতাই ডাক্তার, হরমোহন ও সুরেশবাবুকে মঠে মধ্যে মধ্যে দেখতে পেতুম, এঁরা মঠে কেউ রিক্তহস্তে যেতেন না। মঠে তখন সামান্য ডাল ভাত রুটির ব্যবস্থা ছিল। জুটলে মৎস্যও ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হোত,—নতুবা যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা। তখন এটি বেশ লক্ষ্য করতুম যে, ঠাকুরের ভোগরাগ যাই হোক্ না কেন, সাধুদের ভক্তিরসে প্রক্ষিপ্ত হয়ে তা অমৃতরসে পরিণত হোত। একদিন আমি না জেনে একটা পচা রুই মাছ শেয়ালদ থেকে কিনে মঠে নিয়ে যাই। শশী মহারাজ ও আমি একত্রে তার ঝুরি ভাজা করে ঠাকুরকে ভোগ চড়াই। সাধুরা তা খেয়ে মহা তৃপ্তি লাভ করেন। ভক্তি ও ভালবাসার এমন মহিমা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

মঠের সাধুরা তখন সকলেই গঙ্গাতে স্নান করতেন, কারণ তখন স্নানের অন্য কোন বন্দোবস্ত ছিল না। বিশেষতঃ যুবক সন্ন্যাসিগণ তখন ভক্তিবশতঃই হোক্ বা শারীরিক সুস্থতা সাধনেই হোক্ গঙ্গাস্নান সকলেই ভালবাসতেন। স্নানের ঘাটে বসে কত শাস্ত্র চর্চ্চা ও ঠাকুরের কত প্রসঙ্গই যে হোত তা বলবার নয়, কখন স্নান করতে গিয়ে দুঘণ্টাই হয় তো কেটে যেত। সকলেই যেন তন্ময়, আহার নিদ্রা ভুল হয়ে যেত। আলমবাজারের বাড়ীতে হরি মহারাজ একদিন একটি ভূত দেখতে পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে ফেরবার কালে তিনি দেখেছিলেন, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার পাশের নীচের ঘরে সে ঢুকে পড়লো। তাঁর নিজমুখে লেখকের ইহা শোনা। আর একদিন নাগ মহাশয়ও মঠে ভূত দেখেন, দেখবার পরে আমাকে

ঐ বিষয় বলেন। কিন্তু মঠের সাধুদের ঐ বিষয়ে দৃকপাত ছিল না। তাঁরা বল্‌তেন, "আমরা শিবের দানা—ভূত-প্রেত আমাদের আর কি করতে পারে?"

(ক্রমশঃ) শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ

অতীত ও বর্ত্তমান

অতীত

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতে বিভিন্ন ভাব ও শক্তির অপূর্ব্ব মিলনক্ষেত্ররূপে জগতের নিকট পরিচিত। আর্য্যঋষিগণের কার্য্যসমূহের ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক-যুগের গরিমাময় কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে সকলের মনে একটা অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। ধন্য বর্ত্তমান যুগের প্রতিভাশালী প্রত্নতত্ত্ববিদগণ, যাঁহারা অতীতের আঁধার যবনিকার অন্তরালে যে ঐতিহাসিক সত্য ও অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত ছিল তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া জগতের সম্মুখে উপহার প্রদান করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও রাজনীতি-রঙ্গমঞ্চে এমন চিত্তমুগ্ধকর বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল যাহার নিকট বর্ত্তমান যুগের আড়ম্বরবহুল সভ্যতাও তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হয়। প্রাচীন গ্রন্থ, মুদ্রা, তাম্রশাসন কিংবদন্তী ও পর্য্যটকগণের বিবিধ বিবরণী মন্থন করিয়া বহু বর্ষের প্রচেষ্টায় এক নূতন যুগের সন্ধান মিলিয়াছে, বিশ্ববাসী সে যুগের বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার চরমোৎকর্ষ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ বর্ত্তমান যুগের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না। ভারতের সনাতন নির্ম্মল ভাব-ধারা জাহ্নবীর পূতপ্রবাহের ন্যায় সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আজ পর্য্যন্ত জগৎময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, "Periplus of the Ærythrean sea." প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অতীতের বাণিজ্যবিস্তার ও শিল্পোৎকর্ষের জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি কিরূপ ভাবে প্রাচীন ভারতের শক্তিকেন্দ্র ছিল প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গভীর গবেষণার ফলে তাহাও আমরা আজ জানিতে পারিয়াছি। ভারত! কোথায় তোমার সেই বিশ্ববিমোহক অতুল কীর্ত্তিসৌধ, কোথায় ক্রান্তদর্শী একনিষ্ঠ সাধক-বৃন্দের চিন্তাপ্রসূত অমূল্য রত্নরাজি, যে রত্নভাণ্ডারের এক কণিকামাত্র লাভ করিয়া আজ তুমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছ। এই ভারত-তপোবনের মৌন গাম্ভীর্য্য ও বিচ্ছুরিত সুষমার মাঝে একদিন আর্য্যঋষি-গণের পূতকণ্ঠে বেদের অনাদি সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছিল, ষড়দর্শনের গভীর তত্ত্ব অজ্ঞানতিমিরান্ধ মানবকে জ্ঞানের উজ্জ্বল রাজ্যে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ভারতেই শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি রচিত হইয়াছিল, পণ্ডিতপ্রবর বাগভট্টের নরশরীরবিজ্ঞান, নাগার্জ্জুনের রসায়নশাস্ত্র ও উপবেদ সমূহ সমগ্র জগতের সম্মুখে ভারতমাতার আসন গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।

হায় 'প্রাচীন'! তুমি আজ 'নবীনের' বিশ্বগ্রাসী-উন্মাদনা দেখিয়া গভীর অন্ধকারে মুখ লুকাইতে বসিয়াছ। তোমার স্বরূপ, তোমার অপার্থিব সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়া আবার আমাদের নয়নের সম্মুখে দাঁড়াও, উৎসাহমথিত নবীনের এ প্রেম-অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোল।

হে 'নবীন'! প্রাচীনের কাছে আজ শুনিতে হইবে, তোমার স্বাধীনতার অপূর্ব্ব কাহিনী। পরাধীনতার তীব্র যন্ত্রনার মধ্যে মনে পড়ে সেই দ্বাদশ শতাব্দীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা, যে দিন হিন্দুস্বাধীনতার শেষ-সম্বল রাজপুতকুল-গৌরব পৃথ্বিরাজ তরায়ন-প্রাঙ্গণে চিরনিদ্রায় শায়িত হইয়াছিলেন। সে আজ বহু দিনের কথা। তারপর কত বর্ষ,

কত যুগ অতীতের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, কত বৈদেশিক শত্রু ভারতের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু জাতির সে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের করুণ-কাহিনী আজও ভারতবাসীর অসাড় প্রাণে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পলাশীর রণক্ষেত্রে এমনি করিয়াই একদিন শ্বেতকায় বণিকের নিকট ইস্‌লামের তথা ভারতের মস্তক অবনত হইয়াছিল, হিন্দু-মুসলমান আত্মকলহের উপযুক্ত প্রতিদান পাইয়াছিল।

বর্ত্তমান

বিংশ শতাব্দীর উপকূলে দাঁড়াইয়া আমরা বিগত জীবনের কত কার্য্যাবলী, জাতীয় ইতিহাসের কত নিবিড় ঘটনাপুঞ্জ নদীবক্ষে অফুরন্ত উর্ম্মিমালার মত একের পর এক নিরীক্ষণ করিতেছি। এই তোমার ভারতবর্ষ, যে দেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নাই, অস্ত্রআইনের কঠোর নিষ্পেষণে আত্মরক্ষোপযোগী সামান্য অস্ত্র রাখিবারও অধিকার নাই, আছে শুধু জাতির অস্থিকঙ্কালের উপর অভিজাতের অবাধ আনন্দোচ্ছ্বাস ও অপরিমিত ব্যয়বাহুল্য!

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে কত গণপতি উৎসব, শিবাজী উৎসব, বঙ্গভঙ্গের দিনে প্রবল জাতীয় উচ্ছ্বাস, দেশের কল্যাণকামনায় স্বাধীনতা-যজ্ঞের কত ব্রতীর অদ্ভুত আত্মবলিদান, কত 'সহযোগ', 'অসহযোগ', কত 'আধ্যাত্মিক নিরুপদ্রবতার' ঢেউ ভারতবক্ষের উপর দিয়া প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে; বর্ষার বারিধারার ন্যায় বক্তৃতামঞ্চ হইতে কত বাগ্মীর মধুর মিলনবাণী অবিরলধারে বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু সে ঢেউ ভারতবাসীর মর্ম্মদ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি-না সন্দেহ। তবে চারিদিকে জাগরণের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই জাতীয় জাগরণের দিনে—নবীনের এই নব অভিযানের দিনে ভারতগগন আত্মকলহমেঘে আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের এই জাতীয় দুর্ব্বলতায় পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খল আরও নিবিড় বেষ্টনে এই জাতিকে আলিঙ্গন করিবে। হে ভারত! সাম্যবাদের বাণীতে তোমার কর্ণে কখনও কি

মিলনের সুর বাজিয়া উঠিবে না ? চিত্তরঞ্জনের আজীবন কঠোর সাধনা, দেশনায়কবৃন্দের আত্মোৎসর্গ তোমার প্রাণে কি একটু সাড়াও দিবে না ? সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্রগণ্ডি ছাড়িয়া জাতীয়তার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর কি তোমার দেশমাতৃকার আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে না ? বীরাগ্রগণ্য কামালের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ তুর্কীরাজ্যের অন্যতম সেবক ইস্‌মেত পাশা জাতীয় ভাবের উন্মাদনায় বলিয়াছেন,—

"With us the idea of Fatherland is supreme. It lies at the bottom of all our decisions; it inspires all our efforts. Nationalism is what has saved Turkey. Nationalism is what has enabled us to carry out, down to its minimum details, our national Pact."

—'মাতৃভূমির কল্যাণকামনাই আমাদের সর্ব্বকর্ম্ম ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সমস্ত সিদ্ধান্তের মূলে সেই এক জন্মভূমির চিন্তা; জাতীয়তাই তুর্কীরাজ্যকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং দেশকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছে।'

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা কেমন করিয়া মানুষকে অন্ধ ও আদর্শভ্রষ্ট করিয়া ফেলে তাহা ভারতের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠেই সম্যক অবগত হইতে পারা যায়। আজ মুসলমানগণ হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারে, অথচ হিন্দু যদি মুসলমানকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করে, অথবা হিন্দু যদি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য 'সংগঠন' করে তবে হিন্দু, মুসলমানের বিরক্তিভাজন হয়। ধর্ম্মের নামে এরূপ অসাম্য অনুদার ভাব কি করিয়া সম্ভব! ১৯২০ সালের মোপলাবিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া কোহাট ও বর্ত্তমানে কলিকাতায় উপর্য্যুপরি যে দাঙ্গাহাঙ্গামার বীভৎস অভিনয় হইয়াছে তাহা স্মরণ করিতেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। শুধু প্যাক্ট বা প্রাণহীন বক্তৃতায় আত্মকলহপর এ দুই জাতি একতাসূত্রে গ্রথিত হইবে না। যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ দেশের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"Men, men,—these are wanted, when you have men, who

are ready to sacrifice their everything for the Country, and sincere to the backbone, India will become great in every respect. A hundred thousand men and women fired with the zeal of holiness, fortified with eternal faith in the Lord and nerved to lion's courage by their sympathy for the poor and the down-trodden, will govern the length and breadth of the land, preaching the gospel of salvation, gospel of social raising up—the gospel of equality.'

—'বর্ত্তমানে দেশে খাঁটি মানুষের বড়ই অভাব। যেদিন দেশে এমন লোক জন্মগ্রহণ করিবে যাহারা দেশের কল্যাণকামনায় নিজ স্বার্থ বলি দিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না, সেই দিন ভারত পুনঃ আপন গৌরবমণ্ডিত আসন অধিকার করিবে। যখন দেশে এক লক্ষ নরনারী অটল ভগবদ্ভক্তি ও পবিত্র চিন্তার দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরিয়া সিংহবিক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবে, যখন তাহাদের হৃদয় নিপীড়িত ও দুর্ব্বলের করুণ আর্ত্তনাদে সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিবে তখন তাহারাই দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুক্তির শাশ্বত-বাণী ও সমাজের উচ্চ আদর্শ সর্ব্ব-সমক্ষে ধরিয়া দেশকে শাসন করিতে সমর্থ হইবে।'

হে সাধক! নব জাগ্রত গণবিগ্রহের এই নব অভিযানের দিনে—কে কোথায় আছ, বুকভরা জ্বালা লইয়া ছুটিয়া এস! আজ এই গভীর আর্ত্তনাদের মধ্যে সাম্যবাদ ও প্রীতির অমিয়গাথায় ভারতের প্রতি জীর্ণ কুটীর মুখরিত করিয়া তোল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ সিকদার এম্, এ,

আপেক্ষিক মাধ্যাকর্ষণ

(Relativity & Gravitation)

'It is an old maxim of mine that when you have excluded the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth'—Sir A. Conan Doyle 'The Adventures of Sherlock Holmes'

স্যার আইজাক নিউটন (Sir Isaac Newton) মাধ্যাকর্ষণ শাস্ত্রের (*Law of Universal Gravitation*) আবিষ্কর্ত্তা। কবি আলেকজেণ্ডার পোপ লিখিয়াছেন—

> Nature and Nature's laws lay hid in the night
> God said, 'Let Newton be' and all was light.

প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-রাজ্যের নিয়মাবলী লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, ভগবান বলিলেন, 'নিউটন জন্মগ্রহণ করুক' এবং সকল অজ্ঞানের অবসান হইল।

জার্ম্মান জ্যোতিষী কেপলার (Kepler) গ্রহদের চলন সম্বন্ধে তিনটি নিয়ম (laws) আবিষ্কার করেন *। প্রথমতঃ, সকল গ্রহই ডিম্বাকৃতি-পথে (Elliptical Orbit) সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে। দুইটি আলপিন ও এক গাছা সূতার সাহায্যে অতি সহজে এই পথ আঁকা যায়।

* কেপলারের তিনটি নিয়ম ইংরাজীতে প্রদত্ত হইল :—

1. The orbit of the planet round the Sun is an ellipse in one focus of which the centre of the Sun is situated.

2. The radius vector drawn from the centre of the sun to the planet, sweeps over equal areas in equal times.

3. The squares of the periodic times of two planets have the same ratio as the cubes of their mean distances from the sun.

সুতা আলপিন দুইটিতে শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে; আলপিন দুইটি —পরস্পর হইতে কিছু দূরে, অথচ যাহাতে সুতার উপর কোন টান না পড়ে,—কোন সাদা কাগজে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া একটি পেন্সিল দ্বারা সুতাকে খুব শক্ত করিয়া আলপিনের চারিদিকে ঘুরাইলেই ঐ পথ অঙ্কিত হইবে। যেই দুই স্থানে পিন দুইটি আবদ্ধ ছিল, উহাকে উপকেন্দ্র (focus) কহে, এবং সূর্য্য ঐরূপ একটি উপকেন্দ্রে আছে। কেপলারের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে, গ্রহ যত সূর্য্যের কাছে থাকিবে তত দ্রুত চলিবে ও যত দূরে থাকিবে তত মৃদু চলিবে। তৃতীয়তঃ, গ্রহদের সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে যত সময় লাগে, ঐ সময়ের বর্গফল (Square of the time), সূর্য্য হইতে গ্রহের মাঝামাঝি দূরত্ব যাহা হয়, উহার ঘনফলের (Cube of the mean distance) উপর নির্ভর করে।

১৬৫৫ খৃঃ অব্দে স্যার আইজ্যাক নিউটন এক উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছিলেন; তখন তাঁহার বয়স তেইশ বৎসর; এমন সময়ে বৃক্ষ হইতে একটি আপেল ফল ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলটি কেন মাটীতে পড়িল, এই সমস্যা সমাধান করিতে যাইয়া তিনি আকর্ষণ-শাস্ত্র আবিষ্কার করেন। ইহাতে তাঁহার কুড়ি বৎসর সময় লাগিয়াছিল তিনি যখন আপেল ফলকে মাটীতে পড়িতে দেখিলেন তখন হইতে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, পৃথিবীর আকর্ষণে ফল মাটীতে পড়ে, আমরা যদি লম্ফপ্রদান করি তবে আমরাও মাটীতে পড়িয়া যাই; পৃথিবী হইতে দূরে যাইলেও কি আকর্ষণ সমান থাকিবে?— এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিউটনের চন্দ্রের কথা ও সঙ্গে সঙ্গে কেপলারের তিনটি নিয়মের কথা মনে হইল।

১৬৭৯ খৃঃ অব্দে রয়েল সোসাইটীর (Royal Society) সম্পাদক হুক (Hooke), নিউটন তাঁহাদের সভায় কিছু পড়িবেন কি-না জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। নিউটন উত্তরে জানান যে, তিনি, পৃথিবী মেরুদণ্ডে ঘোরে এই বিষয়ে কিছু বলিবেন। গ্যালীলিও (Galeleo) পিসার উচ্চ স্তম্ভ (Leaning tower at Pisa) হইতে দুইটি জিনিষ—একটি ভারী ও অপরটি হাল্কা—ফেলিয়া দেখান যে ভারী ও হাল্কা জিনিষ

একই উচ্চ স্থান হইতে মাটীতে পড়িতে একই সময় লাগে। ইহাতে এ্যারিষ্টটলের (Aristotle) মতবাদ, যে উচ্চ স্থান হইতে পড়িতে ভারী জিনিষের হাল্কা জিনিষের চেয়ে কম সময় লাগে—খণ্ডিত হইয়াছিল। নিউটন বলিলেন, কোন জিনিষ উচ্চ স্তম্ভের উপর হইতে ফেলিলে উহা ঠিক স্তম্ভের পাদমূলে (base of the tower) না পড়িয়া, কিঞ্চিৎ দূরে পড়িবে এবং উহা হইতে পৃথিবীর ঘুরিবার কথা প্রমাণিত হইবে।

হুক বলিলেন, তিনি কেপলারের তৃতীয় নিয়ম হইতে গ্রহেরা ডিম্বাকৃতি পথে ঘোরে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন ; এবং নিউটন উহা না জানায় তাঁহাকে অনুযোগ করিলেন। হুক উহা প্রমাণ করিয়াছিলেন, একথা কেহ স্বীকার করে না, কিন্তু নিউটন হুকের অনুযোগে অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং নিজেই সম্পূর্ণভাবে এই প্রশ্নের সমাধান করিলেন, কিন্তু তিনি উহার ফল প্রকাশিত করেন নাই। নিউটনের চরিত্রে ইহাই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি আলোকশাস্ত্র (Optics) ব্যতীত কোন গ্রন্থই নিজে প্রকাশিত করেন নাই, অন্যান্য সব গ্রন্থ তাঁহার বন্ধুরা বিশেষ অনুরোধপূর্ব্বক প্রকাশিত করেন।

১৬৮৫ খৃঃ অব্দে অক্সফোর্ড (Oxford) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডমাণ্ড হ্যালি (Edmund Halley) সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী ঘুরিতেছে কি-না জানিবার নিমিত্ত নিউটনের নিকটে গমন করেন। নিউটন উহা প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন জানিয়া হ্যালি খুব সুখী হন। নিউটন পূর্ব্বের প্রমাণ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া আবার নূতন প্রমাণ করিয়া হ্যালির নিকটে পাঠাইয়া দেন। ইতিমধ্যে হ্যালি এই আনন্দ সংবাদ রয়েল সোসাইটীতে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্তও নিউটন দূরত্ব কি ভাবে মাপিতে হইবে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। হ্যালির আগমনে ও পুনঃ পুনঃ উৎসাহে তিনি সত্বর উহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম * এইভাবে বলা যাইতে পারে :—

* Newton's Law of Universal Gravitation :—

দুইটি বস্তুর আকর্ষণী-শক্তি (attractive force) তাহাদের বস্তু সমষ্টির (mass) গুণফলের (product) উপর নির্ভর করে (varies) এবং তাহাদের দূরত্বের বর্গফলের (square of the distance) উপর বিপরীতভাবে (inversely) নির্ভর করে। *

দুইটি বস্তুর দূরত্ব তাহাদের কেন্দ্র (centre) হইতে মাপিতে হইবে।

নিউটনের আকর্ষণের নিয়মে কেবল দূরত্ব (distance) গণনা করা হয়, সময়ের (time) কোন হিসাব নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়মে দূরত্ব ও সময় উভয়েরই হিসাব থাকা প্রয়োজন। জ্যোতিষশাস্ত্রে আমরা বিভিন্ন প্রকৃতির গতির কথা আলোচনা করিয়া থাকি; এবং গতিতে সময় ও দূরত্ব উভয়ই আছে। নিমন্ত্রণস্থলে ব্যক্তিরা একটি গতিতে আসিয়া সমবেত হয়; যে স্থানে সঙ্গীত হয়, তথায় সঙ্গীত-ধ্বনির একটি গতি আছে; সেইরূপ একটি বস্তু যখন আর একটি বস্তুকে আকর্ষণ করে, তখন একটির আকর্ষণী-শক্তি (The force of Gravitation) অপরটিতে নির্দ্দিষ্ট গতিতে আসিয়া পৌঁছে। শেষোক্ত গতি খুব বৃহৎ এবং ঐ কারণে নিউটনের নিয়মে সময়ের কথা না থাকিলেও উহা খুব বেশী ভুল নয়।

আকর্ষণী-শক্তি আলোকের গতিতে অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। সূর্য্যের আকর্ষণ পৃথিবীতে পৌঁছিতে ৮ মিনিট সময় লাগে। নিউটন এই ৮ মিনিট সময়ের কোনও হিসাব করেন নাই। আকর্ষণ পৌঁছিতে যে সময় লাগে ইহা নিউটন জানিতেন না। জার্ম্মাণ-দার্শনিক আইনষ্টিন (Einstein) আজ মাত্র বারো বৎসর পূর্ব্বে এই বার্ত্তা ঘোষণা করেন।

আকর্ষণী-শক্তি এবং আলোকের গতি একই এবং ইহার একটি বিশেষ সত্তা আছে। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যত ইচ্ছা, তত বেশী গতি কোন দ্রব্যে থাকিতে পারে। জাহাজ খুব দ্রুতগতিতে

* Every particle of matter attracts every other particle with a force varying directly as the product of their masses and inversely as the square of the distance between them.

চলে, রেলগাড়ী জাহাজের চেয়েও দ্রুতগতিতে চলে, হংসযান (aeroplane) আবার রেলগাড়ীর চেয়েও দ্রুত চলে ; এইরূপ তুলনা করিলে হয়ত আমরা মনে করিতে পারি এমন কোন জিনিষ আছে, যাহা আলোকের চেয়েও দ্রুতবেগে চলিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, কোন বস্তুই আলোকের চেয়ে দ্রুতগতিতে চলিতে পারে না ; এই বিষয়ে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, সকলই বিফল হইবে ; এমন কি কোন আপেক্ষিক গতি (relative speed) আলোকের চেয়ে বেশী হইবে না। মনে করুন, দূরস্থিত নক্ষত্রেরা আলোক-রশ্মিকে দূতরূপে পাঠাইয়া দেয়। আমরা মনে করিতে পারি যে নক্ষত্রের দিকে দৌড়াইয়া গেলে আমরা শীঘ্র সংবাদ পাইব। কিন্তু আমরা যতই দৌড়াই না কেন আলোকরশ্মি পৌঁছিবার গতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না, সুতরাং আমাদের কোনই লাভ হয় না। আবার হয় ত মনে করিতে পারি যে নক্ষত্র হইতে দূরে সরিয়া গেলে, আলোকরশ্মি দেরীতে আসিয়া পৌঁছিবে ; কিন্তু আমরা যতই পশ্চাতে সরিয়া যাই না কেন, আলোকরশ্মি ঠিক একই সময়ে আসিয়া পৌঁছিবে।

পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা ধারণা করা খুব শক্ত। কিন্তু আইনষ্টিনের পূর্ব্বে দুইজন আমেরিকান পদার্থ-তত্ত্ববিদ মাইকেলসান এবং মর্লে (Michelson and Morley) ইহা পরীক্ষা দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। তাহারা এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি আলোককে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন পথে আলোক প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহাতে আলোক পৃথিবী হইতে বাহিরে যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। কখনও তাঁহারা এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাহাতে পৃথিবীর সঙ্গে যাইয়া আলোককে অগ্রে গ্রহণ করিতে পারেন, আবার কখন আলোক এই ভাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাহাতে পৃথিবীর গতি অনুসারে যে স্থানে আলোক ফিরিয়া আসিবার কথা আমরা তথা হইতে আরও দূরে চলিয়া যাইব ; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে আলোক ঠিক একই সময়ে গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

মাইকেলসান এবং মর্লের উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁহারা পৃথিবীর যথার্থ গতি (Absolute speed) নির্দ্ধারণ করিবেন। আমরা জানি যে, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে; কিন্তু সূর্য্যও স্থির নাই, সূর্য্যও গ্রহ ও উপগ্রহদের লইয়া নক্ষত্রের মধ্যে চলিতেছে। নক্ষত্রেরাও সূর্য্যকে সঙ্গে লইয়া চলিতে পারে। সুতরাং দেখিতে পাই যে, এই বিশ্বচরাচরে যাহা কিছু আছে, কিছুই স্থির হইয়া নাই। তবে এমন একটি জিনিষ আছে—অবশ্য উহাকে জিনিষ বলা যায় কি-না সন্দেহ—যাহা খুব সম্ভবতঃ স্থির হইয়া আছে। ঐ জিনিষটি হইতেছে ব্যোম (ether) এবং উহার সাহায্যে (as a medium) বিভিন্ন নক্ষত্র হইতে আলোক আসিয়া পৌঁছায়। ব্যোম (ether) যদি সত্যসত্যই স্থির হইয়া থাকে তবে উহার সহায়তায় পৃথিবীর যথার্থ গতি এবং উহা হইতে সূর্য্যের ও নক্ষত্রের যথার্থ গতি নিরূপণ করা যাইবে—মাইকেলসান ও মর্লে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহাতে জ্যোতির্বীরা বিস্মিত ও নিরাশ হইয়াছিলেন। তখন আইনষ্টিনের মনে এই মহৎ চিন্তার উদয় হইল—'আচ্ছা, এই নৈরাশ্যকেই নূতন জ্ঞান-রূপে গ্রহণ করা যাউক। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, জগতে এমন কিছু আছে যাহা করিতে পারি না; আমরা কেবল আপেক্ষিক গতিই (Relative motion) নির্দ্ধারণ করি,—পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, সূর্য্য নক্ষত্রদের মধ্যে চলিতেছে; কিন্তু পৃথিবী বা সূর্য্য বা নক্ষত্রদের যথার্থ গতি (Absolute motion) আমরা নিরূপণ করিতে পারি না। আমরা কেবল আপেক্ষিকত্বই শিক্ষ করিতে পারি (We can learn about relativity only)।" এইরূপে তিনি আপেক্ষিকত্ব (Principle of relativity) প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ঐ বাদ বিজ্ঞানজগতের চিন্তারাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ঐ বাদের ফলে অনেক পুরাতন জিনিষ আমরা নূতন ভাবে দেখিতে শিখিয়াছি। আইনষ্টিন তাঁহার বাদের পরীক্ষাস্বরূপে তিনটি জিনিষের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং উহারা যদি সত্য বলিয়া

প্রমাণ না হইত তবে আপেক্ষিকত্ব-বাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত ; কিন্তু ঐ তিনটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ—আইনষ্টিন বলিয়াছিলেন যে, যখন আলোক, সূর্য্য বা অন্য কোন বৃহৎ বস্তুর নিকট দিয়া যায়, তখন সূর্য্য বা অন্য কোন বৃহৎ বস্তুর আকর্ষণের ফলে, আলোকরশ্মি বাঁকিয়া যাইবে। আলোক যদি ধূমকেতুর ন্যায় কোন জিনিষ হইত, তবে উহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই ছিল না। ধূমকেতু (comet) যখন সূর্য্যের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, তখন উহার পথ ভয়ঙ্কর ভাবে বাঁকিয়া যায়। নিউটন মনে করিতেন যে, আলোকরশ্মি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাকার বর্ত্তুল-বিশেষ (little corpuscles) ; কিন্তু পরবর্ত্তী পদার্থতত্ত্ববিদেরা নিউটনের মতকে ভ্রম বলিয়া প্রমাণ করেন এবং দেখান যে, আলোক—ব্যোমে ক্ষুদ্রতরঙ্গ সমষ্টি (little waves in ether)। নিউটনের মত গ্রহণ করিলে আলোকরশ্মি সূর্য্যের পার্শ্বে বাঁকিয়া যাইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি ; কিন্তু আইনষ্টিন নিউটনের মত সমর্থন করিলেন না। তিনি অঙ্ক কষিয়া দেখিলেন যে, নিউটনের মতানুসারে, আলোক রশ্মির যতটা বাঁকিয়া যাইবার কথা, আলোকরশ্মি বস্তুতঃ তাহার দ্বিগুণ বাঁকিয়া যাইবে।

স্যার উইলিয়াম হর্শেল (Sir William Herschel) দূরবীক্ষণ সাহায্যে ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন। ইউরেনাস গ্রহের এলো মেলো চলন দেখিয়া এডামস্ (Adams) ও লিভেরার (Leverrier) বলিয়াছিলেন, "যদি এলো-মেলো চলন অন্য কোন গ্রহের আকর্ষণের ফলে হইয়া থাকে, তবে আকাশে অমুক সময়ে অমুক স্থানে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।" জ্যোতিষীরা নির্দ্দেশ মত খুঁজিয়া নূতন গ্রহের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ঐ গ্রহের নাম নেপচুন। সেইরূপ আইনষ্টিনও বলিয়াছিলেন, "আলোকরশ্মি সূর্য্যের পার্শ্ব দিয়া যাইতে এতটা বাঁকিয়া যাইবে। আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" জ্যোতিষীরা দেখিলেন, উহা সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা ততটা সহজ ছিল না। আকাশের যে স্থানে সূর্য্য আছে, ঐ অংশের কোন দূরবর্ত্তী

নক্ষত্র হইতেই আলোকরশ্মি সূর্য্যের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবে ; কিন্তু সাধারণতঃ দিনের বেলায় সূর্য্যের জ্যোতিতে উহার নিকটবর্ত্তী কোন নক্ষত্র দেখা যায় না। সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময়ে যখন সূর্য্যের অবয়ব (the disc of the sun) চন্দ্রের দ্বারা আবৃত হয় তখনই আইনষ্টিনের কথা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইউরোপে যখন মহাসমর চলিতেছিল, তখন আইনষ্টিন তাঁহার আপেক্ষিকতত্ত্ববাদ আবিষ্কার করেন। তথাপি জ্যোতিষীরা চুপ করিয়া রহিলেন না। ১৯১৯ খৃঃ অব্দের সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ ঐ পরীক্ষার উপযুক্ত সময় বলিয়া বিবেচিত হইল। ইংল্যাণ্ডে কমিটী বসিল এবং ইতিমধ্যে যুদ্ধ থামিয়া যাইবে এই আশায় আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজ-জ্যোতিষী (Astronomer Royal) এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডিংটন (Professor Eddington) এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা হইলেন। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে মহাসমর স্থগিত হইল এবং জ্যোতিষীদের আনন্দের সীমা রহিল না। যে স্থান হইতে গ্রহণ ভাল-ভাবে দেখা যাইবে তথায় বিজ্ঞান অভিযান প্রেরিত হইল। যাত্রার পূর্ব্বে এডিংটন বলিয়াছিলেন, "এই অভিযানের ফল যাহাই হউক না কেন, তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। যদি আইনষ্টিনের কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে আমরা নূতন জ্ঞান লাভ করিব। আলোকরশ্মি যতটা বাঁকিয়া যাইবে বলিয়া আইনষ্টিন ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, আলোকরশ্মি যদি তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণে বাঁকিয়া যায়, তবে আমরা নিউটনের মত সত্য বলিয়া জানিতে পারিব। আবার আলোকরশ্মি যদি মোটেই না বাঁকে তবুও দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। মাইকেলসান এবং মর্লে পৃথিবীর যথার্থ গতি নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বিফলতা হইতেই আপেক্ষিকতত্ত্ববাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই বিশ্বরাজ্যের কত জিনিষ আমরা নূতনভাবে দেখিতে শিখিয়াছি।" ১৯১৯ খৃঃ অব্দের অভিযানের ফলে আইনষ্টিনের কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল।

এই অভিযানের ফলে আমেরিকাবাসীরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে

পারিলেন না। এমন কি প্রেসিডেন্ট কেম্পবেলও (President W. Campbell) আশা করিয়াছিলেন যে, আইনষ্টিনের মতবাদ ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ("He hoped that Einstein would be wrong") ১৯২২ খৃঃ অব্দে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া মহাপ্রদেশে সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরিত হইল। গ্রহণের কয়েক মাস পূর্ব্বে আমেরিকায় হনলুলু (Honululu) প্রদেশে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি নক্ষত্রের বিশেষ ফটোগ্রাফ (check plates) লওয়া হইল। যাহা হউক এই অভিযানের ফলে আইনষ্টিনের মতবাদ আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয়তঃ—বুধগ্রহের (Mercury) চলন সম্বন্ধে আইনষ্টিন সর্ব্ব প্রথমে এক যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মনে করুন, সৌরজগতে বুধ একমাত্র গ্রহ। এখন নিউটনের নিয়মানুসারে বুধগ্রহ সূর্য্যের আকর্ষণের ফলে অনন্ত কাল ধরিয়া একই ডিম্বাকৃতি পথে (elliptical orbit) চলিবে ; কিন্তু আইনষ্টিনের নিয়মানুসারে ঐ ডিম্বাকৃতি পথ ক্রমশঃ বাঁকিয়া যাইবে। অবশ্য, অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণের ফলেও ঐরূপ হইবে ; কিন্তু সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণের ফলে কতটা বাঁকিয়া যাইবে তাহা অঙ্ক কষিয়া নির্ণয় করা যায়। বুধগ্রহের পথ প্রতিবৎসর যতটা বাঁকিয়া যাইতেছে, তাহা উল্লিখিত ভাবে যতটা বাঁকিয়া যাওয়া উচিত, তদপেক্ষা অনেক বেশী। জ্যোতিষীরা এই আধিক্যের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন নাই। জ্যোতিষীরা বলিতেন, বুধ ও শুক্রের মধ্যে উল্কাপুঞ্জ (ring of meteors) থাকায় ঐরূপ ঘটিতেছে। কিন্তু আইনষ্টিন তাঁহার আপেক্ষিকতত্ত্ববাদ হইতে প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

একটি লোক সুদ বিষয়ে কিছু জানিতেন না, তবে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে নষ্ট হইবার ভয় নাই দেখিয়া নিয়মিত টাকা গচ্ছিত রাখিতেন এবং প্রয়োজন হইলে টাকা উঠাইয়া লইতেন। বৎসরের শেষে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার যত টাকা থাকা উচিত তদপেক্ষা ১৩ টাকা ৭ আনা ৮ পাই বেশী আছে। তিনি ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, অবশেষে মনে করিলেন যে, কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কৃপা-

পরবশ হইয়া তাঁহাকে উল্লিখিত অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধু উহা অবগত হইয়া তাঁহাকে সুদের নিয়ম বুঝাইয়া দেন। বুধ গ্রহ সম্বন্ধেও জ্যোতিষীরা ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আইনষ্টিন ঐ ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন।

তৃতীয়তঃ—বর্ত্তমান পদার্থতত্ত্ববিদেরা বলেন, ব্যোমে (ether) আলোকতরঙ্গ (light waves) প্রকম্পন (vibration) সৃষ্টি করে এবং উহা হইতেই আলোকের উৎপত্তি। আইনষ্টিন বলিলেন যে, সূর্য্যের ন্যায় কোন বৃহৎ বস্তুর নিকটে আলোকের প্রকম্পন সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা সহজ ব্যাপার নহে, এবং প্রথমে অনেকেই ইহাতে বিশেষ সন্দিহান ছিলেন। আইনষ্টিনের বিরুদ্ধবাদীরা উহা মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করেন কিন্তু আইনষ্টিনের সমর্থকেরা বলিতেন, ঐরূপ সন্দিহান হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। আইনষ্টিন বলিলেন, অপর দুইটি যেরূপ সত্য হইয়াছে, তৃতীয়টিও ঐরূপ সত্য হইবে। অবশেষে একজন ইংরাজ অধ্যাপক এভারশেড (Evershed) উহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করেন।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র বি, এ ; বি, এস-সি

হরি-কীর্ত্তন

হরি-কীর্ত্তনে যে সদা নিলীন নর-দেহে নব জনম তার,
লুটে সে ধরায় তৃণ হ'তে দীন বৈষ্ণব-পদ করে সে সার।
নিন্দা রোষের বজ্র-পতন বুক পাতি ধরে বিটপী প্রায়,
ভুলি' নিজমান করে মান দান উচ্চ তুচ্ছ সবারি পায়।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

জাগ্রত

৭

আমরা দরিদ্র

অনেকেই বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা অধিক ক্ষেত্রে (কালেজী) লেখাপড়া ছাড়িয়া একবার চাকুরী ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে আর পড়াশুনার চর্চ্চা রাখিতে চান না। যাহা শিখিয়াছিলেন ফলে তাহাও ভুলিয়া যান। ইউরোপাদিতে এমনটি ঘটে না। সেথানে দুধের কারবারীকেও কিছু কিছু দর্শন বিজ্ঞান আলোচনা ও আধুনিক আবিষ্কারাদির খবরাখবরী রাখিতে দেখা যায়। শুনিয়াছিলাম, জাপানে এক রিক্‌সা-ওয়ালা, একজন ভারতাগত অধ্যাপকের সহিত বিরাম সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহা অবশ্যই সুন্দর। আমাদের ভিতর যাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবকাশ সত্ত্বেও বিদ্যাচর্চ্চা করেন না তাঁদের আচরণ মহনীয় নহে নিশ্চিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কঠোর দারিদ্র্যই যে এমন অবস্থা ঘটাইয়াছে তাহা সত্য ভদ্রশ্রেণীর কথা তো ছাড়িয়াই দাও। যখন ঘরভরা ছেলেপিলে আদালত প্রত্যাগত মক্কেলবিহীন উকীলবাবুর ঘাগরা ধরিয়া 'উঃ বাবা গো, কি খাবো—আমার রুটী খেলে যে পা কামড়ায়' (লুচি মঞ্জুর করাইবার জন্য বালকের ধূর্ত্ততা) বলিয়া মমতার বায়না ধরে তখন অলক্ষিতে বাবার শুষ্ক কাষ্ঠচক্ষু ফাটিয়া সমবেদনার জল ঝরিতে থাকে। বাবা যে কোন কালে কালেজে সেক্সপীয়র মিলটনের নাট্য কাব্য কথা পড়িয়া রসচর্চ্চা করিয়াছিলেন তখন সে স্মৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃতিপথে চলিয়া যায়। পুরাতন বিদ্যা ঝালাইবার কথা তো বহুদূরের অলীক কল্পনা।

তারপর নিম্নশ্রেণীদের কথা ধরা যাক্। যারা যুগ যুগ ধরিয়া শিল্পাদি বিদ্যায় পুরুষানুক্রমে আত্মনিয়োগ করিয়া উৎকর্ষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল আজ আর তাহাতে পেট চলে না বলিয়া তাহারা ক্রমশঃ

ক্রমশঃ ঐসব অনুশীলন ছাড়িয়া দিতেছে। পাট কাচিলে অথবা দিন-মজুরীতে লিপ্ত হোলে কাঁচা নগদ পয়সা পাওয়া যায়। সব ধনী ব্যবসায়ী চারিধারে চার ফেলিয়া রাখিয়াছেন। দশ বিশ পঞ্চাশ দাদন দিবার অতুল গাঁটের জোর তাঁহাদের। চাকুরীতে নগদ বিদায়। প্রবাহ যে ভাবে চলিয়াছে তাহাতে চর্চ্চা অভাবে দু এক পুরুষের ভিতর শিল্প-সুকুমার বোধ-বুদ্ধি বিলোপ হইবার উপক্রম। সমঝদার উৎসাহী জমিদার ধনীর দল, যাঁদের বাঁধা শিল্পী কবি গায়ক বংশানুক্রমে জমি জাইগীরদত্ত নিযুক্ত থাকিত তাঁহারা আজ এই সবে উদাসীন। সম-কক্ষের সহিত টক্কাটক্কি দিবার জন্য সংসদে যাইবার অভিলাষে তাঁরা সর্ব্বস্বান্ত হইতে প্রস্তুত। মামলায় বিপক্ষকে বিপদগ্রস্ত নির্য্যাতিত অপমানিত করিতে উদ্যত হইয়া ঝোঁকের উপর পাঁচজনের প্ররোচনায় দুচার খানা মৌজাকে মৌজা বেচিয়া ফেলিতে ত্বরিতপদে আগুয়ান। শিষ্ট-অনুমোদিত আজব কলিকাতা সহরের গড়ের মাঠের ঘোড়দৌড়ের জুয়ার নেশায় বা 'ডারবির' টিকিটে টোক থেকে চুপে চুপে অনেকে হাজার হাজার টাকা গচ্চা দিতেছেন। এই সব ব্যয়ের হিসাবও খুব উচ্চ অঙ্কের পরিচয়। উড্রদেশে নর্ত্তনরসশিল্পের কি উৎকর্ষ হইয়াছিল তাহার আভাস আজকার শ্রীক্ষেত্রে "এমার" ও অন্যান্য মঠে অনুষ্ঠিত ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে 'নাটুয়া পিলার' নাচ দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে বলা বাহুল্য এই বিদ্যার অভ্যাস পেটে ভাত না থাকিলে হয় না। কারণ, মনের স্বচ্ছন্দতা স্ফূর্ত্তি—সঞ্চিত উপচিত আনন্দের বহিঃপ্রকাশই ভাস্কর্য্য নর্ত্তন ছন্দ গান চিত্রণবিদ্যা। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রদর্শিত পাশ্চাত্যের 'ডেনিসন্ ডান্স' দেখিয়া যাঁহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে 'রুধির' ব্যয় করিয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছেন তাঁহারা দেশীয় অনুরূপ সুকুমার শিল্পকে জাগাইবার জন্য কতদূর উৎসাহী, তাহা ভাবিবার বিষয়। যে উড়িষ্যায় আজ অনশন দুর্ভিক্ষ অনটন নিত্য লাগিয়া আছে, যাহার তিমিরাবৃত কালীপরিহিত গ্রাম্য নরনারীর জীবন্ত দৈন্যের সমক্ষে একবার দাঁড়াইয়া দেখিলে যাঁহারা ভাবুক—তাঁহাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, যখন পরমুহূর্ত্তে, তাঁহারা ভুবনেশ্বর পুরী

কোণার্ক জাজপুর ইত্যাদির অমর মন্দির-শিল্পগুলির প্রতি তাকাইবেন। ইহাদের বাপ দাদাদের প্রাণ না জানি কত সরস প্রেমপূর্ণ সতেজ ছিল যাহার ফলে তাঁহারা পাষাণের বুক চিরিয়া অরূপকে রূপের নিগড়ে ধরিতে গিয়া নব ভগীরথের ন্যায় পরতে পরতে ভাবরসগঙ্গা বহাইয়াছেন। পিতৃপরিচয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহারা কি তাঁহাদের বংশধর? অথচ এই সকল মন্দির শিল্পাদি মাপ জোপ করিয়া ইংরাজীনবীশ দেশী বিদেশী 'ডাক্তার'-আখ্যা বহু পণ্ডিত বহু গবেষণা পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইতেছেন ও বহুৎ বাহবা পাইতেছেন। অনেক ক্ষেত্রে দুই পয়সাও করিয়া লইতেছেন।

হিংসা করিবার কিছুই নাই। অবস্থাটা ভাবিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা আমাদের পক্ষে আসল কাজের কথা। বর্ত্তমান দেখিয়া বাহ্যতঃ বোধ হইবে, এই সকল ভাস্কর্য্য কীর্ত্তি কে যেন উলুবনে মুক্তা বিস্তারের ন্যায় অপাত্রে ফেলিয়া রাখিয়াছে। অরসিকের ভিতর রস পরিবেশন করিয়া বিপত্তি বাধাইয়াছে। আসলে কিন্তু ইহা সত্য নহে। দৈন্যরূপ মায়াবরণে আবৃত রহিয়া ভদ্র লোক পূর্ব্বপুরুষদের এই সব কীর্ত্তির কদর বুঝিতেছেন না। অনেক সময় অমর্য্যাদা করিতেছেন। পিতামহদের স্মারক স্মৃতিগুলি সাগরপারে যাদুঘরে রসবিদেরা চালান দিতেছেন কিংবা দেশেই ঠাঁইনাড়া করিয়া সংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছেন। উত্তরাধিকারীদের নিজেদের বংশের রত্নরাজি রক্ষা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। কি বিড়ম্বনা! কিন্তু শিল্পমেধা রসবোধ ইহাদেরই ভিতর ছাইচাপা আগুনের মত সুসঞ্চিত আছে। যে প্রভূত অর্থ পূর্ব্বসভ্যতার নিদর্শন পুরাতন সামগ্রী রক্ষা করিবার জন্য ব্যয় হইতেছে তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ বা সমধিক অর্থ যদি যে সব মানুষ উহাদের সৃজন শক্তির ক্ষমতা ধরে তাহাদের—বিদ্যা দিয়া, পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থার দ্বারা কৃষি স্বাস্থ্য স্বচ্ছলতা সুযোগ ও শান্তি দিয়া—উন্নয়নকল্পে ব্যয় হইবার চেষ্টা বাড়িতে থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বকালের সেই রসসৃষ্টির ধারা আপাততঃ যাহা চড়ায় চাপা গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, ব্যাহত হইয়াও আবার

আজিকার ভারতখণ্ডে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। নিছক পুরা তাত্ত্বিকের মন লইয়া আমরা ভুলিয়াও যেন না ভাবি, এই সব চিহ্ন-গুলিই একমাত্র আদরকদরের বস্তু—কিন্তু যাহারা ঐগুলির জন্মদাতা তাহাদের মৃতকল্প প্রাণ জাগাইয়া তুলিলে স্বপ্নাতীত বহুপ্রকার নূতন রসশিল্পসৃষ্টি ভবিষ্যতে দেখা দিবে। কারণ, আসলে এই সব পদচিহ্ন ভারতের সহজ নরনারীর পক্ষে প্রাণবিহীন প্রত্ন'তত্ত্ব'—পুরা'তত্ত্ব' নহে। উহারা সমমর্ম্মীর প্রাণের–জীবন্ত রসশিল্পের সুন্দর আঁতের কথার ইতিহাস। যাঁহারা পাষাণ এমন করিয়া মুঞ্জরিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের হৃদয়ের অনুরূপ স্পন্দন সহজ ভাবে আজিকার বংশধরদিগের ধমনীতেও যে বহিতেছে ইহা ভুলিলে চলিবে না। কল্পনা নহে—পরম সত্য। এক নিগূঢ় সৃজনীশক্তির প্রভাবে জড় পদার্থের যাদুকৌশল-সমাবেশে জীবনকে,—চেতনকে ধরিবারই যুগ যুগ চিরন্তন চেষ্টা চলিয়াছে। ভারত জুড়িয়া,—জগৎ জুড়িয়া। এই সব মালমসলা নিদর্শনের বহিঃসাক্ষ্য লইয়া তাই সেই-সেই যুগের জীবনেতিহাসের উপর বহু সাহিত্য বহু কাব্য কথা রচনা হইতেছে। সেদিন নরওয়ের একজন বিশ্বপণ্ডিত ভুবনেশ্বরের কোন বাসিন্দাকে মন্দিরগুলি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পুঁথিগত ও দৃষ্টিগত ঘনিষ্ট অধিকার ও পরিচয় দেখাইয়া মুগ্ধ করেন। পুরাতন সম্পত্তির জাতিগত 'ওয়ারিশনদের' এই শ্রেণীর বুধবর্গ অনেক সময় একটু নীচু চক্ষেও দেখেন। তাঁহাদের দোষ কি? স্ফূর্ত্তির অভাবে আনন্দের ব্যত্যয়ে আমরাই যে ম্যাদাটে—বোকা বনিয়াছি!

খুঁজিলে আজও সেই সুচারু সূক্ষ্ম সৌখীন দক্ষতার কিছু কিছু পরিচয়, ঝড়তি পড়তি পাওয়া যায়। সেদিন ভুবনেশ্বরেরই একজন দেশী মিস্ত্রী প্রাচীন একখণ্ড শিলাফলকের কারুকার্য্যের চলনসই পুনরাবৃত্তি করিয়া এক পাশ্চাত্য তাত্ত্বিককে চমকিত করিয়াছেন। দস্তুরী নাম মাত্র।

শ্রাবণের ঝুলনোৎসবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে এখনও বিত্তহীন রিক্ত পটুয়াদের সুন্দর সুঠাম নয়নাভিরাম দেবদেবী অসুরদানবরাক্ষসাদি মূর্ত্তি ও সং গড়িবার কলাকৌশল কায়দা ও তক্ষণবিদ্যার পারদর্শিতা

দেখিয়া তাহাদের প্রাণ যে কত রসপ্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ, সত্য সম্পদের পরমাধিষ্ঠান তাহা সকলেই বেশ বুঝিতেছেন। বিশেষজ্ঞেরা অবশ্য আরও অধিক আনন্দ পাইবেন। দিবারাত্রের নানা যামে, বিশেষ বিশেষ তিথিতে দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম, 'চকানয়ন' মহাপ্রভুকে কি সরস সুকোমল প্রাণ লইয়া পরম একনিষ্ঠ সেবক বেশকারেরা নিত্য পর্য্যাপ্ত নব বস্ত্রালঙ্কার মাল্য পুষ্প পত্র সম্ভারে মনোহারী বেশভূষায় পরিশোভিত করিয়া পরম আত্মতৃপ্তি উপভোগ করেন। অপরেও গ্রহণসামর্থ্যমত ঐ পরিতৃপ্তির ভাগ পাইতেছে। ভক্ত একাগ্র প্রতীক্ষার অনিমেষ নয়নে প্রতি খুঁটিনাটিটির পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখেন। বিভোর হইয়া যতবার দেখেন মনের তৃপ্তি মিটে না। মনে হয়, 'এক নির্ম্মল মাধুর্য্য রসপ্রবাহে ভাসিতেছি। দুর্বার সমুৎসুক প্রবল জনতার ভিতর প্রাণেশ্বরকে দেখি। নিভৃতে নিরালায় একা দেখি। প্রিয় আমার। হৃদয়ের ধন আমার। আরও দেখি। জন্ম জন্ম দেখিয়াও দিব্য চিন্ময়রূপের ক্ষুধা বুঝি মিটে না। ধন্য হে সুশিল্পী, তোমার প্রাণের সেবা ধন্য। পুরুষানুক্রমে তোমারই এই বিশেষ অধিকার।' নাই নাই করিয়াও মরা হাতীর মূল্য লাখ টাকা।

কিন্তু শিল্পীদের আশ্রয় উৎসাহদাতা পূর্ব্ব যুগের সেই ভূস্বামিকুল ধনিবৃন্দ কোথা? পুরীর রাজাই আজ নামমাত্র কয়েকশত টাকা মাসহারায় দিন কাটাইতেছেন। যে সকল দেশীয় ধনী আছেন, পরম পরিতাপের বিষয়, তাঁদের রুচি বিশেষরূপেই রূপান্তরিত বা বিকৃত। তাঁহারা যে শিল্প সৌন্দর্য্যের পৃষ্টপোষকতা কল্পে একেবারে ব্যয় করেন না, তাহাও সত্য নহে। তবে সে অর্থ পরদেশীর পায়ে ঢালেন। কিন্তু দেশের দরিদ্র কারিগরের পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা! সহজে 'বাগ' মানে না। রাক্ষসী ক্ষুধা শিল্পবোধকে শুষিয়া খাইয়া ফেলে। নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষা মানুষের সমস্ত কোমল ভাবগুলিকে ঘাড় মটকাইয়া মারিয়া দেয়।

কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটীতে প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্গীত বাদ্যশিল্পের যে 'হাফ আখড়ায়ের' বিরাট অনুষ্ঠান-বৈঠক-সঙ্গতে

সমঝদার বহু রসিকবৃন্দের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছিল তাহাতে যোগ দিবার বা উপভোগ করিবার যোগ্যতা যাঁহাদের হয় তাঁহারা সবাই অকপটে উহার সুখ্যাতি করেন। এখনও বৃদ্ধদের মুখে পুরাতন কলিকাতার 'ফুল আখড়া'র গল্প শুনিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। কি বিপুল বিরাট তোড় জোড়! কবির লড়ায়ে দুই দলের ভিতর উপস্থিত-বুদ্ধির চরম নিদর্শনস্বরূপ গরম গরম পাল্টাপাল্টি ছন্দ রচনা, বিজয়ী-দলের নেতার বিজয়নিশান লইয়া সভার ভিতর সদর্প গতিবিধি, সমাজের সেরা-সেরা সমঝদার বিচারকদের সমাবেশ কত হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেগুলি কাহিনী আকারে আজিও জীবন্ত। বয়স্কদের মুখে শুনিয়াছি, বাগবাজার নন্দবসুর বাটীতে পূর্ব্বে এইরূপ লক্ষ্মী সরস্বতীর অনেকগুলি মিলন-সভা হইয়া গিয়াছে। আন্দুলের 'প্রেমিক' বাংলার প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ বিকীরণ করিয়া কালীনামের যে প্রাণমাতান সঙ্গীতলহরী তুলিয়াছিলেন পোষকতার অভাবে তাহা কতকাল অব্যাহত থাকিতে পারে? সুকুমার শিল্পের গুণিগণকে দেশ কি অনাদরে বিলুপ্ত করিতে চাহেন? লক্ষ্মী যাঁদের প্রতি প্রসন্না তাঁহারা একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে অনেক কিছু হইতে পারে। তাঁহারা শক্তিমান। দেশের আবহাওয়া কল্যাণের পথে ফিরাইয়া দেওয়া কতকটা তাঁহাদের ইচ্ছা সাপেক্ষ। পাড়ায় পাড়ায় রস সাধনার অনুপ্রবর্ত্তন করা তাঁহাদেরই করায়ত্ত। সখের বহু সূচী-শিল্পে বহু দরিদ্র প্রতিপালন হয় বলিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, বিলাস চাই। ক্ষমতা যদি থাকে প্রাণ প্রবৃত্তি যদি চায় তো দশকর্ম্মান্বিত গৃহস্থকে বীরের মত অকপটে প্রবৃত্তিপথে চলিতে হইবে।

সম্প্রতি কলিকাতায় কতকগুলি গণ্যমান্য প্রভাববান ব্যক্তির সমবেত চেষ্টায় সমাজের দুর্নীতি নিবারণে কিছু কিছু প্রয়াস লক্ষণ দেখা যাই-তেছে। সমিতির নাম 'কলিকাতা সজাগ সভা' Calcutta Vigilance Association। ইঁহারা রাজসরকারের সাহায্যে সহরের বিভিন্ন টোলায় যে যে আবগারীর দোকান আছে সেইগুলির দৈনিক বিক্রীর খাতা খতাইয়া আইনকানুনের যৎকিঞ্চিৎ চোকরাঙ্গানি বাঁধাবাঁধিতে

সবাইকে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাজারের সংলগ্ন কতকগুলি সরাবখানা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বিক্রয়ের পরিমাণ কমানও হইতেছে। ইঁহাদের মত—জনপদবাসীর চরিত্র উন্নয়ন ও দায়িত্ব-বুদ্ধি জাগাইবার জন্য সংযম ও সংশিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তিপরায়ণ সাধারণ মানুষের সামনে লোভের জিনিষ অনবরত সাজাইয়া রাখিলে তাহার পক্ষে আত্মসম্বরণ সম্ভব হয় না। সেইজন্যই লোভের জিনিষকে একটু চোখের আড়ালে রাখিবার প্রস্তাব।

মদ্য-মাদকতায় ও বারনারী-বিলাসে সমাজ-শরীরে যে ব্যাধি সঞ্চার চিরন্তন তাহা কতক কমাইবার জন্য ডাক্তার দ্বারা শরীর পরীক্ষা ও অন্য নানাভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে যথোচিত ব্যবস্থা করিবার মনস্থ করিতেছেন। জেনোয়ায় পৃথ্বীর সম্মিলিত জাতি-শক্তি League of Nations সকলের দৃষ্টি এই সব বিষয় আকর্ষণ করিতেছেন।

ইহার ফলে যাঁহারা এই সব ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করিতেছিলেন তাঁহাদের ট্যাঁকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ একটু-আধটু হাত পড়িতেছে বা অচিরেই পড়িবে। ইঁহাদের ভিতর ক্রোধ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইতেছে। কেহ কেহ ইতিমধ্যেই অন্ধকার দেখিতেছেন। বলিতেছেন, সভ্যতার ইতিহাসে কোথাও কি কখনও কোন দেশে আইনের দ্বারা এই সব অবশ্যম্ভাবী দোষ রদ হইয়াছে। যাহা বাহিরে প্রকট ছিল আইনের বেশী বাড়াবাড়ি হইলে, তাহা ন্যায়ের ফাঁকিতে পরদা বা নলচে আড়াল দিয়া মানুষ চিরকাল করিবেই। এখানে বলা ভাল, বোখারো কোলীয়ারীতে দেখিয়াছি, শ্রমজীবিসংরক্ষণ আইনে খনির সাক্ষাৎ এলাকায় মাদকদ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ বলিয়া সামান্য একটু গা ঢাকা দিয়া কুলিরা দামোদর নদীর পারে একটু সরিয়া আবগারীর দোকানে প্রতি রবিবারে 'হপ্তাকামাইয়া' সব খোয়াইয়া আনন্দ করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা গঠনমূলক কোন প্রস্তাব দিতেছেন

না। খালি বলিতেছেন, হাওয়া যেমন চলিতেছে চলুক। বাধা দিবার বেয়াদবী করিও না। অনেক সময় বিতণ্ডার ঝোঁকে আরও বলেন, আমরা তো দেখিতেছি দেশ শুদ্ধ সবাই—আর আন্দোলনকারীরা নিজে, বিশেষ ভাবে পাপী। সমাজের গতানুগতিক প্রথা অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিতেছেন এবং দলে ভারি বলিয়া বাজি জিতিতেছেন। ভুলিয়া গিয়াছেন—অসাঁচ্চার জন্যই খাঁটিবা ধাতস্থ আছেন

এতৎসংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত বাক্য আমরা পাঠককে দিতে সাহসী নই। এই দুই সামাজিক সমস্যা বড় জটিল। সপক্ষ বিপক্ষের যুক্তিতর্ক পাঠক আপনি বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লউন। আমরা আপনাদের ভাবাইয়া তুলিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধাবলীর অবতারণা করিয়াছি। যাহাতে যে পথে সমষ্টির কল্যাণ সাধন হইবে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণ দিয়া শ্রেয়ঃ সাধন করুন। সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। যাঁহারা ভোটের অধিকার পাইয়াছেন বা অদূরেই পাইবার আশা রাখেন তাঁহারা এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। সজাগ হউন।

স্বামী নির্লেপানন্দ

কৈঙ্কর্য্য

বিষম ভীষণ ভব-অম্বুধি, মজ্জিত তাহে তোমার দাস,
তরঙ্গ তটে করে তর্জ্জন গর্জ্জে যেন গো করিতে গ্রাস।
নন্দের ওগো নন্দন! কেন বঞ্চিবে মোরে করুণা হ'তে?
আমি যে চরণ- কমলের ধূলি, লুণ্ঠিতে চাহি তোমার পদে।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

শুকতারা

ধ্যান-মগ্ন আকাশের শান্ত ম্লান সুবিরাট্ ভালে
জয়টীকা কে আজি পরালে ?
নৈশ-বায়ু নিশ্বসিছে অরণ্যের ঘুমন্ত পাতায়,
স্পন্দি উঠে অন্ধকার আলোকের জনম-ব্যথায় ;
অশ্রু ঝরে মুক্তাসম আজি তার ব্যথাতুর চোখে
প্রভাহীন সব তারা—চারিদিক অন্ধকার শোকে !
বিমল আলোকে
বেদনার সুকরুণ সান্ত্বনার ধারা—
এল শুকতারা।

সীমাহীন আকাশ-সায়র, অন্ধকার নীরব ধরণী,—
তার মাঝে কে বায় তরণী ?
নিরুদ্দেশ মহাস্তব্ধ মসীমাখা সাগর অপার—
আলোর তরণী বেয়ে কে তাহাতে হও তুমি পার ?
অন্ধকার দিগন্তের কোন্ প্রান্তে তোমার নিশানা ?
যাও কি খুঁজিতে সেথা গূঢ় কোন রহস্য সীমানা—
নরের অজানা ?
একাকী অপথ্-দিশে চল পথহারা—
তুমি শুকতারা।

মন্ত্র-শান্ত অন্ধকার মহা-সিন্ধু বক্ষেতে শীতল
ফুটিয়াছ আলো শতদল !
না জানি অতল-গর্ভে বৃন্ত তব কোথায় নিহিত ?
কি আনন্দ-সৃষ্টি-রসে প্রাণ তব হোলো বিকসিত ?

ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে আছ সবিতার যাত্রা-পথ পানে,
নৈশবায়ু আশা-বাণী বুঝি তব কয়ে গেছে কাণে—
সান্ত্বনি পরাণে ?
শূন্য হতে ঝরে তব ম্লান আলো-ধারা
ওগো শুকতারা ।

আলোকের অগ্রদূত ! নবারুণ বারতা আনিলে,
আশাদীপ তুলিয়া ধরিলে ।
নমি তোমা দীপ্ত বীর, নবযুগ-রথের সারথি !
তোমার বর্ত্তিকা হের দূর করে অন্ধকার রাতি ।
শুনিতে পেয়েছে দ্বারী তোমার সে আকুল আহ্বান,
পূর্ব্বাশার সিংহদ্বার গেল খুলি গাহি জয়-গান,
নিশা অবসান ।
আলোক-সায়র মাঝে ডুবে হল হারা
ওই শুকতারা ।

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসু

হরি-বিরহ

একি গোবিন্দ-বিরহ গভীর বহিল মরমে মোর ?
প্রতি পল কাটে যুগের মতন,
প্রাবৃটের ধারা বরষে নয়ন,
শূন্য যেনরে সর্ব্ব ভুবন, শিথিল জীবন ডোর ।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

সভ্যতায় বর্ব্বরতার বীজ

জীবন-যুদ্ধ

ছোট জীব, মানুষ এই পর্য্যন্ত পোষ মানিয়েছে। কিন্তু যা কিছু বলা হোল তার শেষ দুটো ছাড়া সকলেই জঙ্গম (vertebrates) ; লাল মাছ এবং কচ্ছপ ছাড়া সকলেরই রক্ত গরম, কুকুর এবং বেরাল ছাড়া প্রায় সকলেরই ক্ষুর আছে (ungulates) ; যাদের ক্ষুর আছে তারাই নিরামিষাশী ; যারাই নিরামিষাশী তারাই ভারবাহী। মানুষের মধ্যেও দেখা যায়, যে জাতির নিরামিষের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা তারাই ক্রীতদাস এবং তাদেরই বুদ্ধিবৃত্তি অতি কম।

ঘোড়া, খচ্চর, কুকুর, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট, হাতী, মৌমাছি, গুটিপোকা, মুরগী, হাঁস, লাল মাছ প্রভৃতির আদিম নিবাস এসিয়া। ইউরোপের হচ্ছে বলদ, ময়ূর, বল্লাহরিণ, শূয়ার প্রভৃতি। আমেরিকার হোল—টার্কি, আলপাকা, লামা, গিনি-পিগ, কচিনি প্রভৃতি। বিড়াল, ক্যানারী, গিনি-মুরগী এসেছে আফ্রিকা থেকে। এসিয়া বড় দেশ বলে যে মানুষকে এত পশু দান করেছে তা নয়, এসিয়া হোল মানুষের আদিম-নিবাস এবং বাল্য ক্রীড়া-ভূমি—পশুপালন করতে শেখা পর্য্যন্ত বোধ হয় মানুষ এখানেই বসবাস করে।

আজ পর্য্যন্ত মানুষ প্রায় একশ পশু এবং হাজার রকমের উদ্ভিদের চাষ, নিজেদের সুবিধের জন্য করেছে।

মানুষের চাইতে পশু নিম্ন অবস্থায় আছে বটে, কিন্তু তাদেরও আমাদের মত পান ভোজন, অপত্য-স্নেহ, কৃতজ্ঞতা বোধ আছে। মানুষ তাদের জোর করে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য গ্রামে এনেছে। সাধারণতঃ তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার অতি নিষ্ঠুর। ডারবিন (Darwin) এদের রীতিনীতি অধ্যয়ন করে এবং তাদের কষ্ট বুঝতে পেরে বলেছিলেন, "Sympathy for the lower animals is one of the

noblest virtues with which man is endowed,"—পশুদের প্রতি সহানুভূতি মানুষের এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ।

প্রত্যেক প্রাণীকে প্রকৃতি তার আবেষ্টনীর উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যাতে সে বাঁচতে পারে এমন দেহ ও শিল্প নিয়ে সে জন্মায়। জলের মধ্য থেকে বাতাস টেনে নেবার উপযোগী ফুস্ ফুস্ যন্ত্র নিয়ে জন্মায় মাছ—ঝড় বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য বাসা বাঁধবার শিল্প নিয়ে জন্মায় বাবুই পাখী।

আগে লোকে মনে করতো সৃষ্টির প্রাক্কাল হতে জীব জন্তুর অবস্থার উপযোগী দেহ ও বুদ্ধি ছিল কিন্তু বর্ত্তমান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করছেন যে জীবাত্মায় অনাদিকাল থেকে অনন্ত শক্তির উৎস রয়েছে—বাহ্য প্রকৃতির সংঘর্ষে জীবের সেই শক্তির স্ফুরণ হয়—অনুশীলন, উন্নতি, সভ্যতা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন বিজ্ঞান রূপে। জীব চায় বাঁচতে, জানতে, সুখে থাকতে কিন্তু আর একটা শক্তি দেখা যাচ্ছে তার অন্তরায়—এই উভয় শক্তির সংঘর্ষের নাম জীবন-যুদ্ধ (Struggle for Existence)। জীব বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে লড়বার জন্য যুগ যুগ ধরে স্বীয় প্রচেষ্টায় তার দেহ ও মনের উন্নতি করে আসছে, যার ফল বর্ত্তমান মনুষ্য শরীর ও তার কলা-কৌশল। যে জীব জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে উন্নতির স্রোতে ভেসে যেতে না পেরেছে তাকেই কাল-নদীতে ডুবতে হয়েছে।—ডুবছে লক্ষ লক্ষ প্রাণী, বাঁচে তুলনায় একটি কি দুটি!—এরাই হল শ্রেষ্ঠ (best fitted), আর এই প্রক্রিয়ার নাম হল যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (The survival of the fittest)। সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই এই আইনের সূচনা। এ হতেই এক প্রকৃতি থেকে অনন্ত পরাপর জাতি (Genus, Species) ও বিশেষের (Individuals) উৎপত্তি।

যা পৃথিবীতে থাকতে পারে তার চাইতে জন্মায় বেশী। তুলনায় জন্মের হার এত অধিক যে পৃথিবীতে তার স্থান, বায়ু ও খাদ্যের অভাব। একজন বৈজ্ঞানিক দেখিয়েছেন যে একজোড়া চড়ুয়ের বাচ্চার যদি একটিও না মরে তাহলে তার বংশাবলী বিশ বৎসরে সমস্ত ইণ্ডিয়ানা রাজ্য ভরে ফেলতে পারে। প্রতি ঋতুতে একটা কাঁকড়া ১০০০০ করে ডিম-

পাড়ে, আর ঝিনুক ২০০০০০০ করে। একটা স্ত্রী-উঁই যখন যৌবন প্রাপ্ত হয় তখন তার, চাকের একটা খোপের মধ্যে বসে ডিম পাড়া ছাড়া আর কোনও কাজই থাকে না। কয়েক মাস ধরে রোজ ৮০০০০ করে সে ডিম পাড়ে। একজোড়া পতঙ্গের সন্তান-সন্ততি যদি না মরে তবে তারা ৮ বৎসরে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সমস্ত গাছের পাতা খেয়ে ফেলতে পারে। কুঁচে বা বান্ মাছ জীবনে একবার ডিম পাড়ে কিন্তু তার সংখ্যা হচ্ছে ৫-২০০০০০০০০। তা ছাড়া জলজ এমন ঢের জীব আছে তারা যদি না মরে তা হলে কয়েকদিনেই সমস্ত সমুদ্র ভরাট হয়ে যাবে। এক জোড়া কড মাছ তার সন্তান-সন্ততি দিয়ে ২৫ বছরে পৃথিবীর মত স্তূপ সাজিয়ে দিতে পারে।

এই অতিমাত্রায় জন্মই বিশ্বব্যাপী জীবন-যুদ্ধের হেতু। অন্য গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা কিরূপ আমরা জানি না, তবে অদৃষ্ট বশতঃ আমরা যে গ্রহে এসে জন্মেছি সেটা একটা মস্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্র আর জীবনটা একটা মস্ত বিয়োগান্ত নাটক। একটা জাত দল বেঁধে এগুচ্ছে এবং আর একটা জাতকে উজাড় করে দিয়ে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীতে যেদিন থেকে প্রাণের প্রথম স্পন্দন অনুভূত হল সেইদিন থেকেই এই হত্যা কাণ্ডের স্রোত প্রবলবেগে বয়ে চলেছে, এর শেষ কোথায় তা কেউ জানে না।

বিজ্ঞান, মাত্র ১০০০০০০ অপরা জাতির (species) তালিকা করেছে, এখনও যে কত লক্ষ প্রাণীর নাম-ধামের সন্ধান নিতে হবে তার ইয়ত্তা নেই। আরও স্থির করা হয়েছে যে এর কুড়িগুণ অধিক জাতি এক কালে পৃথিবীতে বাস করতো এখন তারা একেবারে উবে গ্যাছে। তা ছাড়া হয় ত এরও শতগুণ অধিক প্রাণি জাতি লোক-লোচনের বহির্ভূত হয়েই মরে গ্যাছে। পাথর বলে যাকে আজ আমরা বলছি, যে কঠিন পৃথিবীর ওপর আজ আমরা চলে ফিরে ব্যাড়াচ্ছি, তা হচ্ছে অগণিত প্রাণীর শিলীভূত (fossilised) দেহাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা একদিন আমাদেরই মত চলে ফিরে বেড়াত। এদের ইতিহাস জানবার একমাত্র উপায় এখন ভূগর্ভ-পেটিকার বিভিন্ন স্তরে যে জৈবাশ্ম (fossil) কুঞ্চিত

রয়েছে।—জীব-পুরাণ শ্রবণে সন্দেহ উঠে—প্রাণ ও জড় পৃথক, না জড় প্রাণেরই অবস্থান্তর!

অব্যবহার্য্য-দেহাংশ

কতকগুলো বড় বড় প্রাণীর দেহের এক একটা অংশ দেখা যায় অকেজো। দেহ-সজ্জার (Organisms) প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দেহ রক্ষা সম্বন্ধে কোনও না কোনও কাজ আছে। কেবল দুই একটা অংশের কি কাজ খুঁজে পাওয়া যায় না (Vestigial Organs)।

এর কারণ হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থায় বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করবার জন্যই জীবের তদুপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা দেয়। আবার আমরা দেখতে পাই দেহের কোনও অংশবিশেষ কিছু দিন ব্যবহার না করলে সেটা শুকিয়ে যায়। মনের বৃত্তি সম্বন্ধেও তাই। এখন বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলেছে। এক জাতি অপর জাতিকে বলপূর্ব্বক অবস্থান্তরে নিক্ষেপ করছে—আর্য্য অনার্য্যদের পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে, ছাগল-ভেড়াদের নেকড়েরা তাড়িয়ে সমতল ক্ষেত্রে নিয়ে আসছে। পূর্ব্ব অবস্থায় যে সকল অস্থি, পেশী বা অন্য কোনও অবয়বের দরকার হোত বর্ত্তমান অবস্থায় সেগুলোর দরকার না হওয়ায় একেবারে শুকিয়ে গ্যাছে, বা শুকনো অবস্থায় দু' একটা রয়ে গ্যাছে তার এখন কোনও ব্যবহার নেই। আবার নূতন নূতন প্রয়োজনে কোনও বিশেষ অঙ্গ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন টিকটিকি-জাতীয় সরীসৃপের (reptiles) পেছন দিকের দুই পা, পক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়ে, পাখার কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। টিকটিকির পেছনের পা ও পাখীর পাখার বিভিন্ন অংশ (humerus, ulna and radius, Carpal bones, and three series of metacarpal bones) একই শিল্পে নির্ম্মিত। কেবল টিকটিকির পাঁচটা আঙ্গুলের দুটো পাখীর পাখায় নষ্ট হয়ে গ্যাছে। কিন্তু এই রকম অকেজো দেহাংশ কার্য্যকরী দেহাংশে পরিণত হওয়া বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না—সাধারণতঃ অব্যবহার্য্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কালে নষ্ট হয়ে যায়, কারণ কাজ না করে-করে তারা পুষ্টি লাভ করতে পারে না। এই রকমে দেহের সহিত মিশে যাওয়ার

বহু উদাহরণ প্রাণিতত্ত্ববিদেরা সংগ্রহ করেছেন।—যেমন, সাপ। পূর্ব্বে সাপ টিকটিকি জাতীয় ছিল—তারা চার পায়ে হাঁটত। জীবন রক্ষার জন্য পাহাড়ের ফাটাল, গর্ত্ত, কোটর প্রভৃতি অল্প-পরিসর স্থানে বাস করতে-করতে বুকে হাঁটা তাদের অভ্যাস করতে হয়েছে এবং তাদের পায়ের লেশ মাত্র চিহ্নও আজ নেই।

প্রাণি-তত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর দেহে শত শত অকেজো অঙ্গ (Vestigial Organs) রয়েছে। মনুষ্যদেহের অকেজো অবয়বের একটা উদাহরণ হচ্ছে অন্ত্র-দেশের কীটাকৃতি উপাঙ্গ (Vermiform Appendix)। অন্ত্রোপাঙ্গপ্রদাহ রোগে (Appendicitis) এই অংশটি কেটে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু নিম্ন স্তরের প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় এটা তাদের পরিপাক যন্ত্রের (digestive system) একটা বিশেষ অঙ্গ। ঠিক পাকস্থলীর ন্যায় এর মধ্যে তাদের খাদ্য প্রবেশ করে এবং নানাবিধ পাকরস নির্গত হয়ে খাদ্যের সারাংশ রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। বেরালের ঐ অন্ত্রোপাঙ্গ ঠিক পাকস্থলীর ন্যায় বড়—ঠিক যেন আর একটা পাকস্থলী, পরন্তু মানুষের ওটা হচ্ছে একটা ছোট নাড়ীর মত। কালে হয় ত ওটা একেবারে সাপের পা বা পাখীর পায়ের আঙুলের মত মিশে যাবে।

মানুষের দেহের অপরাপর অব্যবহার্য্য অংশগুলি হচ্ছে—কাণের পেশী, মেরুদণ্ডের ল্যাজের মত নিম্নভাগ ও তাহার পেশী, আক্কেল দাঁত এবং গায়ের লোম। যে মাছগুলো গর্ত্তের মধ্যে থাকে তাদের এবং ছুঁচোর চোক অব্যবহার্য্য; কারণ তারা আঁধারে বাস করে বলে চোখের কোনও দরকার হয় না। চোক থাকলেও তারা দেখতে পায় না। পোষা গরু, মোষ, ছাগল ও ভ্যাড়ার শিং অব্যবহার্য্য। তিমির পিছনের পা প্রায় মিশে গ্যাছে, সামনের ছটো পা এখনও আছে। আগে এরা ডাঙ্গায় বেড়াত, ক্রমে শত্রুভয়ে জলে বাস করতে বাধ্য হয়েছিল। বহু স্তন্যপায়ী পশুর খুর এবং থাবার (claws) ওপরের দিকগুলো অকেজো—তারা মাটি স্পর্শ করে না এবং হাঁটবার কোন সহায়তাও করে না। এই পঞ্চ-নখীদের—কুকুরের একটি, গরুর ছটি অকেজো অবস্থায় আছে। জল-হাতীর (Hippopo-

tamus) একটি একেবারে নষ্ট হয়ে গ্যাছে এবং গণ্ডারে নষ্ট হয়েছে ছুটি। মানুষ, বাঁদর এবং হাতীর পাঁচটিই আছে। ঘোড়ার চারটি একেবারে নষ্ট হয়ে গ্যাছে। কেবল ক্ষুরের ওপর দিক একটু উঁচু দেখতে পাওয়া যায়। কাঁচ-সাপ (glass-snake) দেখতে সাপের মত কিন্তু এরা টিক্‌টিকি-জাতীয়। সাপেরও এককালে পা ছিল বটে কিন্তু এখন একেবারে মিশে গ্যাছে। কেবল বোড়া-জাতীয় দু একটা সাপের (pythons, constrictors) একটু থাবার চিহ্ন আছে। কাঁচ-সাপের পা ভিতর দিকে এখনও একটু অবশিষ্ট আছে বলে একে টিকটিকির শ্রেণীতে ধরা হয়। বাস্তবিক টিকটিকি এবং সাপের মাঝামাঝি অবস্থা হচ্ছে কাঁচ-সাপ (glass-snake)।

সাপেদের ফুস্‌ফুস্ হল একটা। তাদের পূর্ব্বপুরুষদের দুটো ফুস্‌ফুস্ ছিল, কিন্তু অল্পপরিসর জায়গায় থেকে থেকে এবং শরীরের সংকীর্ণতা হেতু তাদের একটা ফুস্‌ফুস্ লোপ পেয়েছে। এবং যেটা আছে সেটা প্রশস্ত একেবারেই নয়, খুব লম্বা, ঠিক দেহের অনুযায়ী। পাখীরও একই কারণে দক্ষিণদেশের গর্ভাশয় শুকিয়ে (atrophied) গ্যাছে। তাদের সমস্ত ডিম হয় বাঁ দিকের বীজকোষে। প্রত্যেক পশুর দুটো করে বীজকোষ (ovary) ঠিক যেমন দুটো করে মূত্রাশয় (kidney) এবং ফুস্‌ফুস্। কোন কারণে পাখীর একটা বীজকোষ অকেজো হয়ে গ্যাছে।

মানুষ প্রভৃতি জঙ্গম-জীবে (vertebrate) হাঁটু থেকে পায়ের গাঁট পর্য্যন্ত দুখানা হাড় আছে (tibia, fibula)। পাখী এবং আর কতকগুলো স্তন্যপায়ী জীবের মাত্র একখানা হাড় (tibia) আছে, অপরখানির কিছু অবশেষ আছে মাত্র। প্রত্যেক পতঙ্গের (insects) দুজোড়া পাখা থাকে। কিন্তু মাছির পেছনের পাখার পরিবর্ত্তে কতকগুলো গাঁট গাঁট দেখা যায়। আবার কতকগুলো পতঙ্গের সামনের পাখা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি। তেলাপোকার দুজোড়া পাখা আছে এবং মাঝে মাঝে তাহার ব্যবহারও করে কিন্তু স্ত্রীগুলো একেবারেই উড়তে পারে না—এদের পাখা অসম্পূর্ণ। স্ত্রী মৌমাছি এবং উঁইয়ের মধ্যে যারা কর্ম্মী তাদের বীজকোষ অকেজো। গোরুর দুটো বোঁট (teats) অসম্পূর্ণ,

কেবল চারিটিতে দুধ দেয়। সময় সময় অসম্পূর্ণ বোঁট দিয়েও দুধ বেরুতে দেখা যায়। এক জাতীয় চীনে ভেড়ার কাণ কোনও কাজে লাগে না, আর একজাতির লেজ শুকিয়ে একটা বোতামের মত হয়ে গ্যাছে। এবং যে কুকুর ও বেড়াল জন্মাবধি বেঁড়ে তাদের ল্যাজের জায়গায় একটু করে চিহ্ন আছে মাত্র। এক জাতীয় মুরগীর মাথায় চূড়ো অসম্পূর্ণ এবং কোচিন-চায়নায় আর এক জাতি আছে তাদের পায়ের কাঁটা (spur) প্রায় লোপ পেয়েছে।

অনেক ফুলের পাঁপড়ি এবং অন্যান্য অবয়ব অসম্পূর্ণ। পাঁপড়ির কাজ হচ্ছে তার রং দিয়ে কীট-পতঙ্গদের ভুলিয়ে নিয়ে আসা। পাঁপড়ির উজ্জ্বল রং যেন বিজ্ঞাপন। কতক ফুলে ঐ বিজ্ঞাপনের কাজ পরাগ কেশর (stamens) দিয়ে হয়ে থাকে এবং কতক ফুলের পাতার রংচংই ঐ কাজ করে। ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুলের অনেক অকেজো গর্ভকেশর (Pistils) আছে। যে লাউ কুমড়োর গাছগুলো মাটিতে হয় তাদের শুঁড়গুলো, যা দিয়ে ধরে ধরে বেয়ে ওঠে, সেগুলো বেশী বাড়ে না, কারণ তাদের আর বেয়ে উঠতে হয় না। পরভুক্ (Parasitic) পশু এবং উদ্ভিদের বহু দেহযন্ত্র নষ্ট হয়ে গ্যাছে। কারণ একলা স্বাধীন ভাবে থাকতে গেলে যে সব যন্ত্রপাতির দরকার তার এখন আর প্রয়োজন নেই। নারহোয়াল (Narwhal) এক জাতীয় তিমি। এরা উত্তর সাগরে বাস করে এবং এদের কেবল দুটি দাঁত আছে। একটা খুব ছোট, আর একটা ছয় থেকে আট ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়—এই দাঁত দিয়ে এরা শত্রুনাশ করে, এবং বরফের চাঙ্ ভেঙ্গে গর্ত্ত করে বাস করে। অষ্ট্রেলিয়ায় একরকম ইঁদুর আছে। তাদের পেটের ওপর একটা করে চামড়ার থলে আছে। তাইতে করে তারা ছানা নিয়ে বেড়াত। এখন তারা তার ব্যবহার না করায়, কেবল একটা চামড়ার পেটি দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের আক্কেল দাঁত অকেজো। এ অনেক বয়সে ওঠে বা কারও কারও একেবারে ওঠেই না। পশু এবং মানুষের দুটো করে চোখের পাতা আছে, কিন্তু কোণের দিকে তৃতীয় পাতার অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। পাখী, কাছিম প্রভৃতি কয়েকটা জীবে এ এখনও বর্ত্তমান। মানুষ এবং

মানুষের মত বাঁদরের ল্যাজ খসে গ্যাছে, কেবল দুএকটা গাঁট (vertebrae) অবশিষ্ট আছে। পাখীর প্রায় সেই অবস্থা। শিলীভূত পাখীতে (fossil) প্রায় কুড়িটি গাঁট যুক্ত ল্যাজ দেখতে পাওয়া যায়।

দেহের যেমন অকেজো অংশগুলো পূর্ব্বে পূরো মাত্রায় ছিল, ঠিক মনেরও বহুবৃত্তি তেমনি বন্য অবস্থায় অতিমাত্রায় ছিল। অতি সভ্য মানবেও সেগুলো সংযম করতে গেলেও বেরিয়ে পড়ে বা সূক্ষ্মভাবে সেই অসভ্যতাগুলো সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। এই অসভ্যতার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই তার সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, কলা, সমাজ ও শাসনে। পশুত্ব সকল মানুষেই আছে, কিন্তু সেটাকে যিনি যত সংযত করেছেন, তিনি তত শ্রেষ্ঠ মানব। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা অকেজো মনোবৃত্তিগুলির আলোচনা করবো।

(ক্রমশঃ

বাসুদেবানন্দ

অহেতুকী ভক্তি

চাহিনা ত ধন চাহিনা ত জন রূপসী বনিতা হৃদয়-রাজ!
চাহিনা কবিতা চারু সুললিতা, বাসনার বুকে পড়ুক বাজ।
এই নিবেদন কাঙ্গালের ধন! যেন গো জনম জনম ধরি,
তোমার চরণে অহেতু ভকতি জনমে আমার মরমে হরি!

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

শ্রাবণ-সন্ধ্যায়

আজ শ্রাবণ-সন্ধ্যায় ঝর্ ঝর্ ঝর্ বৃষ্টিধারার অবিরাম পতন-শব্দে সমস্ত পৃথিবী যেন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। গৃহ প্রাঙ্গণে রজত-ধারার ন্যায় শ্রাবণের কৃত্রিম নদী রসপুষ্ট শ্যামল দূর্ব্বাশ্রেণী কম্পিত করিয়া বালশিল্পের নব উন্মেষ—খেলার তরুণী সকল নাচাইয়া নাচাইয়া হেলাইয়া দোলাইয়া কোথায় কাহার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে। এই সান্ধ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি কত কি ভাবিলাম,—ভাবিলাম, সকাল হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে সকাল প্রতীক্ষা করিয়া বুক-ফাটা-বুকের অনিবার দহন আর বুঝি সহ্য করিতে হইবে না। আজ বুঝি তুমি এই কৃত্রিম নদী-বক্ষে বাল-তরণী আরোহণে আসিয়া আমার এই তাপদগ্ধ হিয়ায় অমৃতের নির্ঝর প্রবাহিত করিয়া, বিষাদ-ম্লান মুখ আমার সত্য সত্যই নবীন হর্ষে ছবির মত মনোরম করিয়া তুলিবে। একান্ত বিচ্ছেদরহিত দুর্ব্বহ চিন্তা-ধারার আমার আজ বুঝি শেষ সমাপ্ত। তাই পথপানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সারাসন্ধ্যা অতিবাহিত হইল।

এই তো সামান্য মাত্র ব্যবধান, আমার ভাগ্যে তাই যে দুর্লঙ্ঘ্য সাগর সমান। সময় যায়, কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। আমার সময়ই কি যায় না? কিন্তু, যে ভাবে যায় তাহা কাহাকে বুঝাইব? কে বুঝিবে? এ যে 'পলে পলে সহি শতেক যাতনা, তিলে তিলে দহি আগুনে'। আর কতকাল, ওগো! আর কতকাল আমি ব্যর্থ প্রতীক্ষার জলন্ত আগুনে পুড়িয়া মরিব। শুনিয়াছি—তুমি দয়াময়, কিন্তু, আমার ভাগ্যে তো তাহার সবই বিপরীত। শ্রাবণের বৃষ্টি ধারাও কি স্থান-বিশেষে বর্ষণ বন্ধ করে? তোমারও কি পক্ষপাত আছে? বল, বল আমায়, হে তুলাদণ্ডধারী! তোমারও পক্ষপাত আছে জানিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই। আর এ নিদারুণ সংশয়ের বেড়া আগুনে আমি পুড়িতে তো পারি না। শুনিয়াছি, তোমার কাছে সব সমান, এই কি তাহার

পরিচয় ? জন্মাবধি দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধৃতি, স্মৃতি, শৈশবের সারল্য, কৈশোরের তরুণ বাসনা, যৌবনের আশা তৃষ্ণা, স্নেহ প্রেম যাহা কিছু আমায় দিয়াছিলে—হে আমার মনোমন্দিরের একমাত্র দেবতা ! সমস্ত আমি তোমারই চরণ-কোকনদে একান্ত ভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, তোমারই কৃপাদৃষ্টির বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ-লালসায় তোমারই সমুজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া আছি। শুনিয়াছি, তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু, তাহা কি কেবল কথার কথা ?—না উন্মাদের অসংবদ্ধ প্রলাপ মাত্র ? যদি তুমি সত্য সত্যই বাঞ্ছাকল্পতরু, তবে তোমার শত জনমের প্রসাদ-ভিক্ষুকে কেন গো প্রসাদ পুরস্কারে কৃতার্থ কর না ? ওগো ! শাস্ত্র তোমায় বলে তুমি রস-স্বরূপ, তবে আমার জীবন মরুভূমি কেন ? আমায় বলিবে কি ? মহাসমুদ্র যাঁহার রসে পরিপূর্ণ, মেঘকুল যাহার রসে পরিপুষ্ট, নদনদী, পত্রপুষ্প, তরুলতা, এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত যাঁহার রসে প্রাণবন্ত, যাঁহার অমৃত রসপ্রবাহে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত, ওগো বলিবে কি আমায়—আমি কোন্ অপরাধে তাহার এক বিন্দু হইতেও বঞ্চিত ? বল আমায়, আমি আর কতকাল আশায় রহিব ? অনেক সময় হতাশার গভীর অন্ধকার করাল জিহ্বা বিস্তার করিয়া আমার বিশ্ব-জোড়া আশার আলোকটিকে গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসে, আমি প্রাণ-পণ শক্তিতে সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার রাশি পরাজিত পরাহত করিয়া, 'তোমায় পাইব'—আমার এই আশার আলোক প্রজ্জলিত রাখিয়াছি, কিন্তু আর বুঝি পারি না, এবার বুঝি তাহারই জয় হয়। হে দাতা ! যদি শত্রুর গলে বিজয়মাল্য পরাইবার ইচ্ছা, হে ইচ্ছাময় ! তবে আমায় আশা দিয়াছিলে কেন ? তুমি না দিলে আমি কোথায় পাইব প্রভু ! তোমায় প্রভু বলা আমার পক্ষে অশোভন ; শুনিয়াছি, তুমি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত পৃথিবীর প্রভু, তাই ভুল হইয়া যায়, নতুবা এ হতভাগ্য জীবনের প্রভুত্বে তুমি নিয়োজিত বলিয়া একদিনও তো অনুভব করিতে পারিলাম না ! যাহার প্রভু আছে তাহার আশ্রয় আছে, তবে আমি আশ্রয়হীন, সহায়হীন, উপায়হীন কেন ? আমি জানি না, তুমি আমায় জানাইয়া দাও। তোমার অনন্ত নাম, কোন্ নামে আমি তোমায় অভি-

হিত করিব ? শুনিয়াছি, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্। তোমার এক অংশে অনন্তদেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সাগর উপসাগর মহাসাগর সচলাচল সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু হে সর্ব্বশক্তিমান্! আমা হেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের ভার বহনে যিনি অক্ষম আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিব ? শুনিয়াছি, তুমি আনন্দময়, তবে আমায় এক কণা আনন্দ দানে তোমার এত কার্পণ্য কেন ? আমি তো জন্মাবধি তোমা বই অন্য কিছুই জানি না। আমি তোমারই জন্য হৃদয়-আসন পাতিয়া, তোমার ঐ ভক্তজন-বাঞ্ছিত রাজীব চরণ ধৌত করিবার জন্য অশ্রুজলে ভৃঙ্গার পূর্ণ করিয়া আশা-দীপ জ্বালিয়া তোমারই আগমন প্রতীক্ষায়, পথে দৃষ্টি রাখিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি কি আসিবে না ? হে আমার সারা জনমের সাধনা, চির জীবনের তপস্যা! তুমি এই শূন্যহৃদয় পূর্ণ করিতে কি আসিবে না ?

এসো ওগো এসো, আজ তোমার সকল উপেক্ষা ভুলিয়া কাতর প্রাণে তোমায় ডাকি—তুমি এসো! আজ তোমার সকল অনাদর ভুলিয়া মনে প্রাণে তোমায় ডাকি—তুমি এসো! আজ লাঞ্ছিতের বেদনা ভুলিয়া, তৃষিত হৃদয়ে তোমায় ডাকি—তুমি এসো! আজ তোমার নাম ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমায় ডাকি—তুমি এসো! ওগো আনন্দময়—তুমি এসো, আনন্দ বাতাসে আমার জীবন ব্যাপী নিরানন্দ উড়িয়া যাক্ ; ওগো প্রেমময়—তুমি এসো! প্রেম-মদিরা-ঢুলু-ঢুলু ললিত নয়নে একবার তুমি চাহিয়া দেখ। আজ শুভ রাত্রি, মিলনের সকল আয়োজন প্রস্তুত, লগ্ন যেন ভ্রষ্ট না হয়। তুমি এসো, তোমার কোমল কর-পল্লবে আমার কর ধরিয়া একবার——শুধু একটিবার মাত্র উচ্চারণ কর, 'আমি আসিয়াছি, তোমায় বুকে লইতে আসিয়াছি'; আমি তোমার স্নেহময়, প্রেমময়, অমৃতময় বিশাল বক্ষে মাথা রাখিয়া শত জন্মের সহস্র যন্ত্রণা এক নিমিষে ভুলিয়া যাই। হে রসস্বরূপ! সুশীতল বারি-রূপে তুমি একবার এসো, শীতল বারি অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া আমার সারা জীবনের নিদারুণ তৃষ্ণা এক মুহূর্ত্তে দূর হোক্। ওগো! তুমিই না বলিয়াছ, তোমার জন্য যাহার প্রাণ যায় যায় হয় তাহাকে

তুমি দেখা দাও। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে এ সময়ে একবার আসিয়া দেখ, আমি আর পারি না, আর বাঁচি না, তুমি এসো এসো, ওগো আমার হৃদয় দেবতা! আমার উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করিতে তুমি এসো। এসো ওগো আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম! তুমি এসো। আমার জীবনাধিক জীবন! তুমি এসো। আমার অন্তরের অন্তঃপুরে তুমি এসো! আমার যৌবন-বসন্তে তুমি এসো, আমার বিচ্ছেদের নিদাঘে তুমি এসো, আমার দুঃখের বরষায় তুমি এসো, আমার সুখের শরতের পূর্ণচন্দ্র তুমি এসো। আমার মিলনায়োজনের হেমন্তে তুমি এসো, আমার নিবিড় প্রেমের গভীর শৈত্যে তুমি এসো। ওগো! তুমি এসো। আমার পরম দেবতা! তুমি এসো। এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় আমার একমাত্র আরাধ্য! তুমি এসো।

শ্রীননীবালা দেবী

মাধুকরী

চীনের জাগরণ

আজ মহাচীনের জাগরণ সুরু হইয়াছে, যে গাঢ় ঘুমে সে আচ্ছন্ন ছিল ১৯১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সে ঘুম তাহার প্রথম ভঙ্গ হইয়াছে এবং সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত চীনে অন্তর্বিপ্লব বহির্বিবাদ লাগিয়াই আছে। খৃঃ পূঃ ২৮০০ সন হইতে চীন দেশের ইতিহাস সংগৃহীত আছে। চীন মহাদেশ পৃথিবীর প্রাচীনতম সুসভ্য দেশ। কিন্তু সেই অতীত যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত চীনের আবালবৃদ্ধবনিতা তেমন উদ্বুদ্ধ হয় নাই, যেমন হইয়াছে ১৯১২ সন

হইতে, যখন চীনেরই এক মহাপুরুষ স্থান ইয়াৎ সেন সমগ্র চীনে এক সাধারণ প্রজাতন্ত্র গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং সুপ্ত চীনকে পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। আজ গৃহ-বিবাদ, অন্তর্বিপ্লব দাবানলের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে, দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ সহর সাংচাইয়ের ধন জন সম্পত্তি আজ বিদেশী শক্তির করায়ত্ত এবং বিদেশী নৌবহর পীতসাগরের উপকূলে কামান দাগিবার উদ্দেশ্যে মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, চীনের এই জাগরণের সহিত 'রেড্' রুষিয়ার বিশেষ যোগ আছে এবং পাকা পোক্ত রাজতন্ত্র ছাড়িয়া সহসা একেবারে প্রজাতন্ত্রের বিকাশে এই বোল্‌শেভিজমের মোহে পড়িয়া চীন ধ্বংসের পথেই চলিয়াছে। চীনের বাহিরের লোকেরা যাহাই মনে করুক চীনের গণতন্ত্রবাদীরা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিতেছেন যে, বোল্‌-শেভিক বা অন্য কোনো বিদেশীয় প্রভাব এখানে টিকিবে না, চীন চীনই থাকিবে। তাঁহারা ইহাও বলিতেছেন যে, আজ উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীন পরস্পর বিরোধী হইলেও উভয় দলেরই ভিতরের উদ্দেশ্য এক ;—চীন হইতে সমস্ত বৈদেশিক শক্তিকে বিতাড়িত করিতে উভয় দলই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

চীনে আজ যে বোল্‌শেভিক প্রভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহার মূলে আছেন মস্কোর এক দীন দরিদ্র শিক্ষক বোরোডিন। ইনি বহু কাল পূর্ব্বে ডাঃ স্থান ইয়াৎ সেনের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চীনের শিক্ষা বিস্তার কল্পে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তিনি চীনকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে ডাঃ স্থান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পরও বোরোডিন ডাঃ স্থান ইয়াৎ সেন প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার যুবক পুত্র সান ফু কর্ত্তৃক পরি-চালিত কুয়োমিন্‌টাং দলের প্রাণ স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। ইনিও উত্তর চীনের সাম্রাজ্যতন্ত্র উচ্ছেদ করিবার জন্য উৎসুক। মাত্র দিন কয়েক পূর্ব্বে ইঁহার পত্নী উত্তর চীনের পিকিং (রাজ সরকার) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য ধৃত হইয়াছেন। চীনের বর্ত্তমান

মনোভাব বুঝিতে হইলে চীনের অধিবাসীদের নিকট হইতেই তাহা জানা আবশ্যক। সুসভ্য পাশ্চাত্য সংবাদপত্রসেবীদের কল্পিত বা অর্দ্ধ সত্য কথা শুনিলে ভুল করা হইবে। অধুনা চীনে কি কি ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, পিকিংয়ের সিংহ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক বিখ্যাত পণ্ডিত এস ইউই, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তাহা এইরূপ "চীনে বর্ত্তমানে যে যুগ চলিতেছে তাহা যুদ্ধ বিবাদের যুগ, বৈদেশিক শক্তির কবল হইতে চীনকে মুক্তি পাইবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইতেছে। এবং ভিতরের দিকে চীন দেশে চীন রাজতন্ত্রের যথেচ্ছাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ১৯১১ সাল হইতে অন্তর্বিদ্রোহ চলিয়াছে। যতদিন চীনে সমস্ত বৈদেশিক শক্তি বিতাড়িত হইয়া এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন এই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। শিল্প-কলা-জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক কথায় কাল্‌চারের দিক হইতে চীনের জাগরণ সুরু হইয়াছে ১৯১৭ সন হইতে। চীনের অশিক্ষা দূর করিয়া সাধরণের মনোবৃত্তি জাগ্রত করিবার বিপুল আয়োজন চলিয়াছে এবং চীনে একটিও অশিক্ষিত লোক থাকা পর্য্যন্ত এই আন্দোলন বন্ধ হইবে না। কিন্তু বৈদেশিক শক্তি সমূহের কূট সন্ধিসর্ত্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চীন বিশেষ ভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বিগত ৮০ বৎসর ধরিয়া এই ভাবের অন্যায় সন্ধি-বন্ধনে চীন 'আষ্টে পিষ্টে' বাঁধা পড়িয়াছে। যতদিন না বৈদেশিক শক্তি-সংঘ চীনের প্রতি এই আন্তর্জাতিক অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার করিয়া পৃথিবীর জাতিসংঘে চীনে ন্যায্য স্থান ছাড়িয়া দিবে ততদিন পর্য্যন্ত চীন এই অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে প্রাণ পণ করিবে। চীন আজ কোনো বৈদেশিক শক্তির নিকট কোনো বিশেষ অধিকার ভিক্ষা করিতেছে না। তাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা প্রাপ্ত হইলে সে সন্তুষ্ট থাকিবে।"

চীনের ঐক্য-বন্ধন আজ অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে। চীনের চল্লিশ কোটি অধিবাসীই আজ কুয়োমিন্‌টাং দলের পররাষ্ট্র সচিব ইউজিন চেনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্য-তন্ত্রের অত্যাচারের প্রতিকার করিতে চীন কখনই ছাড়িবে না।

ইংরেজ ফরাসী অমেরিকান প্রভৃতি শ্বেতকায় জাতি সমূহ এতকাল চীনে যে প্রভুত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল এখন তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। চীনের জাগ্রত প্রজাশক্তির কাছে তাহাদের কিছু মাত্র প্রভুত্ব নাই। তাহারা প্রায় সকলেই সত্য ও কল্পিত ভয়ে সুরক্ষিত সাংঘাই সহরে আশ্রয় লইতেছে।

সহরে সহরে খুন জখম গুপ্ত হত্যা অবাধে চলিতেছে এবং যত দিন না একদল আর একদলকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে পারে ততদিন এইরূপ চলিতে থাকিবে। চীনের সমস্ত বড় বড় বন্দরে এতকাল বৈদেশিক শক্তির একছত্র অধিকার ছিল। বর্ত্তমানে চীনের জনসাধারণ এইগুলি অধিকার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বৈদেশিক শক্তিরা কাঁটার বেড়া দিয়া সমস্ত বন্দরগুলি ঘেরিয়া ফেলিয়াছে ও কামান বন্দুক লইয়া সব সময় প্রস্তুত আছে। ১৯১২ সালে ডাঃ স্যান ইয়াৎ সেনের জীবিত অবস্থায় কুয়োমিন্টাং দল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ চীনের শতকরা ৫৫ জন লোক এই দলের অন্তর্ভুক্ত এবং অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র চীনই যে এই দল-ভুক্ত হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কুয়োমিন্টাং দল হ্যাঙ্কোতে ইংরাজ-শক্তিকে বিশেষ লাঞ্ছিত করিয়া সম্প্রতি সাংঘাই বন্দর অবরোধ করিয়াছে। কারণ এই সাংঘাই বন্দরই অন্তর্জাতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল একথা তাহারা জানে। কুয়োমিন্টাং দলের প্রচারকগণ দলে দলে চীনের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া ফিরিতেছে ও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে চীনের জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছে। এই সকল বৈদেশিক শক্তির সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই আছে, ইহারা চীনের সমস্ত বন্দর দখল করিয়া খুসীমত শুল্ক আদায় করিতেছে, সমস্ত জলপথে যথেষ্ট নৌকা ষ্টীমার প্রভৃতি চালাইয়া চীনের বহির্বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে এবং চীনের কোনও আইন মানিয়া চলিতে ইহারা প্রস্তুত নহে। ইহারা নিজেদের মনগড়া আইন অনুযায়ী চলিতেছে ফিরিতেছে। অথচ এই বৈদেশিকগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র চীন সম্বন্ধে এমন ভাবে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে যেন চীনের জনসাধারণ তাহাদিগের

উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও অকারণ হত্যা সুরু করিয়াছে। এই ওজুহাতে ইতি মধ্যেই প্রেসিডেণ্ট কুলিজ চীনে আমেরিকার অধিবাসীদের রক্ষা কল্পে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। ফরাসী ও ইংরেজরাও সৈন্য লইয়া প্রস্তুত আছে।

কিন্তু কুয়োমিন্‌টাং দল দমিবার নহে; তাহারা স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণ করিয়াছে; ইহারা বক্সার দলের মত ধর্ম্মের ভাণ করে না, ইহারা একটি মাত্র দোহাই পাড়ে—তাহা স্বদেশের স্বাধীনতা। চীন দেশকে শাসন করিবার ন্যায্য অধিকার ইহারা দাবী করে।

এই দলের একাগ্রতা ও মৃত্যুপণ দেখিয়া বৈদেশিক শক্তি সমূহ প্রায়ই সন্ধি বিগ্রহের কথা তুলিতেছেন, কিন্তু চীনের বন্দর সমূহ দখলে না আসিলে কুয়োমিন্‌টাং দল সন্ধি করিবে না।

সব চাইতে মুস্কিল হইয়াছে জাপানের; প্রাচ্য ও প্রতিবেশী এই জাতির বিরুদ্ধে যাইবে কি-না ইহা লইয়া সে মহাভাবনায় পড়িয়াছে; অথচ ইংরেজ ও আমেরিকানরা তাহাকে ন্যায় ধর্ম্মের ওজুহাতে চীনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে।

চীনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিবার সময় আসে নাই, চীনের সংবাদ বিকৃত হইয়া আসিতেছে—তবে এইমাত্র স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই কুয়োমিন্‌টাং দলের প্রভাবে চীন আজ যে ভাবে জাগিয়াছে এমন জাগরণ তাহার কখনও হয় নাই এবং সম্ভবতঃ চীনের চিরন্তন স্বাধীনতার ইহাই সূত্রপাত।

'কুয়োমিন্‌টাং' শব্দের অর্থ এই 'কুয়ো' অর্থে দেশ, 'মিন'—জনসাধারণ 'ওটাং'—সংঘ; অর্থাৎ জনসাধারণের কবলে দেশকে আনিবার জন্য সংঘ। দেশ-প্রেমই এই সঙ্ঘের মূলমন্ত্র।

কুয়োমিন্‌টাং দলের উদ্দেশ্য এই তিনটি—

১। দেশবাসীর সত্য অধিকার স্থাপন—চীন মহাদেশকে সকল বৈদেশিক শক্তির কবল হইতে মুক্ত করা, কামানের মুখে যে সকল অন্যায় সন্ধি-সর্ত্তে চীন স্বীকৃত হইয়াছিল সেগুলির উচ্ছেদ করা।

২। প্রজাতন্ত্র স্থাপন—দেশের লোককে শিক্ষিত করা ও সত্য প্রজাতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে সকলকে জ্ঞানদান করা।

৩। দেশবাসীর জীবন যাত্রা—দেশবাসীর জীবন যাত্রার আদর্শ উন্নততর করা; ব্যবসা বাণিজ্যে চীনের অধিকার সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করা; চীনের স্ত্রী ও বালক শ্রমিকদল বর্ত্তমানে যে বৈদেশিক কলকারখানায় সামান্য বেতনে দৈনিক ১৫ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করে তাহা বন্ধ করা।

স্বর্গীয় ডাঃ স্যান ইয়াৎ সেন সর্ব্ব প্রথমে এই সকল মতবাদ প্রচার করেন এবং তিনি চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হইয়া এই কুয়োমিন্‌টাং দল প্রতিষ্ঠিত করেন। চীনের বর্ত্তমান জাগরণের মূলে একমাত্র তাঁহার বিপুল উদ্যম ও কর্ম্মশক্তি নিহিত রহিয়াছে। কুয়োমিনটাং-দল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ইহার সভ্যসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে; সর্ব্ব প্রথমে চীনের ছাত্রসম্প্রদায় ইহার সভ্য-শ্রেণী-ভুক্ত হয় এবং ডাঃ স্যান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পরই ক্যাণ্টন সহর ইহাদের অধিকারে আসে। টিভিসুং নামক একজন সুযোগ্য ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের রাজস্ব সচিব হইয়া এই দলের ধনবল বৃদ্ধি করিতে সুরু করেন।

ডাঃ সেন জীবিতাবস্থায় যাহা করিতে পারেন নাই তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার অনুচরেরা সেই কার্য্য করিতে সক্ষম হন, অতি দ্রুত দল বৃদ্ধি হইতে থাকে। ডাঃ সেনের সুযোগ্য পত্নী ও পুত্র সান-ফু, এই দলের সুযোগ্য সেনাপতি চ্যাং কাই শেক, পররাষ্ট্র সচীব ইউজিন চেন্ প্রভৃতি প্রবল বিক্রমে ডাঃ সেনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মৃত্যু ও দৈহিক ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া ক্যাণ্টন হইতে সর্ব্বত্র বিজয় যাত্রা করেন এবং দক্ষিণের সকল খণ্ড-নেতাকে পরাজিত করিয়া সংঘাইয়ে উপস্থিত হন। এই পরাজিত নেতৃ-বৃন্দের মধ্যে উ-পি-ফু একজন। এদিকে পিকিং হইতে বিতাড়িত খ্রীষ্টিয়ান সেনাপতি ফেংএর দলও রুষিয়ার সমর পদ্ধতিতে শিক্ষিত। এখন ইহাদের বিরুদ্ধে তিনটি প্রবল দল যুদ্ধ করিতেছেন; প্রথম—উত্তর চীনের

পিকিং সরকার, দ্বিতীয়—খণ্ডনেতা চ্যাং সো লিন। বৈদেশিক শক্তিরা ইঁহাকে সাম্রাজ্য প্রলোভন দেখাইয়া কুয়োমিন্‌টাং দলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, পরাজিত সেনাপতি উ-পি-ফু ইহার সহিত যোগ দিয়াছেন, এবং তৃতীয়—বৈদেশিক শক্তিসমূহ। কিন্তু যে ভাবে কুয়োমিন্‌টাং দলের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র চীনে এই কুয়োমিন্‌টাং দল ছাড়া অন্য কোনো শক্তি থাকিবে না।

(প্রবাসী ১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ)

জগৎ কারণ

(কণাদ ও শঙ্কর)

পরমাণুবাদ

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥ ব্রহ্মসূত্রে, অ ২। পা ২। সূ ১১ ॥

শংকরানন্দকৃত দীপিকা।—যথা পরমাণোঃ পরিমণ্ডলাদণুহ্রস্বং চ দ্ব্যণুকং, অণোঃ হ্রস্বাচ্চ দ্ব্যণুকান্মহদ্দীর্ঘং চ ত্র্যণুকাদি তদ্বচ্চেতনমপি ব্রহ্ম অচেতনস্যারম্ভকং স্যাৎ।

সূত্রার্থ।—বৈশেষিকের সৃষ্টি প্রক্রিয়া চারি জাতীয়। অসংখ্য পরমাণু প্রলয়কালে নিশ্চল ও অসংযুক্ত থাকে। সৃষ্টিকালে আত্মার প্রভাবে সচল হইয়াই সংযুক্ত থাকে। অনন্তর, দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক এবং ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কারণ দ্রব্যের গুণ কার্য্য দ্রব্যে স্বসদৃশ অন্য গুণ জন্মায়, এই প্রণালীতে জড় জগতের উদ্ভব। উক্ত মতে দ্ব্যণুকের পরিমাণ অণুহ্রস্ব (চারিটি দ্ব্যণুক) চতুরণুক

জন্মায়। দ্ব্যণুকের শুক্লাদিগুণ চতুরণুকে জন্মে কিন্তু অণুহ্রস্বতা জন্মায় না। অতএব যেমন পরিমণ্ডল হইতে দ্ব্যণুক, অণুহ্রস্ব ও ত্র্যণুকাদি মহদ্দীর্ঘ জন্মে, পরিমণ্ডল জন্মে না, অথবা অণুহ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুক জন্মে অণুহ্রস্ব জন্মে না, সেইরূপ চেতন-ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উদ্ভব হইতে পারে।

শাংকরভাষ্যতাৎপর্য্য।—বৈশেষিকেরা সৃষ্টিতত্ব নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করেন। প্রথম পরমাণু সকল নিষ্ক্রিয় থাকে তাহারা কিছু সৃষ্টি করে না। সেই সময় তাহাদের পরিমাণ, রূপ এবং অন্যান্য গুণ স্বরূপ অবস্থায় থাকে। পরমাণু চারি জাতীয়—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এবং মরুৎ। ইহারা অসংখ্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয় কালে ইহারা নিশ্চল ও অসংযুক্ত বা অমিলিত অবস্থায় থাকে। যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয় তখন ইহারা জীবাত্মার অদৃষ্টবশে পরিচালিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে। যেই কার্য্য আরম্ভ হইল অমনি তাহারা মিলিত হইতে থাকে। তখন দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক চতুরণুক প্রভৃতি উত্তরোত্তর স্থূল দ্রব্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। দুই পরমাণুতে এক দ্ব্যণুক তিন দ্ব্যণুকে এক ত্র্যসরেণু, চারি দ্ব্যণুকে এক চতুরণুক। পরমাণুর পরিমাণ অণু, দ্ব্যণুকের পরিমাণ অণুহ্রস্ব, পরে ত্র্যসরেণু, চতুরণুক প্রভৃতির পরিমাণ মহৎ-দীর্ঘ। অণু দ্ব্যণুকের কারণ, দ্ব্যণুক ত্র্যসরেণুর কারণ, ত্র্যসরেণু চতুরণুকের কারণ ইত্যাদি। প্রত্যেক কারণ দ্রব্যের গুণ প্রত্যেক কার্য্য দ্রব্যে স্বসদৃশ অন্য গুণ জন্মায়। যেমন কারণরূপী সূত্রের শ্বেতত্ব কার্য্যরূপী বস্ত্রে প্রকাশ পাইবে। এই প্রণালীতে জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। দুইটি শ্বেত পরমাণু (পরিমণ্ডল) যদি একটি দ্ব্যণুক জন্মায় তাহা হইলে সেটিও শ্বেত হইবে। কিন্তু কারণের সব গুণ কার্য্যে থাকে বটে, কেবল পরিমা'যো'গুণটি ভিন্ন পরিমাণ জন্মায় অর্থাৎ পরমাণুর গুণ যে অণুত্ব (পারিমাণ্ডল্য), দ্ব্যণুকে সে অণুত্ব দেখা যায় না—দ্ব্যণুকের পরিমাণ অণুহ্রস্ব (অণু বটে কিন্তু কিঞ্চিৎ বৃহৎ)। সেইরূপ চারিটি দ্ব্যণুক যখন একটি চতুরণুক প্রসব করিবে তখন তাহার পরিমাণ হইবে মহৎ-দীর্ঘ। দ্ব্যণুক-সমবেত-শুক্লাদি গুণ চতুরণুকে শুক্লাদিরই জন্ম দিবে বটে কিন্তু তাহাদের যে

অণুহ্রস্ব পরিমাণ নামক যে গুণ সেটি চতুরণুকে দেখা যাইবে না। কার্য্য দ্রব্যের পরিমাণ কারণ দ্রব্যের পরিমাণ হইতে পাওয়া যায় না, কারণ দ্রব্যের সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়।

[নব্য-নৈয়ায়িকেরাও এই কথাই বলিয়াছেন—পারিমাণ্ডল্যভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতং। পারিমাণ্ডল্যমণুপরিমাণং কারণত্বং তদ্ভিন্নানা-মিত্যর্থঃ। অণুপরিমাণং তু ন কস্যাপিকারণম্ তদ্ধিস্বাশ্রয়ারব্ধদ্রব্য পরিমাণারম্ভকং ভবেৎ তচ্চ ন সম্ভবতি। পরিমাণস্য স্বসমান জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণ জনকত্ব-নিয়মাৎ। মহদারব্ধস্য মহত্তরত্ববদণু-জন্যস্যাণুতরত্ব-প্রসঙ্গাৎ॥ এবং পরম মহৎপরিমাণমতীন্দ্রিয়সামান্যং বিশেষাশ্চ বোধ্যাঃ। ইদমপি যোগিপ্রত্যক্ষে বিষয়স্য ন নকারণত্বমিতি —মুক্তাবলী।]

পূর্ব্ব-পক্ষ—কারণ দ্রব্যের শুক্লাদি গুণ যদি কার্য্য দ্রব্যে প্রকাশ পায়, জগতের কারণ ব্রহ্মের চেতনত্ব কার্য্যরূপ জগতের সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় না কেন ?

সিদ্ধান্ত পক্ষ—যেমন পরিমণ্ডল বা পরমাণু হইতে অণুহ্রস্ব দ্ব্যণুক জন্মে ও মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুকাদি জন্মে, পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু জন্মে না, অথবা অণুহ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুক জন্মে, অণুহ্রস্ব জন্মে না, তেমনি, আরম্ভ-কারণ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ জন্মিবে, ইহাতে বৈশেষিকের কি ক্ষতি হইল ?

পূর্ব্ব-পক্ষ—দ্ব্যণুকাদি কার্য্যদ্রব্য ভিন্ন-জাতীয় বিরোধী পরিমাণে আক্রান্ত বলিয়া কারণ-গত (পরমাণুগত) পারিমাণ্ডল্য (পরমাণুর পরিমাণ) ত[illegible] কারণ নহে।

[এর [illegible] হচ্ছে, পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্ব্যণুকাদির পরিমাণ যখন ভিন্ন জাতীয় এবং পরমাণুর পরিমাণ যখন দ্ব্যণুকাদির পরিমাণ জন্মাতে পারে না, তখন পরমাণুর পারিমাণ্ডল্য (পরিমাণ), দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকের যে অণুহ্রস্ব, মহদ্দীর্ঘ পরিমাণ, তাহারও কারণ হতে পারে না। যাহা কারণ নয় তাহা নিমিত্ত বা উপাদন কোনও কারণই হতে পারে

না। সেই জন্য বেদান্তীদের দৃষ্টান্ত ভুল। এবং সেই হেতু ঐ দৃষ্টান্ত ব্রহ্মকে জগতের কারণ রূপে লাগান যেতে পারে না।]

পক্ষান্তরে জগতে এমন কিছু বিরোধী পদার্থ নাই যাহা কারণরূপী ব্রহ্ম-চৈতন্যকে কার্য্যরূপ জগতে অন্য চেতনকে জন্মাইতে দিবে না। যেমন কার্য্যরূপ ঘটে এমন কোনও বিরোধী গুণ নাই যাহা কারণরূপ মৃত্তিকাকে কার্য্যরূপ ঘটে ভিন্ন মৃত্তিকারূপে ব্যপিয়া থাকিতে বাধা দিবে। বাধা দিবার যখন কিছুই নাই তখন চেতন ব্রহ্ম হইতে চেতন জগৎ সৃষ্টি হওয়া উচিত। কিন্তু জগৎ আমরা দেখিতেছি অচেতন। জগতের এ অচেতনত্ব আসিল কোথা হইতে ?

সিদ্ধান্ত পক্ষ—যদি বলি অচেতন যাহা দেখিতেছ তাহাও চেতনের গুণান্তর বা অন্য প্রকারান্তর ?

পূর্ব্ব-পক্ষ—না তাহা বলিতে পার না।—অচেতন কি ? না চেতনের অভাব। অভাব গুণ-পদার্থ নহে। তোমরা যে বলিয়াছিলে পারিমাণ্ডল্য (পরমাণুর পরিমাণ গুণ) যেমন অণুহ্রস্ব, মহদ্দীর্ঘ (দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকের পরিমাণ) প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় গুণের সৃষ্টি করে সেইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু দেখ পারিমাণ্ডল্যও গুণ—অণুহ্রস্ব, মহদ্দীর্ঘও গুণ কিন্তু চেতনত্ব গুণ বটে কিন্তু অচেতনত্ব গুণ নহে, ঐ গুণের অভাব। অতএব যে উদাহরণ দিয়াছিলে তাহা ভুল। এবং যদি ব্রহ্মকে আমরা জগতের উপাদান কারণ স্বীকার করি তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য জগৎকেও চেতনান্তর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

[চতুর্ব্বিংশতি গুণ, যথা,—অথ গুণাঃ রূপং রসঃ গন্ধস্ততঃ পরং। স্পর্শঃ সংখ্যা পরিমিতিঃ পৃথক্ত্বঞ্চ ততঃ পরং। সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বং চাপরাত্মকং। বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো যত্নোগুরুত্বকং দ্রবত্বং স্নেহ-সংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব চ এতে চতুর্ব্বিংশতি গুণাঃ ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ]

সিদ্ধান্ত পক্ষ—বৈশেষিকের এ মত সাধু নহে। পরমাণুব পরিমাণ যেমন দ্ব্যণুকাদির পরিমাণ জন্মাইতে পারে না কারণ দ্ব্যণুকাদির

পরিমাণ ভিন্ন জাতীয় ; সেইরূপ কারণ ব্রহ্মের চেতনত্ব কার্য্য জগতে চেতনান্তর জন্মায় না। ইহাতে কি দৃষ্টান্তের ভুল হইল ? (আর আমরা স্বীকার করি জড় জগৎ চেতন ব্রহ্মের উপর অধ্যস্ত, আমরা ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করি না।)

পরন্তু বলিলে যে দ্ব্যণুকাদির পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ হইতে ভিন্ন, সেই হেতু পারিমাণ্ডল্য (পরমাণুর পরিমাণ) অণুহ্রস্ব (দ্ব্যণুকের পরমাণ) ও মহদ্দীর্ঘ (ত্র্যণুকাদির পরিমাণ) প্রভৃতি পরিমাণের কারণ নহে—তোমাদের এ কথা ঠিক নহে। কেন না কার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া একক্ষণ গুণ-বর্জ্জিত অবস্থায় থাকে। পরে তাহাতে গুণের জন্ম হয়। তাহাই যদি হয়, তবে দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যে অণুহ্রস্ব পরিমাণ গুণ জন্মিবার পূর্ব্বে যে ক্ষণ তাহারা নির্গুণ-অবস্থায় থাকে সেই ক্ষণে অণুর পরিমাণ ঐ ভিন্ন পরিমাণের কারণ না হইবার বাধা কি ? কারণ সে সময় তাহাতে বিরুদ্ধ পরিমাণ থাকে না।

তোমরা যখন স্বীকার কর অণুহ্রস্ব পরিমাণ প্রভৃতিরও কারণ আছে এবং পারিমাণ্ডল্য সকল অন্য পরিমাণ জন্মাইতে ব্যগ্র থাকে সেই হেতু তাহারা স্বসমানজাতীয় পরিমাণ না জন্মাইয়া ভিন্ন পরিমাণ জন্মায় তখন তোমাদের বলিতে বাধা কি যে পারিমাণ্ডল্যই অণুহ্রস্ব, মহদ্দীর্ঘ প্রভৃতি পরিমাণের (অসমবায়ী) কারণ ?

কণাদ সূত্র করিয়াছেন, কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়-বিশেষাচ্চ মহৎ (বৈশেষিক সূত্র। অ ৭। আ ১। সূ ৯), তদ্বিপরীতমণু (বৈ।৭।১।১০), এতেন দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে (বৈ, ৭।১।১৭)—কারণের অনেকত্ব প্রযুক্ত, কারণের মহত্ব নিবন্ধন, অবয়ব সংযোগের শৈথিল্য হেতু কার্য্যের মহত্ব উৎপন্ন হয়। অণু এতদ্বিপরীত। দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইল।

সমুদয় কারণ-গুণ কার্য্যেতে সমবায়ী সম্বন্ধে থাকে। সে সকল গুণের কোনও বিশেষত্ব থাকে না। কিন্তু পরমাণুর পরিমাণে এবং দ্ব্যণুকাদির পরিমাণে যখন বিশেষত্ব দেখা যায় তখন তাহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ নাই বুঝিতে হইবে। পরমাণুর যে পরিমাণ পারিমাণ্ডল্য

তাহা স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক গুণ, গুণী তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই পারিমাণ্ডল্য কখনও অণুহ্রস্ব, মহদ্দীর্ঘের জনক হইতে পারে না। বুঝিতে হইবে সংযোগের বিভিন্নতা হেতুই পরিমাণের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা বলি, কারণ-ভূত পরিমণ্ডল যেমন নিজের স্বভাব পারিমাণ্ডল্য ত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যও স্বভাব প্রযুক্ত চেতনান্তরের অজনক।

এখন আমরা দেখিতেছি, কারণের গুণ, যে কার্য্যে সব ক্ষেত্রেই স্বজাতীয় গুণের জনক হইবে এমন বলা যায় না। চুণ এবং হলুদ মিশাইলে যে বিভিন্ন গুণের সৃষ্টি করে তাহা কারণে ছিল না। অতএব চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের কারণ বলিতে কোনও বাধা নাই। এই প্রকারে স্বীয় মত সমর্থিত হইল। অতঃপর পরমত খণ্ডিত হইবে।

বাসুদেবানন্দ

সমালোচনা

১। সিন্ধু-সরিৎ। কবিতা পুস্তক —শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত। মূল্য দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান—এন, এম, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং। ২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ; কলিকাতা।

অনেকগুলি কবিতাই বেশ ভালো। কবিতায় স্বাভাবিক গতি ও ছন্দ আছে। "গৃহ ছাড়ার গান"টি অতি সুন্দর হইয়াছে।

জীবনের নিত্যকার ক্ষুদ্রতার অভিশাপ হতে
মুক্ত আমি—আজ মুক্ত আমি।
আজিকার দিন যামী
আমারি একান্ত আপনার ;

আজিকার সূর্য্যালোক, আজিকার বিহঙ্গের গান
মেঘলেশহীন নীল বিরাট বিমান—
এ আমার বিধাতার দান।
শ্যাম শোভা এই বসুধার
আমারি ভোগের উপচার।
গিরিঅঙ্গ আঁকড়িয়া কলগানে চলে তরঙ্গিনী ;
দক্ষিণ সমীর গাহে মর্ম্মর রাগিণী ;
উল্লোলকল্লোল-ভাষী অগাধ অবাধ পারাবার,
উর্দ্ধপানে জল মাগি মূক কণ্ঠে করে হাহাকার
তৃষাদগ্ধ সাহারার কোটি বালুকণা,
আজিকার শ্রান্তিহীন পিক
এরা সব মোর বৈতালিক।

* * * *

কোনো প্রয়োজন নাহি। গৃহ থাক্ যেথা আছে পড়ি।
রন্ধ্রহীন বদ্ধবায়ু অন্ধকূপ আঁধি
তার মাঝে আপনারে বাঁধি
নিত্য মৃত্যু কে পোহাবে বল ?
গৃহের প্রাঙ্গণ শেষে মুক্তি আছে, এস সেথা চল,
তৃপ্তি আছে কামনার শেষে
অনন্ত জীবন আছে বাহিরের আলোকের দেশে
চল চল তাহার উদ্দেশে।

কবিতাটি পাঠকের মনে উচ্চভাব ও অসীমের স্পর্শ আনিয়া দেয়। কতকগুলি কবিতার ভাব মামুলী, কিন্তু উহাদের প্রকাশে অভিনবত্ব আছে।

নবীন কবির সাফল্য কামনা করি।

২। **কল্যাণের পথ**—শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ।৷৹ আনা। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ব্রহ্মচর্য্যকে 'কল্যাণের পথ' রূপে নির্দ্দেশ করিয়া, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে ব্রহ্মচর্য্য

রক্ষা করা যাইতে পারে তাহাই দেখাইয়াছেন। তিনি যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে আমাদের মনে হয়, ভগবদ্‌চিন্তাকে তাহাদের অন্যতমরূপে নির্দ্দেশ করিলে ভাল হইত। সৎসঙ্গে ও সদ্‌গ্রন্থাদিপাঠে উহা আংশিকরূপে সফল হইলেও, ব্রহ্মচর্য্যপালনেচ্ছু মাত্রেই উহা অপেক্ষা আরও কিছু শক্তিপ্রদ জিনিষ, যথা—ধ্যান-জপাদি সহায়ে ভগবদ্‌ভজনের আবশ্যকতা বোধ করিবেন।

গ্রন্থকার, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, গান্ধী মহারাজ প্রভৃতির ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে মন্তব্য সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল পূত চরিত্র মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইয়া পাঠক মাত্রেই আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। তবে জনৈক ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য-সাধন হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে সত্য ও উপাদেয় বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মচারিজী কামদমনার্থে অহঙ্কারের আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন, "অতএব কামকে দমন করিবার জন্য অহঙ্কার যতদূর বৃদ্ধি করিতে পার করিবে। অহঙ্কার কামের প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা অতএব অহঙ্কারের পুষ্টি সাধন করিবে।" আমরা কিন্তু শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের নিকট হইতে ইহার বিপরীত ভাবই অবলম্বনীয় বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি।

যাহা হউক পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইলেও, ইহা তরুণ বয়স্ক নরনারীগণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে। এইরূপ পুস্তকের যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল।

৩। *বঙ্গলক্ষ্মী*—বৈশাখের সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মহিলাগণের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীভগবান উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি করুন। কিন্তু ইহার সম্পাদিকা শ্রীমতী লতিকা বসুর (বি, লিট, অক্সন) নিকট আমাদের একটি অনুযোগ এই যে, তিনি যেন ভবিষ্যতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিত "ব্রহ্মবাদিনী গার্গী"র ন্যায় প্রলাপ-প্রবন্ধ সম্বন্ধে সতর্ক হন। গার্গী উপাখ্যান বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে। এই বেদান্ত-শাস্ত্র হিন্দুর চরম গ্রন্থ, ইহা লইয়া দেবতারাও ব্যবসা করিতে সাহস করেন না, সেই জন্য ঐ সম্বন্ধে

জানিয়া লেখনী ধারণ করা উচিত। একে ত পুরাণের গল্পের বোঝায় আমাদের শাস্ত্রের সত্য চাপা পড়িয়া আছে, তাহার উপর যদি ইদানীং আরও কাল্পনিক গল্প চাপান যায় তাহা হইলে শাস্ত্রের মর্ম্ম একেবারে তলাইয়া যাইবে।

জনক "সুবর্ণ মণ্ডিত ধেনুবৎস সকল ও তৈজষপত্রাদি" দান করেন নাই—তিনি দশ দশ (পাদা) তোলা সোনা বাঁধিয়া এক সহস্র গরু সভার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্যকে গরু লইয়া যাইতে আদেশ করিলে জনকের হোতাশ্বল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসি'—যাজ্ঞবল্ক্য 'তুমি কি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, 'নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মো গোকামা এব বয়ং স্ম'—আমরা ব্রহ্মিষ্ঠগণকে নমস্কার করি, আমরা গোকাম। লেখক যে উত্তরটি লিখিয়াছেন, 'আমি ব্রহ্মকে জানি বা জানি না' উহা 'কেন'-উপনিষদের কথা।

গার্গীর প্রথম প্রশ্ন—এই দৃশ্য জগৎ কিসে ওতপ্রোত রহিয়াছে? এইরূপ বহু সূক্ষ্ম প্রশ্নের পর গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মলোক কিসে ওতপ্রোত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'গার্গি মাঽতিপ্রাক্ষীঃ'—গার্গি অতিপ্রশ্ন করিও না 'তে মূর্দ্ধা ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং'—অতি প্রশ্ন করিলে তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে।

গার্গী দ্বিতীয় বার বলিয়াছিলেন,—আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন করিব ইহার উত্তর যদি তিনি দিতে পারেন তাহা হইলে আপনাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। কাশ্য যেমন উগ্রপুত্র উজ্জ্যাকে দুইটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন আমিও তেমনি দুইটি প্রশ্নের দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্যকে বিদ্ধ করিব। দ্যুলোক, ভূলোক এবং বাক্য কাহাতে ওতপ্রোত?—আকাশে। আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত? —অক্ষরে। এই অক্ষরকে যাজ্ঞবল্ক্য নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। গার্গী ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহুমন্যেধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বং ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি'—হে ভগবন ব্রাহ্মণগণ! আপনারা নমস্কারের দ্বারা ইঁহার

হাত হইতে ত্রাণ পাইলে বহু ভাগ্য মনে করিবেন—আপনারা কেহই ইঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। লেখক যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে যে উত্তর দিয়াছেন তাহাও 'কেন'-উপনিষদের কথা।

গার্গীর প্রিয় সখী মৈত্রেয়ী--লেখক কোথায় পাইলেন? এবং গার্গীর সহিত সীতার দেখা হইয়াছিল ইহাই বা কোথায় আছে? "সোঽহং-তত্ত্বমসি অদ্বৈতবাদিগণ গার্গীর সহিত তর্ক করেন"—কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য যে নিজেই অদ্বৈতবাদী। জটাজুটধারী সাধু আসিয়া গার্গীর পাণি-প্রার্থনা করিলেন—ইহাও মিথ্যা কথা। বৈদিক যুগে জটাজুটধারী সাধুর কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না, একে সাহিত্যের anachronism বলে।

মহিলাদের কাগজে হাত না পাকাইয়া, লেখক যদি অন্যত্র হাত পাকান তাহা হইলে ভাল হয়।

৪। বিশ্ববাণীর প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন এম্-এ মহাশয় 'বিবেকানন্দে শক্তি-সঞ্চার' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "কর্ম্মযোগ" "জ্ঞানযোগ" "ভক্তিযোগ" প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ তিনি বাংলা ভাষায় রচনা করেন—কিন্তু এগুলি তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক অনুদিত। তাঁহার বাংলা রচনা "বীরবাণী"র কয়েকটি কবিতা, "বর্ত্তমান-ভারত", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", "পরিব্রাজক" ও "ভাববার কথা"।

৫ মেসার্স পি এম্ বাকচি প্রকাশিত এবং শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শক্তি সাধনা" "বামাক্ষেপা" এবং "রসাল" ও একখানি গীতা সমালোচনার জন্য আমরা পাইয়াছি।

কার্য্য-বিবরণী

কাশী—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯২৬ সালের কার্য্য-বিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য-বর্ষে এখানকার কার্য্য নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত :—(১) ইন্‌ডোর জেনারাল্ হাসপাতাল (২) বৃদ্ধদিগের আশ্রম (৩) অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধাগণের আশ্রম (৪) বালিকা-

নিবাস (৫) পক্ষাঘাত রোগিগণের আবাস (৬) অনাথ ধর্ম্মশালা, (৭) আউট্‌ডোর ডিস্‌পেন্‌সারী (৮) সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বৃদ্ধা অকর্ম্মণ্যা নারীগণকে অর্থাদির দ্বারা সাহায্য প্রদান (৯) আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিকার। ১৯২৫ সালে ইন্‌ডোর্ হাসপাতালে ১৪৫৬ জন রোগী সেবাশুশ্রূষা পাইয়াছিলেন, ১৯২৬ সালে ১৬৭৯ জন পাইয়াছেন। আউট্‌ডোর সার্ভিসের দ্বারা যাঁহারা চিকিৎসিত হইয়াছেন ও সাহায্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ১৯২৫ সালে ১৮,৫৯৭ ও ১৯২৬ সালে ২২,৩২৫।

কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আশ্রমের মাসিক খরচ প্রায় ২৪০০ টাকা। বর্ত্তমানে ইহার অর্থাভাব। যাহাতে এই মহৎ লোকহিতকর কার্য্য স্থায়িভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। আশ্রমের কার্য্যকরী সভা সর্ব্বসাধারণের নিকট নিবেদন করিতেছেন যে, এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যতটুকু পারেন সাহায্য করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। যিনি যাহা কিছু দিবেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন :—অনারারী সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কাশী।

সংঘ-বার্ত্তা

বালিয়াটি (ঢাকা) রামকৃষ্ণ মঠে ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব দিবসে নবনির্ম্মিত অষ্টকোণ বিশিষ্ট মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিষ্ঠা, পূজা-কীর্ত্তনাদি সহ নির্ব্বাহিত হয়। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ, স্বামী অক্ষরানন্দ ও স্বামী রামেশ্বরানন্দ মহারাজ গমন করিয়া আশ্রমস্থ অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ

করেন। উৎসব দিবসে প্রায় সাত শত দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ পান এবং ঝড় বৃষ্টি সত্ত্বেও চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম হইতে বহু ভক্তের সমাগম হয়।

* * *

কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী কেশবানন্দ বিগত ২রা জুলাই শনিবার ইহলোক হইতে অভয়ধামে গমন করিয়াছেন। জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর পল্লীসংস্কারকার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শরীরত্যাগ কালে তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইয়াছিল।

* * *

বিগত ২০শে জুন বৃহস্পতিবার ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য শরীর ত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীভগবানের চিরসান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন।

নিবেদন

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী স্বর্গীয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের নিকট 'লক্ষ্মী দিদি' নামে সুপরিচিত। মহাপ্রয়াণের দুই বৎসর আগে পুরীধামে বাস করিবার জন্য তিনি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত স্বর্গদ্বারস্থ 'লক্ষ্মী নিকেতনে' প্রায় দুই বৎসরকাল পরম শান্তিতে বাস করিয়া গত ১২ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৩২ সাল, ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ সালে ঐ স্থানেই অমরধামে যাত্রা করেন। তাই আমরা উক্তস্থানে তাঁহার স্মৃতি-মন্দির আরম্ভ করিয়াছি এবং এই কার্য্যে ভক্তবৃন্দের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী পাল, লক্ষ্মী-নিকেতন, স্বর্গদ্বার, পুরী অথবা—স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধন কার্য্যালয় ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শিষ্যবৃন্দ

কবিবর ক্ষীরোদপ্রসাদ

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে জানাইতেছি, আমাদের পরম বন্ধু, শ্রদ্ধাস্পদ, কবিবর, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলির গৌরবস্থল, নিষ্ঠাবান তপস্বী ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় বিগত ৩রা জুলাই ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'উদ্বোধন' ছাপা হইবার পরে আমাদের নিকট এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ আসিয়াছে। পরবর্ত্তী সংখ্যায় কবিবরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল।

কথাপ্রসঙ্গে

মহিলা-আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়

কাশীবাসিনী তিনটি বাঙ্গালী বিধবা মহিলা আয়ুর্বেদ-সম্মিলনীর সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নারীজাতির ভিতর আয়ুর্বেদ শিক্ষার প্রচারকল্পে কাশীধামে প্রায় চারি বৎসর হইল একটি আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিনা বেতনে ও বিনা খরচে ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া এবং বোর্ডিংয়ে রাখা হয়। খোরাকী বাবদ মাসে আট টাকা হইতে দশ টাকা খরচ পড়ে। নিতান্ত অসমর্থা ছাত্রীদিগকে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়। গত তিন বৎসরের মধ্যে এই বিদ্যালয় হইতে পাঁচটি ছাত্রী শেষ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করিয়াছেন।

মহিলাগণ-পরিচালিত এইরূপ প্রতিষ্ঠান বোধ হয় এই সর্ব্ব প্রথম। অনেক মহিলা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জন করেন, কিন্তু স্বজাতীয়াগণের ভিতর তাঁহাদের অধীত বিদ্যা প্রচারকল্পে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত মনোযোগী হন নাই। সুতরাং এই তিনটি বাঙ্গালী মহিলার সাধু প্রচেষ্টা শিক্ষিতা নারীগণকে এইরূপ জন-হিতকর কার্য্যে উৎসাহ ও আদর্শ দান করিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, নারীজাতির উন্নতির জন্য যেন নারীগণ সচেষ্ট হন। ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য কোন বৈদেশিক শক্তির উপর নির্ভর করা যেমন অপমানজনক, সেইরূপ নিজেদের দীনতা

ও অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য নারীজাতি যদি পুরুষগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন—তাহাও লজ্জাকর এবং আত্মমর্য্যাদার হানিকারক। শুধু তাহাই নহে, চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে এবং কার্য্যক্ষেত্রে না নামিলে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ কখনো হইবে না। দেশের এই দুর্দ্দিনে শিক্ষিতা মহিলাগণ নিজ নিজ সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী সম্মিলিত ভাবে যদি তাঁহাদের ভগিনী ও দুহিতৃগণের কল্যাণ-মানসে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে জাতির সুদিন ফিরিয়া আসিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

ছাত্রীগণকে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এদেশে কোন পৃথক স্কুল বা কলেজ আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমরা যতদূর জানি, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হইলে ছাত্রীগণকে পুরুষ-অধ্যাপকের নিকট, ছাত্রগণের সহিত এক সঙ্গে, অধ্যয়ন করিতে হয়। ছাত্রীগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। আরো এক কথা, আমাদের দেশে নারীজাতির উপর পুরুষগণের যতদিন না উপযুক্ত সম্মানবোধ এবং শ্রদ্ধার উদয় হইতেছে ততদিন এইরূপ ব্যবস্থা সামাজিক হিসাবেও ক্ষতিকর। ছাত্রীগণকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য পৃথক স্কুল ও কলেজের এদেশে বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত যে কয়টি মহিলা-স্কুল-কলেজ আছে, সেই সমস্ত স্কুল-কলেজে একটি করিয়া পৃথক বিভাগ থাকা উচিত। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে তাঁহারা সেখানে ইতিহাস, সংস্কৃত, গণিত বা বিজ্ঞানের ন্যায় চিকিৎসা-বিদ্যাও শিক্ষা করিতে পারিবেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে কোন মহিলা-চিকিৎসালয়ে কিছুদিনের জন্য তাঁহাদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা থাকিবে।

নাগরিকগণ বা কোন সম্প্রদায়বিশেষ কর্ত্তৃক পরিচালিত মহিলা-স্কুলেও এইরূপ বিভাগ থাকিলে ভাল হয়। ছাত্রীগণ সেখানে চিকিৎসা-বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভ না করিলেও যদি ঐ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বা ধাত্রীবিদ্যা অর্জ্জন করেন তাহা হইলেও মহিলাগণের ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনে উহা অনেক কাজে লাগিবে। কারণ, অনেক জননীর, শিশু-

পরিচর্য্যায় অজ্ঞতা থাকায় তাঁহাদের অনেককে অকালে সন্তান-সন্ততি হারাইতে হয়। ভবিষ্যৎ জননী বালিকাগণের চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে দেশে শিশু-মৃত্যু বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে এবং পারিবারিক সুখ-সাচ্ছন্দ্যও বৃদ্ধি পাইবে। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, ছাত্রীগণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

কাশীর মহিলা-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী বিধবা-মহিলা-তিনটি তাঁহাদের স্বজাতীয়াগণের ভিতর কর্ম্মের একটি অভিনব পন্থা খুলিয়া দিয়াছেন। কাশীতে অনেক বাঙ্গালী বিধবা মহিলা ধর্ম্মার্জ্জন করিবার জন্য আজীবন বাস করেন। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যা শিক্ষায় যদি তাঁহাদের অবসর সময় নিয়োজিত করেন এবং কাশীর বাহিরের অন্যান্য স্থানেরও ছাত্রীগণ যদি এই বিদ্যালয় হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন অথবা প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের অধীত বিদ্যা কাজে লাগাইয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোযোগী হন, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

স্ত্রী-শিক্ষার বহর

অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশে মুসলমান-রমণী হইতে হিন্দু-রমণী অধিক শিক্ষিতা। তাঁহাদের অনুমান কিছু সত্য এবং কিছু অসত্য। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা বুঝা যাইবে। *

স্কুলের শিক্ষা		হিন্দু	মুসলমান
প্রাইমেরী শ্রেণী	১	৯৬৩৩০	১৬০২৮৩
”	২	২৩২৪৮	২০১৫৩
”	৩	১১১৪০	৬৩৭৩
”	৪	২৫৮৬	৮৬০
”	৫	১০১৫	১৯০
মধ্য শ্রেণী	৬	৭৭৩	৭১
”	৭	৫০৬	৪২

* ১৯২৫—২৬ সালের বঙ্গীয় শিক্ষাবিবরণী হইতে উদ্ধৃত।

„	৮	২৯৪	৮
„	৯	২৪৯	৮
„	১০	২১০	১০
„	১১	২০৬	০

বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা	হিন্দু	মুসলমান
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী	৬৭	১
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী	৫১	১
উপাধি পরীক্ষা		
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী	২৮	০
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী	৩৬	০
পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী	০	০

পাঠক দেখিবেন, উচ্চশিক্ষায় হিন্দু-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হইলেও প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান-ছাত্রীর সংখ্যাই অধিক। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, মুসলমান-নেতাগণ নিজেদের সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া, এবং স্ত্রীশিক্ষার অভাবই ইহার অন্যতম হেতু বুঝিয়া স্বজাতীয়া বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সম্প্রতি যেমন চেষ্টিত হইয়াছেন, হিন্দু-নেতাগণ সেরূপ বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন না; তাই মুসলমান-সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েকবর্ষ পরে দেখা যাইবে, উচ্চ শিক্ষাতেও হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান-বালিকার সংখ্যা অধিক, কারণ প্রাথমিক শিক্ষায় হিন্দু-বালিকার সংখ্যা হ্রাস পাইলে উচ্চ শিক্ষা-ক্ষেত্রে কিরূপে এবং কতদিন তাঁহারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখিবেন? অবশ্য ইহা আমরা চাহি না যে, হিন্দু-বালিকা চিরদিনই মুসলমান-বালিকা অপেক্ষা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাধান্য রক্ষা করুক, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য—বর্ত্তমান হিন্দু-নেতাগণের নিজ সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার কল্পে ঔদাসীন্য বাঞ্ছনীয় নহে। তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম অধুনা পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন করিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, সেই উদ্যম ও উৎসাহ দেশের শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হউক এবং কিছু কার্য্যকরী ফলদান করুক—ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

অভিরামের গীতি

(দুই)

বসেছিলে তুমি সিন্ধু পারে মুগ্ধনেত্র আকাশে রাখিয়া,
এই পারে বসেছিনু আমি পিয়াসার অঞ্জলি পাতিয়া।
চারিদিকে রহস্য উচ্ছ্বাস— নির্ম্মম সে অসীমের হাসি
আমার সে অঞ্জলির মুখে নিরাশ ঢালিল রাশি রাশি!
পলকের তীব্র অভিমান কখন যে ঢেকেছে নয়নে,
কোথা তুমি কোথা আমি, সাকী, কিছুই ত ছিল না স্মরণে!
অসীমকে বেঁধেছ সীমায়, মহাসিন্ধু করেছ পিয়ালা,
কৃতার্থ করিতে আজি মোরে কখন আসিলে তুমি বালা?

*

এই সেই এই সেই, সাকী, রেখেছিল দূরে আপনারে,
এই সেই এই সেই, সাকী, ধরেছিল সুর-ছেঁড়া-তারে।
এই সেই এই সেই তুমি, কান্তমূর্ত্তি শান্ত মদিরার,
ছিন্নতারে হইয়া বন্ধনী করেছিলে একে আপনার।
দূর ওই দূরে বসে কাঁদে সমীপের দেখিয়া উল্লাস,
পলকের প্রভাব দেখিয়া নিস্তব্ধ হয়েছে বারোমাস!
দিন, মাস, বরষের সীমা কল্পের নিশ্বাসে হল লয়!
সত্বর সত্বর দাও, সাকী, পাত্রস্থিত তোমার অভয়!

*

ওই নীল পাহাড়ের তলে ওই যে কোমল শ্যাম রেখা,
চন্দনের টিপমত মাঝে ওই যে কুটীর যায় দেখা,
ওইখানে কিশোর স্বপন গেয়েছিল পরশের গান;
কিশোরী-অধর-ছোঁয়া সুরা প্রথম সে করেছিল পান।

নিশীথের নীরবতা পাশে মুক্তবেণী আঁধার সম্ভার।
অপাঙ্গের বাচাল ইঙ্গিতে মৌন ঝরা দীপ্তি তারকার!
স্বপ্নধরে সুপ্ত করতলে পুলক চপল অলকে মুখ ঢাকি,
আশার দোলায় দুলিয়ে হৃদয় মোর, যে ছিল গো, সেই কি তুমি সাকী!

*

গৃহদ্বারে সুধাপাত্র করে, আঁখি দুটি আলসে ভরিয়া?
কতক্ষণ এই মত, সাকী, কতক্ষণ আছ দাঁড়াইয়া?
মাথা দিয়ে সন্ধ্যারুণ কোলে শুয়েছিনু ঘুমন্তের মত
আঙ্গিনায় কার যেন গান করে দিয়েছিল আঁখি নত
কার গান ওগো নীরবতা? মুখর কি হইল শিঞ্জিনী?
পাত্র হ'তে নাচিল কি সুরে স-তরঙ্গ নূতন কাহিনী?
ইঙ্গিতের রঙিন আলাপ ধরিল কি ইমনের তান?
সুধাস্পর্শে তোমার, কল্যাণি, মাতাল কি হইল কল্যাণ?

*

ওইখানে লয়ে চল, দেবি, নিরালার পথ ধরে ধরে;
মনে হয় প্রথম স্বপন এখনো জাগিয়া আছে ঘরে।
মিলনের প্রথম পুলক এখনো দুলিছে বাতায়নে,
মঞ্জীরের দুষ্ট মুখরতা ধরে আছে নিশ্বাস পবনে!
একটু মন্থর কর গতি, লয়ে চল না হ'তে সকাল,
নতুবা ঊষার কলরবে বসুন্ধরা হইবে মাতাল!
ও-ঘরের মর্ম্মকথা, ওগো, এখনো যে জানে না দুনিয়া—
জানিলে, তোমার পদতলে এখনি সে উঠিবে দুলিয়া।

পণ্ডিত—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

কবিবর ক্ষীরোদপ্রসাদ

কবিবর চলিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা যে আঘাত পাইয়াছি তাহার আলোচনা করিব না। হৃদয়ের ব্যথা ভাষায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই।

বাংলার অন্যতম গরিষ্ঠ কবি প্রায় চল্লিশ বৎসর সাহিত্য-গগন স্বীয় প্রতিভা-কিরণে উজ্জল করিয়া বিদায় লইলেন। মহাকবি গিরীশচন্দ্রের পর নাটক-রচনায় এরূপ সিদ্ধহস্ত আর কেহই ছিলেন না। ক্ষীরোদপ্রসাদের অভাব মোচন করিবার মত সাহিত্য-ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে আর কেহই নাই।

কবিবর বাংলা ১২৭১ শকে খড়দা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্যারাকপুর স্কুলে বাল্যশিক্ষা শেষ করিয়া মেট্রোপলিট্যান কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জেনারল্ এসেম্ব্লী কলেজে কেমেষ্ট্রীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি আর, জি, করের মেডিক্যাল স্কুলে (অধুনা—বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ) কিছুদিন রসায়ন-শাস্ত্রের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। জেনারল্ এসেম্ব্লী কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময় প্রথম তাঁহার কাব্য শক্তির স্ফুরণ হয় এবং তদবধি অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাব্য রঙ্গমঞ্চে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর। নবীন কবির অপূর্ব্ব কাব্য রসাস্বাদে বঙ্গীয় কবিকুঞ্জ ও রঙ্গমঞ্চ আনন্দ-জয়গানে মুখর হইয়া উঠিল। তাঁহার গভীর স্বদেশ প্রেম তদীয় কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়া একদিন সমস্ত বাংলার নরনারী-হৃদয়ে স্বদেশিকতার অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। স্বদেশীর আদিযুগে—যখন বাংলার অন্তর-পুরুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব পণ করিতেও প্রস্তুত তখন শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' সেই জাতীয় সাধনায় যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি শ্রদ্ধাপূর্ণ

হৃদয়ে বাঙ্গালী চিরদিন মনে রাখিবে। এই বৃদ্ধ বয়সেও স্বদেশের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করিয়াছি। জনসাধারণ তাঁহাকে একজন উচ্চাঙ্গের কবি বলিয়াই জানেন, কিন্তু 'প্রতাপাদিত্যের' নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাঁহাকে 'স্বদেশ-প্রেমিক-কবি' বলিয়া বুঝিতে কাহারও অণুমাত্র বিলম্ব হইবে না। বাংলার মাটীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্মভূমির উপর তাঁহার কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা এই কয়েকটি ছত্রে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে;—"আর কেন চণ্ডীবর! এখনও দেহি! মা আমার দিতে বাকি রেখেছেন কি! যমুনাজলসম্পূর্ণা অমৃতরূপিণী ভাগীরথী যাঁর কণ্ঠহার, চির তুষার-ধবলিত হিমাচল যাঁর শিরোভূষণ, চির শ্যামল শস্য-সম্পদ যাঁর অঙ্গাবরণ, এই নিবিড় কৃষ্ণকান্তি বনশ্রীতে যিনি কুটিলকুন্তলা, অনন্ত-প্রসারী নীলাম্বুরাশির শুভ্র তরঙ্গফেনরেখা যাঁর মেখলা, সে বঙ্গমাতার কিসের অভাব চণ্ডীবর। যাঁর জলে স্বর্গ, ফলে সুধা, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত জীবের প্রাণদায়িনী শক্তি, যাঁর অঙ্গে শিরীষ কুসুমের কোমলতা, যাঁর ললাট শশিসূর্য্য-করোজ্জ্বল, যাঁর সমীরণ মধুগন্ধ কুসুম শীকর বাহী, সে বঙ্গের জন্য আর ধনরত্ন ভিক্ষা কেন? চণ্ডীবর! মায়ের অন্যরূপ ধ্যান কর।"

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে আর একটি অনুধাবন করিবার বিষয়—তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ। তিনি নিজে একনিষ্ঠ তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। দিবসব্যাপী সমস্ত কর্ম্মের অবসানে, নিস্তব্ধ রজনীতে, নক্ষত্রখচিত বিরাট অম্বরের পানে চাহিয়া কবি-হৃদয় যখন অসীমের ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন এই রহস্যময় পৃথিবীর আদিজননী অপূর্ব্ব রহস্যময়ী মহামায়ার ধ্যানে তিনি মগ্ন হইতেন। তাঁহার সেই সাধনা, সেই ব্রাহ্মণত্ব তাঁহার 'ভীষ্ম' নাটকের স্থানে স্থানে তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। ভীষ্ম, পরশুরামকে বলিতেছেন,—

"অদ্যাবধি পবিত্র শরীরে
ব্রহ্মবিদ্যা সুমহৎ তপস্যাচরণ
ব্রহ্মতেজ বেদ সনাতন—
যাহা কিছু করেছে অর্জ্জন ঋষিরাজ

তাহে না হানিব আমি শর।
শস্ত্র ধ'রে ক্ষত্রিয়ত্ব করিয়া গ্রহণ,
ক্ষত্রতেজ যাহা কিছু করিলে ধারণ,
শুদ্ধ মাত্র তারে—
বিক্ষত করিব আমি বাণের প্রহারে।"

ব্রাহ্মণ পরশুরাম ব্রাহ্মণের তপস্থা বর্জ্জন করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই ভীষ্মের মুখে কবি বলিলেন, "আমি শিষ্য, গুরুর ক্ষাত্র মনোবৃত্তি ধ্বংস করিয়া, ব্রাহ্মণত্বের বেদীতে বসাইয়া তাঁহাকে মহীয়ান করিয়া তুলিব।" অতঃপর নারদ পরশুরামকে স্বধর্ম্ম গ্রহণের উপদেশ দিয়া বলিতেছেন,—

"আজি হতে কর ত্যাগ ক্ষত্রিয় আচার,
ফেলে দাও অস্ত্র ভূমিতলে,
ব্রাহ্মণের মহাস্ত্র—বিনয়
পরাজয় জয়—
অপমান—মানের গরিমা।"

ক্ষীরোদপ্রসাদের বহু নাটকে এইরূপ গভীর তত্ত্ব ও উচ্চ আদর্শ নিহিত আছে। কিন্তু তাহা বিশেষ রূপে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। তাই তাঁহার 'আলিবাবা' 'প্রমোদরঞ্জন' 'রঞ্জাবতী' 'নন্দকুমার' 'পলাসীর প্রায়শ্চিত্ত' 'রঘুবীর' 'আলামগীর' 'বৃন্দাবন বিলাস' 'মিডিয়া' 'কুমারী' 'জুলিয়া' 'সাবিত্রী' 'কবি কাননিকা' 'উলুপী' 'নারায়নী' 'পতিতার সিদ্ধি' 'গুহামুখে' 'নিবেদিতা' 'অশোক' 'বাসন্তী' 'বরুণা' 'বাংলার মসনদ' 'বিরামকুঞ্জ' 'দুর্গা' 'মহামায়া' 'জয়শ্রী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটক ও উপন্যাস সমূহের কথা বিস্তারিত ভাবে না বলিয়া, তাঁহার শেষ নাটক 'নর-নারায়ণ' সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। কারণ তাঁহার আজীবনের সমস্ত সাধনার ফল এই রত্ন পেটিকার মধ্যে তিনি সযত্নে রাখিয়া গিয়াছেন। ক্ষীরোদবাবু বহুদিন বহুবার আমাদের বলিয়াছেন, "কর্ণ-চরিত্রে আমি নিজের চরিত্রই আঁকিয়াছি। আমি প্রথমে শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস

করিতাম না, তাই কর্ণকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার মুখে আমি নিজেরই সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছি,—

"অন্তর্যামী বিভু নারায়ণ। বাসুদেব!
তুমি যদি সেই নারায়ণ, যদি এই
অসম্ভব সত্যই সম্ভব হয়, ওই
ক্ষুদ্রদেহের ভিতরে সত্যই যদি হে
বিরাট পশিয়া করে লীলা, এ অন্তরে
কি আছে আমার, সমস্ত অবশ্য জ্ঞান
তুমি। এই যে আমার দেহ আবরণ
এত পারিবে না—কোন মতে পারিবে না,
এ হৃদয়ে তোমার দর্শনে দিতে বাধা।
এই সত্য আবিষ্কারে করেছি সর্ব্বস্ব
দান পন। এই সত্য আবিষ্কারে আমি
জীবন মরণ যুদ্ধ করিতে চলেছি,
একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সথায়।
হে স্বরাট, যদ্যপি বিরাট সত্য তুমি,
নিশ্চয় একথা জান—নরের অবধ্য
হয়ে এসেছি ধরায়। শুধু নর?
শ্রেষ্ঠ ঋষি ব্রহ্মজ্ঞ রামের সে কথা যদ্যপি
সত্য হয়, হে মায়া-মনুষ্য নারায়ণ!
তোমারও অবধ্য আমি। সেই আমি
কবচ কুণ্ডলধারী রাধার নন্দন
যদি মরি অর্জ্জুনের বাণে—যদি—যদি—
মরি, তবে, সেই মৃত্যু মুখে বাসুদেব!
তোমারে বলিব নারায়ণ।"

কবিবর উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিতেন, "একদিন—তখন এখানে প্রথম আসা যাওয়া করি, পূজনীয় শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ঠাকুরকে আপনার কি মনে হয়?' আমি বলেছিলাম,—

'মানব, মানব, তবে—
মুক্তকণ্ঠে বলি আমি—অপূর্ব্ব মানব।
ধরণীতে বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।
সৃষ্টি হতে আজিও পর্য্যন্ত এমনটি
আসে নাই আর —এই পূর্ণ মানবতা'।"

তারপরই তিনি হাসিয়া বলিতেন, "কিন্তু, ঠাকুর শেষে কৃপা করে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাই কর্ণের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আমিই বলেছি—

"আর ত মানব বলা চলে না তোমায়
বাসুদেব! * * * তুমি ভগবান।"

ক্ষীরোদপ্রসাদের সমস্ত জীবন সাহিত্য-সাধনার একটি অখণ্ড অনবদ্য ছবি। কিন্তু তাঁহার কাব্য-জীবনের অন্তরালে যে অধ্যাত্ম জীবন ছিল তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ ব্যতীত অন্য কেহ জানিতেন না। তিনি আনন্দ-উদ্বেল-কণ্ঠে কতবার আমাদের বলিয়াছেন, "মায়ের কৃপায় আমি অভয় পেয়েছি। সংসারের পুনরাবর্ত্তে আমায় আর আসতে হবে না।" তখন আমরা সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তপোজ্জ্বল মুখের দিকে বিস্ময়ে কেবল চাহিয়া থাকিতাম। এমন গভীর বিশ্বাসের সহিত তিনি এই কথাগুলি বলিতেন যে, অবিশ্বাসের ক্ষীণ ছায়া ক্ষণেকের জন্যও আমাদের মনে আসিত না। তাঁহার শেষ রচনা 'অভিরামের গীতি' পাঠ করিলে, আমাদের কেন, কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, শেষ মুহূর্ত্তে কবিবরের হৃদয়ে ভগবৎ অনুরাগের কি অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল!—

"এসো চলে এসো দ্রুত সাকী,　　সুধাপাত্রে তরঙ্গ তুলিয়া
কণ্ঠে মোর আজি হলাহল,　　তীব্র তেজে উঠেছে জ্বলিয়া।
জলধি-মন্থন-শেষ, ওগো　　কোথাও সে পায় নাই স্থান
কর মোরে মৃত্যুঞ্জয় তুমি,　　করায়ে তোমার সুরাপান।
নিশ্বাসের মৃদুল চুম্বনে　　শান্ত কর, শান্ত তারে প্রিয়া
নব জীবনের পাশে বসে　　এ যেন গো না যায় মরিয়া।

ফিরে দাও বালকত্ব তারে আজি এই জীবন-সন্ধ্যায়
তব ওই পাত্রের সুধায় জাগন্ত করিয়া দুনিয়ায়।"

সত্যই হে কবি! জীবন-সন্ধ্যায় তুমি বালকত্ব ফিরিয়া পাইয়াছিলে। তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিষ্ঠা ও গৌরব বালকের সারল্যে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছিল।

"ওই খানে লয়ে চল, দেবি, নিরালার পথ ধরে ধরে,
মনে হয় প্রথম স্বপন, এখনো জাগিয়া আছে ঘরে।
মিলনের প্রথম পুলক এখনো দুলিছে বাতায়নে,
মঞ্জীরের দুষ্ট মুখরতা ধরে আছে নিশ্বাস-পবনে।"

তোমার দেবী, ঐ খানেই তোমায় লইয়া গিয়াছিলেন। ঐখানে—ঐ শ্যামল প্রান্তরের শেষে, ঐ ঘননীল পাহাড়ের সানুদেশে, ঐ পার্ব্বত্য নদীর কুটিল গতির একধারে, ঐ মহুয়া বনের মাঝখানে, ঐ তোমার কুঞ্জকুটীরে, হে কবি, তোমার আরাধ্য দেবী তোমায় লইয়া গিয়াছিলেন। তারপর তুমি যখন ব্যাকুল অন্তরে বলিলে,—

"একটু সত্বর কর গতি লয়ে চল না হতে সকাল,
নতুবা উষার কলরবে বসুন্ধরা হইবে মাতাল,
ও-ঘরের মর্ম্ম কথা ওগো, এখনো যে জানেনা দুনিয়া
জানিলে তোমার পদতলে, এখনি সে উঠিবে দুলিয়া।"

তখন তিনি নিশার অন্ধকারে নিজেকে আবৃত করিয়া, মৃদুল চরণে উষার কলরব না জাগিতে জাগিতেই তোমায় হাতে ধরিয়া নিজের কাছে লইয়া গেলেন। কেহই ইহা দেখিতে পায় নাই। কেবল আকাশের শুকতারা তোমায় পথ দেখাইয়াছিল এবং নিশার শিশির তোমার যাত্রাপথে বিদায়-আল্পনা আঁকিয়া দিয়াছিল।

দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

এই পরম পবিত্র ভারতবর্ষে যে সমস্ত শাস্ত্ররাশি বিশ্ববাসী প্রাণি-পুঞ্জের মঙ্গল-বিধানের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই শাস্ত্ররাশি পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় রূপে দুইভাগে বিভক্ত। অপৌরুষেয় শাস্ত্র— ভগবান্ বেদ বা শ্রুতি ও পৌরুষের শাস্ত্র—স্মৃতি। মনু, ব্যাস প্রভৃতি পরমর্ষিগণ এই স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রণেতা। কেবল ধর্ম্ম সংহিতা মাত্রই স্মৃতি-শাস্ত্র নহে। ভগবান্ বেদের অপেক্ষিত সর্ব্ববিধ বিদ্যাস্থান উদ্ঘোতিত করিবার জন্য পরমর্ষিগণ স্মৃতি শাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনন্ত জ্ঞানরত্নাকর এই অপৌরুষেয় বেদ। এই বেদরূপ মহাসিন্ধুর গর্ভে অগণিত বিদ্যাস্থানের প্রতিপাদক পৌরুষেয় শাস্ত্র স্মৃতিসমূহ সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। পৌরুষেয় শাস্ত্রসমূহ সেই বেদের অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রত্যঙ্গ রূপে ব্যবস্থিত। অধ্যাত্ম শাস্ত্র হইতে কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, পাশুপাল্য, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ এমন কি বাৎস্যায়ন শাস্ত্র পর্য্যন্ত ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রসমূহ বৈদিক তত্ত্বসমূহের বিবরণে, পরিপোষণে, উপপাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে।

জীবদেহে মজ্জা অস্থি স্নায়ুসমূহ যেমন পরস্পর সুসম্বদ্ধ হইয়া অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভাবে সুবিন্যস্ত, সেইরূপ ভারতীয় আর্ষশাস্ত্র-রাশি পরস্পর সুসম্বদ্ধ হইয়া অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভাবে ভগবান্ বেদের দেহে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। দেহের অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ আহত হইলে যেমন অঙ্গী ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সেইরূপ ভগবতী শ্রুতির অঙ্গ উপাঙ্গ রূপে ব্যবস্থিত ভারতীয় সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের মধ্যে যে কোনটির স্খলনে বা ক্ষয়ে শ্রুতিরই স্খলন বা ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এই অখণ্ড বিরাট্ শাস্ত্র-দেহ অবলোকন করিতে প্রয়াসী, তিনিই ভারতীয় শাস্ত্রের আলোচনায় অধিকারী। আর যাঁহারা অন্ধ-

---

কাঁটালপাড়ায় বিগত বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

গজ-ন্যায়ে ভারতীয় শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা যে কেবল অনধিকারী তাহা নহে. প্রত্যুত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে শাস্ত্র-দেহ অযথা-রূপে ছিন্ন করিয়া শ্রেয়ঃ পথ রুদ্ধ করিয়া থাকেন।

বৈদিক আর্য্য ঋষিগণের সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা মন্দাকিনী ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন গতিতে স্যন্দিত হইয়া কেমন করিয়া বেদ-মহাসিন্ধুর ক্রোড়ে বিলীন হইয়াছিল তাহা আজ আমাদের চিন্তা করিবারও অবসর নাই। এই বিচ্ছিন্ন চিন্তার ফলে আজ ভারতীয় শাস্ত্র-গগন—শাস্ত্র-গগন নহে আমাদের ভাগ্য-গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন।

আজ আমরা যে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার জন্য, এই পুণ্য ভাগীরথী তটে সমবেত হইয়াছি আমাদের একবারও কি মনে হইতেছে যে, এই দর্শন শাস্ত্র ভগবতী শ্রুতিরই উপাঙ্গ? শ্রুতিরই হৃদয়-নির্য্যাস স্যন্দিত হইয়া দর্শন শাস্ত্র সমূহকে সঞ্জীব করিতেছে। এই দর্শন-শাস্ত্র-সমূহের সুনিপুণ পরিকল্পের ফলে বিশ্বজননী ভগবতী শ্রুতিরই দেহকান্তি সমুজ্জ্বল হইতেছে।

দর্শন শব্দের অর্থ

যদিও "দর্শন" এই সংজ্ঞা দ্বারা পরমর্ষিসূত্রকারগণ স্বীয় শাস্ত্র অঙ্কিত করেন নাই, তথাপি "দর্শন" এই নামটি অধ্যেতৃপরম্পরা-ক্রমে প্রসিদ্ধ। এবং এই অধ্যেতৃপরম্পরা সদাচারপরম্পরার ন্যায় শিষ্টজনসমাদৃত। দর্শন শব্দটি কোন্ অর্থে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা প্রণিধান সহকারে দেখিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে যে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" বলা হইয়াছে, তাহাতে আত্মদর্শনের সাধন রূপে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন উপদিষ্ট হইয়াছে। দৃশ্ ধাতু করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া দর্শন পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। দৃশ্ ধাতুর অর্থ প্রেক্ষণ বা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধনকে দর্শন বলা যাইতে পারে। যদিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেই দৃশ ধাতুর মুখ্য প্রয়োগ, আর এজন্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাধনই দর্শন পদবাচ্য, আত্মার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভাবিত না হইলেও

ভগবতী শ্রুতি আত্মদর্শনের উপদেশ করিয়া যে স্বীয় নিগূঢ় অভিপ্রায় সূচিত করিয়াছেন সুধীগণ তাহা নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। বিস্তার-ভয়ে এস্থলে তাহার আলোচনায় বিরত হইলাম। যে কোনও প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধনকে দর্শন না বলিয়া উক্ত শ্রুতি-প্রদর্শিত আত্মপ্রত্যক্ষের সাধন যে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন তাহাই দর্শন শব্দ দ্বারা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আত্মশ্রবণ, আত্মমনন, ও আত্মনিদিধ্যাসন প্রতিপাদক শাস্ত্র দর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রুতিতে উপদিষ্ট আত্মশ্রবণাদির প্রকার নিরূপণ মানব উপপুরাণে "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ," এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই পুরাণ বাক্য বিবরণ-প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ববিবেকে বলিয়াছেন যে,

"শ্রুতেঃ শ্রুত্বাত্মানং তদনু সমনুক্রান্তবপুষো
বিনিশ্চিত্য ন্যায়াদথ বিহত-হেয়ব্যতিকরম্।
উপাসীত শ্রদ্ধাশমদমবিরাগৈকবিভবো
ভবোচ্ছিত্ত্যৈ চিত্তপ্রনিধি-বিহিতৈর্যোগবিধিভিঃ॥"

এই আচার্য্য-উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিয়া পরে ন্যায় দ্বারা তাহা নিশ্চিত করিয়া, শ্রদ্ধা, শম, দম ও বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা-জনিত যোগবিধিদ্বারা সংসারের উচ্ছেদের জন্য হেয়সম্পর্কশূন্য আত্মার উপাসনা করিবে। শ্রুতিবাক্য দ্বারা আত্মশ্রবণের সহায়ক উপায়রূপে, পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসাদ্বয় ব্যবস্থিত রহিয়াছে। এই মীমাংসাদ্বয়ের মধ্যে উত্তর মীমাংসা সাক্ষাৎ ও পূর্ব্বমীমাংসা পরম্পরা রূপে আত্মশ্রবণের সহায়ক। সুতরাং মীমাংসাদ্বয় আত্মশ্রবণের অন্তর্গত। আত্মশ্রবণের পরে আত্মমননের জন্য ন্যায়, বৈশেষিক ও সাঙ্খ্য এই বৈদিক তর্কশাস্ত্রত্রয় ব্যবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং এই তর্কশাস্ত্রত্রয় শ্রুতি প্রদর্শিত মননের অন্তর্গত। আর পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র সাক্ষাৎ রূপে আত্মনিদিধ্যাসনের উপকারক। এ জন্য যোগ-শাস্ত্র শ্রুতি-উপদিষ্ট নিদিধ্যা-

সনের অন্তর্গত। এইরূপে বৈদিক ষড়্দর্শনের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই বৈদিক দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে যে কোনও একটিকে প্রধান ভাবে নিরূপণ করিয়া গৌণভাবে ইতর সাধনদ্বয়কেও সূচিত করিয়াছে। যে-বিষয়টি যে-শাস্ত্রে মুখ্যভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই শাস্ত্র তাহারই অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এইরূপে বৈদিক ষড়্দর্শন শ্রুতি উপদিষ্ট আত্মশ্রবণ আত্মমনন ও আত্মনিদিধ্যাসন ব্যুৎপাদনে পর্য্যবসিত।

বৈদিক ও অবৈদিক দর্শনের প্রভেদ

শ্রৌত সিদ্ধান্ত রাশির ব্যুৎপাদনে বিশ্লেষণে বিবরণে উপপাদনে আর্ষ শাস্ত্র সমূহ বিনিযুক্ত, কোথাও বা সাক্ষাৎ শ্রৌত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া তাহার বিবরণাদি প্রদর্শিত হইয়াছে, কোথাও বা তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন-রাশি যে আত্মচিন্তা লইয়া নিমগ্ন, যে আত্মচিন্তায় সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হয় সেই আত্মচিন্তার এক মাত্র উদ্‌ঘোষয়িতা ভগবান্ বেদ। কেহ বা এই বেদের উদ্‌ঘোষণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া আত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত, আর কেহ বা স্পষ্টাক্ষরে বেদের উপদেশ উল্লেখ না করিয়া সেই আত্মচিন্তায় নিমগ্ন। ইহাই মাত্র ভারতীয় বৈদিক ও অবৈদিকদর্শনের প্রভেদ। শ্রুতির উপদেশের স্পষ্ট উল্লেখ ও অনুল্লেখ প্রযুক্ত ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বৈদিক দর্শনের প্রবক্তৃ আচার্য্যগণ অবৈদিক দর্শনকে বাহ্য অর্থাৎ বেদবাহ্য দর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অবৈদিক দর্শনের বেদ-সম্বন্ধ

কিন্তু এই অবৈদিক দর্শনও সর্ব্বথা বেদ-সম্বন্ধ বিচ্যুত নহে। "বিরোধেত্বনপেক্ষং স্যাদসতিহ্যনুমানম্" এই জৈমিনি সূত্রে বাহ্য দর্শন সমূহেরও অংশবিশেষে বেদানুকূলতা ও প্রামাণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। উপরি উক্ত জৈমিনি সূত্রের বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়া পরম পূজ্যপাদ বার্ত্তিকা-

চার্য্য কুমারিলভট্ট বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে বাহ্য দর্শন-সমূহের বেদোপকারকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অবৈদিক দর্শনের সংখ্যা

এই বৈদিক দর্শন-সমূহের অবান্তর বহুবিভাগ থাকিলেও বৈদিক দর্শনরাশি যেমন ছয়ভাগে বিভক্ত, তদ্রূপ অবৈদিক দর্শন-সমূহও অবান্তর বিভাগ-গণনা না করিয়া ছয়ভাগে বিভক্ত বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ ও বৈদিক ষড়্‌দর্শনী ও অবৈদিক ষড়্‌দর্শনী ন্যামে দর্শন-সমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

অবৈদিক দর্শনের প্রয়োজন

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র প্রামাণিকগণের অগ্রণী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী এবং পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এই অবৈদিক ষড়্‌দর্শনীর স্বরূপ ও প্রয়োজন প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, মানব আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা স্বীয় কৃতার্থতা সম্পাদনের জন্য যখন আত্মচিন্তাসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে যায়, তখন যে যে প্রতিকূল অবস্থা, যে যে প্রতিকূল চিন্তাতরঙ্গরাশি সেই সিন্ধুনিমজ্জনে প্রতিরোধ করিয়া থাকে, সেই প্রতিকূল চিন্তারাশি দার্শনিক রীতিতে সুবিন্যস্ত হইলেই এক একটি বাহ্য দর্শনরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই বাহ্য দর্শন-সমূহের প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতের মধ্যেও অনুকূল প্রবাহ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত আছে।

এই বাহ্য দর্শনের প্রাথমিক ভূমিকা বৃহস্পতি-প্রণীত চার্ব্বাক দর্শন। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দ-বল্লী অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে চার্ব্বাকাদি বাহ্য দর্শনেরও স্থান, প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইয়া থাকে।

"স বা এষ পুরুষো অন্নরসময়:" এই শ্রুতি আলোচনা করিলে চার্ব্বাক দর্শনেরও শ্রৌতত্ব বুঝিতে পারা যায়। মানুষ আত্মচিন্তনের প্রথম ভূমিকাতে পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিধ ভূত-সঙ্ঘাত, অন্নরসময় চৈতন্যালিপ্ত দেহকেই আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অন্নময়ের আত্মতা প্রতি-

পাদনে চার্ব্বাক দর্শন পর্য্যবসিত। আত্মচিন্তনাভিলাষী ক্রমে এই ভূমিকা অতিক্রম করিয়া যতই আত্মস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইবেন ততই ক্রমে সূক্ষ্মতর আত্মনিরূপণকারী চার্ব্বাক দার্শনিকদিগের সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। এই চার্ব্বাক দর্শন দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ, মন-আত্মবাদে বিভক্ত।

এই দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা দৃঢ় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই চার্ব্বাকাদি দার্শনিকগণ ভূত, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন আদিরূপে যে আত্মার নিরূপণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলিত চিন্তার প্রবাহ নহে। কিন্তু আত্মচিন্তনানুরাগী জনের স্বীয় চিত্তের প্রথম দ্বিতীয়াদি ভূমিকার পরিস্ফুট চিত্র। এই ক্রম অবলম্বন করিয়াই মানব ক্রমে পরমসূক্ষ্মতম আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারে অধিকারী হইয়া থাকে। পূজনীয় আচার্য্যগণ এই রীতিকে অরুন্ধতী-নিদর্শন-ন্যায় বা সোপানারোহন-ন্যায় নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই বাহ্য দর্শনের অপর প্রকার আর্হত দর্শন, ইহা পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ চার্ব্বাক দর্শন অপেক্ষা সূক্ষ্ম। দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে ভিন্ন অথচ দেহপরিমাণ অবিনাশি আত্মনিরূপণে এই দর্শন পর্য্যবসিত। অতঃপর বৌদ্ধদর্শনের বৈভাসিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামক প্রস্থান চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রাথমিক প্রস্থানত্রয়ে আত্মা ক্ষণিকবিজ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর শূন্যই আত্মা ইহা মাধ্যমিক প্রস্থানের সিদ্ধান্ত। এইরূপে বাহ্য দর্শন-সমূহও আত্মার আপেক্ষিক সূক্ষ্মতর স্বরূপ নিরূপণে পর্য্যবসিত। এবং এই বাহ্য দর্শনেরও প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত শ্রুতি-প্রদর্শিত।

বেদবাহ্যদর্শন চার্ব্বাক, আর্হত, বৈভাসিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার, ও মাধ্যমিক এই ছয়ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বাচার্য্যগণের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়।

আত্মা সম্বন্ধে বৈদিক ষড়্‌দর্শনীর অভিপ্রায়

বৈদিক ষড়্‌দর্শনীর মধ্যে বৈশেষিক তার্কিক ও প্রাভাকরগণ

আত্মাকে কর্ত্তা ভোক্তা ও বিভু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাট্ট-প্রস্থানে আত্মাকে প্রকাশ ও অপ্রকাশ স্বরূপ খদ্যোতের ন্যায় জড় বোধ উভয় স্বরূপ বলা হইয়াছে। আর কেবল চিৎস্বরূপ বোধাত্মক ভোক্তাই আত্মা ইহাই সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল প্রস্থানে উক্ত হইয়াছে। ঔপনিষদ সিদ্ধান্তে আত্মা নির্ধর্ম্মকপরমানন্দ বোধ স্বরূপ। ইহাদের মধ্যে প্রাভাকর ও ভাট্ট সম্প্রদায় লইয়াই পূর্ব্বমীমাংসা প্রস্থান হইয়াছে। আর এইরূপে বৈশেষিক, তার্কিক, মীমাংসক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল ও ঔপনিষদ বা বেদান্ত মত লইয়া বৈদিক ষড়দর্শনী হইয়াছে।

দর্শন-শাস্ত্রের উপযোগিতা ও তাহার সার্ব্বভৌমিকতা

যদিও দর্শন-শাস্ত্র আত্মজ্ঞান দ্বারা মানবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রবৃত্ত তথাপি জীব-জগতের ব্যবহার সিদ্ধি বিষয়েও দর্শন-শাস্ত্র উদাসীন নহে। ভারতীয় কাব্য ও ব্যাকরণ দর্শন-শাস্ত্রের রূপান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দর্শন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই পাণিনীয় দর্শন পদতত্ত্বের অপূর্ব্ব রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। মহাভাষ্য, বাক্যপদীয় প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাকরণ শাস্ত্রের দার্শনিক স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। মহাকবিগণ প্রণীত আলঙ্কারিক গ্রন্থে যে পদবৃত্তি নির্দ্ধারণ ও মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ তাহাও দর্শন-শাস্ত্রপ্রসূত। ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্র সাঙ্খ্যদর্শনেরই ক্রোড়ে লালিত। পুরাণে সর্গ প্রতিসর্গ প্রভৃতির আলোচনা এই সাঙ্খ্য দর্শনানুসারেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যবহার শাস্ত্র ও দায়বিচার প্রভৃতি তর্কশাস্ত্র দ্বারা সুমার্জ্জিত। ভারতীয় মনুষ্যায়ুর্ব্বেদ গজায়ুর্ব্বেদ অশ্ববৈদ্যক বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রেরও মূল সূত্র এই দর্শন-শাস্ত্র হইতেই প্রসূত হইয়াছে। ধাতুবৈষম্য রোগ ও ধাতুসাম্য আরোগ্য প্রভৃতির যে আলোচনা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সাঙ্খ্যদর্শনেরই অন্তর্গত। রেখাগণিত ও পাটীশাস্ত্রের পরিপাটী সম্পূর্ণ তর্কশাস্ত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়সূত্রভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়ন স্বীয়ভাষ্য "প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং" উক্তি দ্বারা এই তর্ক শাস্ত্রকে সমস্ত বিদ্যার উপজীব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তাহার ব্যাখ্যা

প্রসঙ্গে পরম-মাহেশ্বর ভারদ্বাজ উদ্দ্যোতকর এই আন্বিক্ষিকী নামধেয় তর্ক বিস্তার ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির প্রতি যে অনুগ্রহ তাহা বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রই দর্শনশাস্ত্র দ্বারা অনুগৃহীত, পরিষ্কৃত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

ব্যুৎপন্নবুদ্ধি পুরুষ হইতে অব্যুৎপন্ন পশুপক্ষী পর্য্যন্ত যে ভাবে স্ব স্ব ব্যবহারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তাহা নিবিষ্ট চিত্তে অবলোকন করিলে দর্শন শাস্ত্রের সার্ব্বভৌমিকতা এবং সমস্ত জীবের স্বভাবসিদ্ধতার উপলব্ধি হইয়া থাকে ইহা ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যগ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এক কথায় প্রাণিগণের নিয়মবদ্ধ শৃঙ্খলাযুক্ত আরম্ভ মাত্র দর্শন শাস্ত্র দ্বারা গ্রথিত ও অনুগৃহীত। এবং অনিয়ত উচ্ছৃঙ্খলিত আরম্ভ মাত্র এই দশন শাস্ত্র দ্বারা দণ্ডিত হইয়া থাকে। নিয়মের উদ্‌ভাবন ও উদ্‌ভাবিত নিয়মের ব্যত্যয় এই উভয়ই দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত। বিষম ভাবে ব্যবস্থিত অনন্ত বস্তুরাশির মধ্যে সাম্য দর্শন ও সাম্যভাবে ব্যবস্থিত বস্তুরাশির মধ্যে বৈষম্য উদ্‌ভাবন, যাহা সমস্ত লোকযাত্রার অবলম্বন তাহাও এই দর্শন শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য। ভারতীয় দুরবগাহ রসায়নশাস্ত্র এই দর্শন শাস্ত্রানুগৃহীত হইয়াই মোক্ষনগরীর সমীপবর্ত্তী হইবার স্পর্দ্ধা পোষণ করিয়াছে। সর্ব্ববিধ পরমাণুর চাতুর্ব্বিধ্য বিভাগের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়াই রসায়নশাস্ত্র লৌহখণ্ডকে সুবর্ণখণ্ডে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব কাল

বেদশাস্ত্রের ন্যায় এই দর্শন-শাস্ত্র সমূহও অনাদি। বেদের আবির্ভাব কাল হইতে, বেদোপকারক শাস্ত্র সমূহও আবির্ভূত হইয়াছিল। পরমর্ষিগণ এই বেদোপকারক শাস্ত্র সমূহ কখন সংক্ষিপ্ত কখনও বা বিস্তৃত ভাবে উপদেশ করিয়া নিখিল জগতের পরমকল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। প্রবাহ-ক্রমে এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহ কখন সঙ্কুচিত শরীরে কখনও বা বিস্তৃত শরীরে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহা পূজ্যপাদ জরৎ তার্কিক জয়ন্তভট্ট স্বীয় ন্যায়মঞ্জরীগ্রন্থেও উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়মঞ্জরীতে

বেদের প্রামাণ্য উপপাদন করিয়া শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন যে "ননু অক্ষপাদাৎ পূর্ব্বং কুতঃ বেদপ্রামাণ্য নিশ্চয় আসীৎ? অত্রাল্পমিদমুচ্যতে। জৈমিনেঃ পূর্ব্বং কেন বেদার্থো ব্যাখ্যাতঃ? পাণিনেঃ পূর্ব্বং কেন পদানি ব্যুৎপাদিতানি? পিঙ্গলাৎ পূর্ব্বং কেন ছন্দাংসি রচিতানি? আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবৎ ইমা বিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপ-বিস্তর-বিবক্ষয়া তু তান্ তান্ তত্র তত্র কর্ত্তৃন্ আচক্ষতে।"

ন্যায়মঞ্জরীকারের উক্তির তাৎপর্য এই যে, গোতমই যদি স্বীয়শাস্ত্রে বেদপ্রামাণ্যের ব্যুৎপাদয়িতা, তবে গোতমের পূর্ব্বে ন্যায়শাস্ত্র প্রণীত হইবার পূর্ব্বে বেদের প্রামাণ্য কিরূপে নিশ্চিত হইত? এতদুত্তরে বৃদ্ধ-তার্কিক জয়ন্তভট্ট বলিতেছেন যে, পূর্ব্বপক্ষী অতি অল্প বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ প্রশ্নকরা উচিত ছিল যে, যে জৈমিনি প্রণীত দর্শন দ্বারা বেদার্থ নিশ্চয় হয়, জৈমিনির পূর্ব্বে কে সেই বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন? পাণিনি পদের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, পাণিনির পূর্ব্বে কে পদের ব্যুৎপাদন করিয়াছিল? আচার্য্য পিঙ্গল ছন্দঃ-শাস্ত্র রচণা করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে কে ছন্দের রচণা করিয়াছিল? পূর্ব্বপক্ষী এরূপ প্রশ্ন করিলেন না কেন? বুঝিতে হইবে এতাদৃশ প্রশ্নই অসঙ্গত। যে হেতু এই সমস্ত বিদ্যাই বেদবিদ্যার ন্যায় আদি সর্গ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঋষিগণ সেই সেই বিদ্যার প্রবক্তা মাত্র। কিন্তু কর্ত্তা নহেন। কেহ বা কোন বিদ্যার সংক্ষিপ্ত প্রবচন কেহ বা বিস্তৃত প্রবচন করিয়াছেন মাত্র। এজন্য সেই সেই বিদ্যাস্থানের প্রবক্তৃদিগকেই লোকে কর্ত্তা বলিয়া থাকে। সুতরাং বেদ যেমন অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত তদ্রূপ বেদার্থ নির্ণায়কশাস্ত্র সমূহও অনাদিকালপ্রবৃত্ত বুঝিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থোপাধিক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তাধ্যাপক

সভ্যতায় বর্ব্বরতার বীজ

অব্যবহার্য্য মনোবৃত্তি

মানুষের শরীরে যেমন অব্যবহার্য্য দেহাংশ দেখা যায় সেইরূপ অপ্রয়োজনীয় মনোবৃত্তিও দেখা যায়। প্রত্যেক প্রাণীর যে শুধু অবস্থাব অনুযায়ী দেহের দরকার হয়, তা নয়, তাদের ঠিক অনুযায়ী মনোবৃত্তি ও কার্য্য-প্রণালীরও দরকার। মানুষের কথা কি, পশুরাও এমন কতকগুলো কারুকার্য্য নিয়ে জন্মায় যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়—যেমন বাবুই, মৌমাছি, উঁই। তা ছাড়া প্রত্যেক জীবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, এমন কতকগুলো স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আছে, যার জন্য সংসারে তাকে ছুটোছুটি করে বেড়াইতেই হবে, সেই বৃত্তিগুলি কোন জীবকেই স্থির হতে দেয় না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন এই বৃত্তিগুলি বংশানুক্রমিক (heriditary)। কিন্তু পিতামাতার বীজাণুতে যদি সন্তানের জন্ম হয়, তা হলে পিতামাতার গুণ এই বীজাণুর মধ্য দিয়াই সন্তানে বর্ত্তায়, এবং সেই জন্য পিতামাতার সবগুণই সন্তানে দেখা যেত। কিন্তু সন্তান যখন পিতামাতার ন্যায় একই প্রকার শরীর, মস্তিষ্ক, আবেষ্টনী, শিক্ষা, ভাষা পাওয়া সত্বেও পিতামাতা হতে অধিক বা অল্প গুণবিশিষ্ট হয়ে জন্মায় তখন আমাদের বাধ্য হয়ে ঐ জন্মগত মনোবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন কারণের নির্দ্দেশ করতে হয়। পতঞ্জলি, শংকর প্রভৃতি হিন্দু দার্শনিকেরা বলেন, জীবাত্মার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহ ধারণের সময় যে সকল অভিজ্ঞতা জন্মে তাই সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে সঞ্চিত থাকে, নবীন দেহে অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হলে তার প্রকাশ হয়।

যা হোক এবিষয়গুলির এখানে আলোচনা না করে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আসা যাক। এটা ঠিক যে মানুষের এমন কতকগুলো মন ও দেহের বৃত্তি আছে, যেমন ক্ষুৎপিপাসা, সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রভৃতি, যারা মানুষকে কাজ করাতে বাধ্য করে। এই বৃত্তিগুলি দেহ ও মনের ওপর

এমন কতকগুলো যন্ত্রণা বা অভাবের সৃষ্টি করে যে মানুষের সেগুলোর শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ করতেই হবে। বিভিন্ন অবস্থায় পড়ে মানুষকে বিভিন্ন রকম অভাবের সামনে পড়তে হয়। সেই অভাব মেটাতে গিয়ে তার বিভিন্ন দেহাংশ ও মনোবৃত্তির উৎকর্ষ করতে হয়। ক্রমে সে অবস্থা বদলে যাওয়ায়, যেমন সেই দেহাংশগুলো অব্যবহার্য্য হয়ে শুকিয়ে যায়, ঠিক মনেরও কতকগুলো বৃত্তি, যা পূর্ব্ব অবস্থায় দরকার ছিল এখন সে-গুলোর দরকার না থাকায়, অব্যবহার্য্য অবস্থায় রয়ে যায় Vestigial Instincts ।।

গৃহপালিত পশুদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবস্থান্তর হয়েছে, সেই জন্য তাদের মনের বহু অকেজো কার্য্যকলাপ দেখা যায়, যেগুলো এখন অর্থহীন। এক সময় যখন তাদের জঙ্গলে থাকতে হোত তখন আত্মরক্ষা ও আহারের চেষ্টায় তাদের সেই বৃত্তিগুলির ব্যবহার করতে হত। কিন্তু মানুষ যে তাদের কৃত্রিম গ্রাম্য জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে, তাতে তাদের ব্যবহারের কোনও মূল্য নেই বরং ক্ষতিই হয়।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে আগে আমরা গৃহ-পালিত পশুদের অকেজো মনোবৃত্তিগুলির আলোচনা করে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মানুষের অকেজো মনোবৃত্তিগুলির আলোচনা করব।

কুকুরের বন্য বৃত্তির অবশেষ

কুকুরে আমরা চারটি অকেজো মনোবৃত্তি দেখতে পাই ; (১) শিকার, (২) ছাগল ভ্যাড়ার প্রতি শত্রুতা, (৩) শোবার আগে বার কতক কুণ্ডলী আকারে ঘোরা, ও (৪) শেয়াল ও নেকড়ের মত চীৎকার করা।

(১) পেট বেশ ভরা থাকলেও কুকুর শীকার করে। খুব শান্ত একটা কলি-কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরও, সে কখনও চুপ করে চলতে পারবে না, আপন মনে ঘেউ ঘেউ করবে ও চারিপাশে বৃথা-শিকারের চেষ্টা করবে। এবং নিজের চাইতে দুর্ব্বল প্রাণী দেখতে পেলেই তাকে আক্রমণ করবে। ভ্যাড়া, ছাগল বা বাছুর তা কখনও করে না।

(২) সুবিধে পেলেই এরা ছাগল ভ্যাড়া মেরে ফেলে। ক্ষিদের চোটে যে এদের মারে তা নয়, এরা মেরে এদের রক্ত বা মাংস কিছুই

খায় না, কেবল দাঁত দিয়ে এদের টুঁটিটি কেটে দেয়। কুকুরের এই যে বৃত্তি এটা তাদের বন্য জীবনে ছাগল ভ্যাড়াদের সহিত শত্রুতারই ইঙ্গিত করে। নেকড়েতে যে বৃত্তি অতি প্রবল ভাবে দেখতে পাওয়া যায় কলিতে সেই বৃত্তি মানুষের শিক্ষাসত্ত্বেও মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তের জন্য সে একটা বন্য নেকড়ে ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) একটা কুকুরকে যদি পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তা হলে দেখা যায় যে শোবার আগে সে বার কতক কুণ্ডলী করে ঘুরে নেয়। এর কারণ হচ্ছে বন্য জীবনে ঝোপ বা বড় বড় ঘাসের মধ্যে সে ঐ রকম করে ঘুরে ঘুরে তার বিছানা তৈরী করে নিত। পোষা কুকুরের এখন ঘোরার কোনও প্রয়োজন নেই তবুও সে ঘোরে। ডারবিন বলেন যে তিনি একটা কুকুর দেখেছেন সেটা শোবার আগে প্রায় কুড়িবার ঘোরে। তাঁর মতে ঐ ঘোরাটা হচ্ছে তাদের প্রাচীন শয্যারচনার কৌশল—ঘাসগুলোকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে শোবার জায়গা ও গদি তৈরী করা।

(৪) কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক আমরা সকলেই জানি। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা দীর্ঘ বিকট চীৎকার করে। এবং এক পাড়ায় একটা কুকুর ঐ রকম চীৎকার কল্লেই অন্য পাড়ার কুকুরগুলো ঠিক ঐ রকম প্রতিধ্বনি করে—যেমন শেয়াল ও নেকড়ের দেখতে পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে তাদের প্রাচীন জীবনে বিপৎকালে বা দল ভ্রষ্ট হয়ে পথ হারালে সমবেত হওয়ার সংকেত। খুব সুকণ্ঠ কুকুরও মাঝে মাঝে এমন বিপরীত চীৎকার করে যে, বিশ্বাসই হয় না—এ সেই কুকুরের স্বর। কুসংস্কারী লোকেরা কুকুর এই রকম করে ডাকলে মনে করে যে এরা অশরীরী কোন জীব দেখতে পাচ্ছে বা কারও মৃত্যুর জ্ঞাপন করছে। দর্শন-বিজ্ঞানের উন্নতি না হওয়ায় বা তাদের সত্য সকল জানা না থাকায় প্রাকৃতিক নিয়মে যে অসাধারণ ঘটনাগুলো ঘটে তাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জানতে না পেরে অজ্ঞ লোকে তাকে বলে দৈব, যাদু ইত্যাদি।

বিড়ালের বন্য-বৃত্তির অবশেষ

নেকড়ে, শেয়াল, খাঁকশেয়াল এবং কুকুর এক জাতীয়; কারণ তাদের ব্যবহার ও দেহের গঠন প্রায় একই প্রকার। এরা শিকার ধরে

দৌড়ে গিয়ে। পক্ষান্তরে, সিংহ, বাঘ, চিতে, বনবেড়াল এবং পোষাবেড়াল এক জাতীয়। এদের শিকারের পদ্ধতি—চুরি করে লুকিয়ে কাছে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু বেরাল ও কুকুর জলীয় দ্রব্য একই প্রকারে খায়।

শিকারের মধ্যে পোষা-বেড়ালের—এক ইঁদুর। কোনও কোনও বেড়ালের সারা জীবনে শিকারের সুযোগই ঘটে না কিন্তু তারা শিকারের অভিনয় করতে ছাড়ে না। ছেলে বেলা থেকেই কুকুর ও বেরালের মায়েরা তাদের ছেলেদের এই বিদ্যা অভ্যাস করায়। শুধু শুধুই হোক, আর মাছি, পোকা মাকড় একটা কিছু চলন্ত জিনিষ পেলেই এরা এই বিদ্যার পরখ করে।

চিতে-বাঘ গাছে ওঠে শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্য বা শত্রু-ভয়ে। বেরাল এখনও অনেক সময় কুকুরের তাড়া খেয়ে গাছের ওপর ওঠে। আবার দেখা যায়, গাছে ওঠার দরকার না থাকলেও বা ওঠার সুবিধা না থাকলেও দেয়ালে বা খুঁটিতে আঁচড়াতে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, পূর্ব্বে যে নখের পেশীগুলোর খুব ব্যবহার হোত সেগুলো এখন ব্যবহার না হওয়ায় সড় সড় করে এবং শুধু শুধু আঁচড়ে গাছে ওঠার সাধ মেটায়।

কুকুরের নখ সর্ব্বদাই বের হয়ে থাকে কিন্তু বেড়াল ইচ্ছামত তার নখ পেশীর ভেতর ঢুকুতে ও বের করতে পারে। কুকুরের নখ মোটা, বেরালের সরু, ধারাল ও বাঁকা। কুকুর তার প্রভুকে ভালবাসে; তার প্রভু যেখানে যাবে সেও সেখানে যাবে। তার প্রভুর সঙ্গে সে সব রকম কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত তবুও কোনও রাজার কাছেও সে থাকতে ইচ্ছুক নয়। কুকুর যখন হারিয়ে যায় তার অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় সে কখন একলা থাকতে পারে না, তার একজন প্রভু চাই। কুকুরের এই স্বর্গীয় ভালবাসা মানুষেরও আদর্শ।

বেড়াল ভালবাসে তার বাড়ী। গৃহ-প্রীতি হচ্ছে তার সহজাত জ্ঞান। এর আর একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। যে পাড়ায় বেরাল বাস করে তার প্রতি উত্যক্ত হয়ে তাকে চোখ বেঁধে অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে এসো, সে ঠিক খুঁজে তার বাড়ী বের করে নেবে। কুকুরেরও এ শক্তি

কতকটা আছে। কুকুর ভালবাসে মানুষ—গৃহ ততটা নয়, বেড়াল ভালবাসে তার বাড়ী—মানুষ ততটা নয়।

বুনো জানোয়ারও গ্রামের পাশে থাকতে ভালবাসে। কারণ তার অন্দিসন্ধি তারা তাদের বাপ মা এবং সঙ্গীদের কাছ থেকে জানতে পারে, পক্ষান্তরে নূতন নূতন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হলে নানা অসুবিধে ভোগ করতে হয়। এই অসুবিধেই হচ্ছে জীবের গৃহবাসের প্রবৃত্তির হেতু। নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে পাখী, উঁই, পীঁপড়ে, মৌমাছি গৃহ নির্ম্মাণে নিপুণ।

ব্যবহার দেখে বোধ হয় বন্য অবস্থায় বেরাল একটা জায়গায় দল বেঁধে থাকতো আর কুকুর ঘুরে বেড়াতো, সেই জন্য বেরাল গ্রাম ভালবাসে এবং কুকুর তার প্রভুর সঙ্গে ঘুরতে ভালবাসে। তা ছাড়া মানুষও এক-কালে দল বেধে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো এবং কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। তারপর যখন মানুষ গ্রামে চিরকালের জন্য বাস করলে তখন বেরাল পুষলে তার সৌন্দর্য্য ও ইঁদুর মারবার জন্য। এই সকল কারণে বেরাল ও কুকুরের এত চরিত্রের ভেদ।

(ক্রমশঃ) বাসুদেবানন্দ

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

আজ বড় আনন্দের দিন। সুদীর্ঘ বরষ পরে এ দীন মাণিকগঞ্জ-সাহিত্য-মন্দির সাহিত্যরথিবৃন্দের মধুর মিলনগীতিতে পুনঃ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যসেবায় যে উপচার প্রয়োজন তাহা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে প্রতি আয়োজনের মূলে যে ঐকান্তিকতা, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া মানবজীবনের কঠোর সাধনা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলে সেই আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহচঞ্চল উন্মুক্ত হৃদয় লইয়া সমাগত সুধীবৃন্দকে আজ আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস যাঁহারা দেশ-কল্যাণ-কামনায় সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যাঁহারা জাতির জীবন-উৎসের সন্ধান পাইয়া সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হইয়াছেন, সেই অকৃত্রিম একনিষ্ঠ সাধকবৃন্দের নিকট আড়ম্বর-বিহীন ঐকান্তিকতার পূত অর্ঘ্য অনাদৃত হইবে না; তাই হে সাহিত্যরসপিপাসু সুধীবৃন্দ, সাহিত্যসেবার এ ক্ষুদ্র উপচার লইয়া মাণিকগঞ্জের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি; আমাদের ত্রুটি, আমাদের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা নিজ ঔদার্য্যগুণে মার্জ্জনা করিয়া পূত সাহিত্য-সম্মিলন-ক্ষেত্রে এ দীন অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন।

যেদিন "পূর্ণিমা সম্মিলনী"র উদ্যোগে মাণিকগঞ্জের সারস্বত-ভবনে সাহিত্যশাখার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল সেদিন মাণিকগঞ্জের পক্ষে একটা গৌরবের দিন সন্দেহ নাই। বাসন্তীসুষমাসজ্জিত প্রকৃতির নব অনুরাগের মধ্যে কলকণ্ঠকোকিলের প্রথমকূজনে ধরিত্রী যেমন জ্যোৎস্নার

মাণিকগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয়বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ৪ঠা জুন এই অভিভাষণ পঠিত হইয়াছিল।

ধবল বসন পরিয়া বিপুল পুলকে শিহরিয়া উঠে, ১৩৩২ সনের ফাল্গুনের ষোড়শ বাসরে পৌর্ণমাসীরজনীর বিচ্ছুরিত সুষমার মাঝে সাহিত্যশাখার প্রথম অধিবেশন দিবসের উদ্বোধন-গীতিতে মাণিকগঞ্জের স্থির-অচঞ্চল বক্ষ তেমনি একটা নিবিড় আনন্দ-হিল্লোলে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে গীতি, সে সুর, সে স্পন্দন, সুদীর্ঘ বরষের শত বিপদঝঙ্কারের প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হইয়া যায় নাই; সে সুর বিহগকাকলির সুমধুর ঝঙ্কারের ন্যায় মাণিকগঞ্জ-সাহিত্যকুঞ্জভবন চির মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। বিগত বৎসরের এমনি এক শুভমুহূর্ত্তে এই সারস্বতভবনে প্রবীণ সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুরের সভাপতিত্বে মাণিকগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয় এবং মাণিকগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখাসমিতিরূপে গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেদিন যে উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, সাহিত্য রঙ্গমঞ্চে যে ঐকান্তিকতা লইয়া সাহিত্য-সেবকবৃন্দ সমাগত হইয়াছিলেন, সে উৎসাহ, সে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আজ সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ যে বাণীর বরপুত্র অনুকম্পাভরে আমাদের এ ক্ষীণ আহ্বানে সাড়া দিয়া সাহিত্য সেবার চরম সার্থকতা বুঝাইবার জন্য আমাদের পর্ণকুটীরে আসিয়াছেন তাঁহাকে কি দিয়া সম্মান করিব তাহা জানি না। হৃদয়-কানন আতিপাতি করিয়া খুঁজিলাম কোথাও তাঁহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার পুষ্পসম্ভার খুঁজিয়া পাইলাম না। চারিদিক হইতে নগ্নদৈন্য মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মাণিকগঞ্জ সাহিত্য-কাননে যে কয়টি ফুল ফুটিয়াছিল, যাহার মধুময়গন্ধ এখনও আকাশ বাতাস আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সুবাসভরা প্রসূনস্তবকে আজ তোমার অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি।

সুজলা সুফলা শ্যামলাঞ্চলা বঙ্গমাতার বুকের মাণিক মাণিকগঞ্জ সাহিত্য-সম্পদে দীন হইলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-গরিমায় কাহারও নিকট হীন নয়। বিগলিত করুণা-ধারার ন্যায় ঐ যে পূতসলিলা 'পদ্মা' মাণিকগঞ্জের পশ্চিমাঞ্চল বিধৌত করিয়া তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করিয়া প্রেম-অভিসারে নীলসিন্ধুর পানে ছুটিয়াছে, 'যমুনা' 'ধলেশ্বরী'র

পুণ্যপ্রবাহ যে দেশের প্রতি শিরায় শিরায় অমৃত ঢালিয়া দেশকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই মাণিকগঞ্জের সাহিত্য-দুলাল, স্বদেশ-প্রীতির মূর্ত্তবিগ্রহ রজনীগুপ্তের কথা আজও পরাধীনতার তীব্র যাতনার মাঝে মরমের দ্বারে রণিয়া উঠে। তেঁওতার বৈদ্যকুলরবি সুসাহিত্যিক স্বর্গীয় রজনীগুপ্তের 'আর্য্যকীর্ত্তি' ও 'সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস' সাহিত্য-ভাণ্ডারের অতুলসম্পদ। তাঁহার যে প্রবল লেখনী স্বাধীনতার অমূল্যবাণী প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই, যে লেখনী সুপ্তিমগ্ন দেশবাসীকে চেতনার রাজ্যে ফিরাইয়া আনিতে কখনও আলস্য বোধ করে নাই, সে লেখনী আজ মৃত্যুর কঠিনস্পর্শে স্তব্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁর লেখনীমুখে যে তেজ, যে উৎসাহ ও স্বদেশপ্রাণতা গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল তাহা প্রতি বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্যে তাঁহাকে গৌরব-আসন প্রদান করিয়াছে, তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। পুণ্যস্মৃতি স্বর্গীয় ভবানীচরণ বসুর 'উৎপলা', স্বনামধন্য কবি স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য' সাহিত্য-জগতে অতি উপাদেয় সামগ্রী। আজ এই উৎসব বাসরে বাণীর বরপুত্র স্বর্গীয় কবি দীনেশচরণ বসুর কবিত্ব প্রতিভার কথা বেদনার সুরে এ ভগ্নহৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। যে দিন সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন শ্রীবাড়ীর মঞ্জুলকুঞ্জে দীনেশচরণ বসুর কবিত্ব-বাঁশরী বাজিয়া উঠিয়াছিল, 'মানস-বিকাশে' যেদিন কবি আত্ম-হারা হইয়া সাহিত্য-জগতে তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন, "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরম বেদনা মোর" বলিয়া যেদিন কবির প্রাণ আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সেই দিন, সেই শুভ লগনে মাণিকগঞ্জের বক্ষে কি এক আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গিয়াছিল তাহা আমার দুর্ব্বল লেখনী বর্ণনা করিতে সমর্থ নয়। আবার যেদিন ম্লান সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সদ্যপ্রস্ফুটিত সুরভিমধুর প্রসূন বৃন্তচ্যুত হইয়া ধরণীর বক্ষে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, সেদিন প্রতি বৃক্ষপত্র-মর্ম্মরে, বিরহ-বিধুর প্রতি বিহগের উদাস কণ্ঠে যে গভীর দীর্ঘশ্বাস ধ্যানমগ্ন বিশ্বের মৌন গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়াছিল তাহা আজও আমাদের মর্ম্মদুয়ারে রণিয়া উঠিতেছে। মাণিকগঞ্জের গৌরব, একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের

নামও সাহিত্য-জগতে কাহারও নিকট অবিদিত নাই। মধু মালঞ্চের পবিত্র মাধুর্য্যের মধ্যে যাহার জন্ম, যিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনা করিয়া বঙ্গভাষার লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করিয়াছেন, সেই দীনেশচন্দ্র সেন বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের খেলা-ধূলা ও শিক্ষার মধ্যে কেমন করিয়া নবীন প্রাণের নবীন উৎসাহ লইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আজ নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। তাঁহার যশ ও সাহিত্যসেবার সাফল্যে আমাদের বুক আজ আনন্দ ও গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। মাণিকগঞ্জের 'মাণিকের' সন্ধান পাইয়া রায় জলধর সেন বাহাদুর গত বৎসর আগ্রহ-আকুল হৃদয়ের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন,—যে দেশে রজনীগুপ্তের মত স্বদেশ-প্রেমিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুকবি দীনেশচরণ বসু, সুসাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন প্রতিভার চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, সে দেশ সাহিত্য-সম্পদে কখনই দীন বা হীন নয়। তাই এত দৈন্যের মধ্যেও, এত বৈরাগ্যের মধ্যেও এ পর্ণকুটীরে সাহিত্যসেবার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পৌরহিত্য করিতে তোমাকে আহ্বান করিতে সাহসী হইয়াছি।

সুসাহিত্য জগতের কি কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে তাহা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীই অবগত আছেন। সাহিত্য, জাতির দর্পণ এবং মানব-মনের জীবন্ত অভিব্যক্তি। অনাদি কাল হইতে প্রতি মানবের চিন্তাধারা জাহ্নবীর পূতধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু আমার মনে হয় যে, শুধু ভাষার আবরণে ভাবের উচ্ছ্বাসকে ঢাকিয়া রাখিলেই সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। ঐ যে নীল আকাশ-সায়রে ফুটন্ত নলিনীর ন্যায় অগণিত তারকা-পুঞ্জ মানব মনে চির প্রহেলিকার সৃষ্টি করিতেছে, ঐ যে শ্যাম বিটপিলতা বাতাসের অবিশ্রান্ত গতির মাঝে বসন্ত কোকিলের কম্পিতস্বরে চমকিয়া উঠিতেছে, ঐ যে সাগরাভিসারিণী তটিনীর অস্ফুট কলনাদে জগতের বুকে এক অজানা রাজ্যের সুর বাজিয়া উঠিতেছে, বিশ্বপ্রকৃতির বিচ্ছুরিত সুষমার মাঝে যে বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়া মানব মনের নিকট গুপ্ত রহস্যের অপূর্ব্ব কাহিনী ঘোষণা করিতেছে, সে বৈচিত্র্যে, সুরতরঙ্গের প্রতি স্পন্দনে, বিটপীর

মর্ম্মর রবে, পলে পলে কত কাব্য কত সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, কত কবিত্ব উৎসারিত হইতেছে—তাহা কে জানে ?

মানবজীবনের চিররহস্য নিরাকরণ করাই সাহিত্যসেবার চরম সার্থকতা। সমাজসেবক সমাজের হিতকল্পে পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা সমাজের বুক হইতে অপসারিত করিয়া সমাজকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে লেখনী প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সমাজের উন্নতি তার একমাত্র সাধনা। শিল্পী তাঁর শিল্পচাতুর্য্যের ভিতর দিয়া, বৈজ্ঞানিক তাঁর আবিষ্কারাবলী জগতের নিকট প্রকট করিয়া দেশকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আজ আর সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিত্যনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী নন। সাহিত্যক্ষেত্রে বিকৃত-রুচি-বিশিষ্ট এমন কতিপয় অন্ধ সাহিত্যিক নামিয়াছেন যাঁহারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া ভোগবাদের উৎকট আদর্শ দেশের সম্মুখে ধরিয়া মানবকে ভোগের দিকে ধ্বংসের পথে আকর্ষণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। ইন্দ্রিয়-যবনিকার অন্তরালে যে বিরাটশক্তি সুপ্তসিংহের মত মানব-হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, যে শক্তি বিভিন্ন ধারায় উৎসারিত হইয়া সাহিত্য, শিল্প, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজনীতি ও রাজনীতিকে পরিপুষ্ট করিয়া আসিতেছে সে শক্তির সন্ধান না করিয়া শুধু তাহার বহিস্ফূর্ত্ত ফেনিল উচ্ছ্বাসের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া লেখনী চালনা করিলে সুফলের পরিবর্ত্তে দেশে কুফলই ফলিয়া থাকে। যে শক্তি জাতীয় জীবনের বৈচিত্র্যকে অভিসিঞ্চিত করিয়া বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন দিকে এক অখণ্ড শক্তি-কেন্দ্র হইতে উৎসারিত হইয়া অবিশ্রান্ত ভাবে ছুটিয়াছে, সে শক্তিপ্রবাহ শুধু সমাজ বা রাজনীতির ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না,—দেশের প্রতি অঙ্গকে পরিপুষ্ট করিয়া যে বিরাট শক্তি সাধককে ভূমার সহিত পরিচয় করাইয়া মানব জীবন সার্থকতা-মণ্ডিত করিয়া তোলে। ইহাই সাহিত্য-সাধনার চরম উৎকর্ষ ও সাফল্য।

কিন্তু দেশে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আমরা সাহিত্যসেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক বা আধ্যা-

ত্মিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিতেছি। এ বাঙ্গালী জাতি বহু বরষের তন্দ্রার ঘোরে আজ মেরুদণ্ড-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে দুর্ব্বলতা অজ্ঞতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দেশকে অন্তঃসার-শূন্য করিয়া ফেলিতেছে, সেই দুর্ব্বলতা সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে; লুপ্তচেতন দেশবাসীকে তামসিকতার দুর্মোচ্য শৃঙ্খলের নিবিড় বেষ্টন হইতে রক্ষা করিয়া, ভোগবাদের বিপুল আয়োজনের মধ্যে ত্যাগের শাশ্বতী বাণী মুরজ-মন্দ্রে আবার ঘোষণা করিতে হইবে। কুরুচি-পূর্ণ আদর্শ, বিকৃত ভাবসমুচ্চয়, দিন দিন সাহিত্যের ভিতর দিয়া যেরূপ নগ্নবীভৎস ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাতে সাহিত্যের স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের অপকর্ষই সূচিত হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে আগমনী আঁকিয়া গিয়াছেন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র স্বদেশ-সেবার যে উজ্জ্বল আদর্শ দেশ-বাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, সেই আদর্শকে—সাহিত্য, শিল্প, কলা ও নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া জীবন্ত করিয়া তুলিয়া নব-জাগ্রত গণবিগ্রহকে স্বাধীনতার পথে, মুক্তির পথে পরিচালিত করিতে হইবে; দেশকে বাঁচাইতে হইবে।

হে বাণীর বরপুত্র, সাহিত্য-মহারথি, আজ তুমি এ দীনের পর্ণ কুটীরে অতিথি; তোমায় কি দিয়া অভ্যর্থনা করিব, কি দিয়া তোমার উপযুক্ত অভিনন্দন করিব তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শুধু আমাদের দৈন্য ও অক্ষমতা প্রতি কার্য্যে বিরাট বাধার সৃজন করিয়া এ আকাঙ্ক্ষা উদ্বেলিত হৃদয়ে শুধু নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার সুর জাগাইয়া তুলিতেছে। বহু সাধনার ফলে তোমার ন্যায় প্রবীন সাহিত্য-মহারথিকে আজ আমা-দের মধ্যে পাইয়াছি। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে যাঁহার জয়গান করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন, বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র-প্রমুখ মহামতিবৃন্দ যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রবাণ সাহিত্যিক আজ মাণিকগঞ্জের সাহিত্য-পূজার প্রধান পুরোহিত। ধন্য তোমার সাহিত্য-সেবা, ধন্য তোমার স্বদেশ-প্রেম; তুমি তোমার সাহিত্য-সেবার ভিতর দিয়া, আলস্য, স্বার্থপরতা,

পরশ্রীকাতরতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে বিনষ্ট করিতে, বিচ্ছিন্ন মানবকে স্বদেশ-প্রীতির নিবিড় বন্ধনে পুনঃ গ্রথিত করিতে যে মহাসাধনায় নিমগ্ন হইয়াছ, সে সাধনা, সে নিষ্ঠা তোমাকে সাহিত্য-জগতে অমরত্ব দান করিয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

'যে পঞ্চবিংশতি বর্ষ সঁপিয়াছ মাতার সেবায়
অবিমিশ্র সত্যবাণী উদ্‌ঘোষিয়া নির্ভীক পরাণে
গণ্ডপথে প্রত্নতত্ত্বে হেরি আত্ম প্রকাণ্ড প্রচ্ছায়
বনস্পতিরূপে তুমি তুলি শির আকাশের পানে
দাঁড়ায়েছ, সেই বর্ষচয়ে তব বিরাট সত্তায়
ধন্য পূর্ণ করি বঙ্গ নিত্যনব উৎসারিত দানে।'

রবীন্দ্রনাথ উৎসাহের সুরে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

'দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে
ধীর তুমি বক্ষে লহ তারে
পথের কণ্টক দলি
ক্ষতপদে এস চলি।
ঝটিকার মেঘমন্দ্র-স্বরে।
'বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে, তবে
ঘর তব আপনার হবে।
তুফান তুলিবে কূলে
কাঁটাও ভরিবে ফুলে
উৎসধারা ঝরিবে প্রস্তরে।'

রবীন্দ্রনাথের এ উৎসাহ-ভরা শ্রদ্ধাঞ্জলি সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে তোমার আসন আরও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, স্বনামধন্য ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় যিনি তিব্বত ও চীন, কাম্বোডিয়া, জাপান সুমাত্রা ও শ্যাম সিংহল ও যাভা প্রভৃতি দেশের শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতার মধ্যে ভারত-সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাইয়া 'বৃহত্তর ভারতের' সৃষ্টি করিয়া ভারতের সভ্যতাকে জগতের সম্মুখে উজ্জ্বলতর করিয়া ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন,

সেই ঐতিহাসিকপ্রবর আজ মাণিকগঞ্জ-ভবনে আগমন করিয়া নিজের মহত্ত্বই দেশবাসীর নিকট ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গঙ্গা যমুনার পবিত্র সঙ্গমের মত এই দুই উজ্জ্বল প্রতিভার মধুর মিলনে এই মাণিকগঞ্জ মহা-তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ শিকদার, এম্ এ

শংকর ও কণাদ

(পরমাণুবাদ)

[পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে কণাদের আত্মবাদ খণ্ডিত হইয়াছে এবং তিনি অদ্বৈত বেদান্তের যে দোষ দিয়াছিলেন তাহাও সমর্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কণাদের জগৎকারণ পরমাণুবাদ খণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।]

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ॥ ব্রহ্মসূত্র ২অ, ২পা, ১২সূ॥ শংকরানন্দ কৃত দীপিকা—উভয়থাঽপ্যাস্তস্য কর্ম্মণো নিমিত্তস্যাভাবে-ভাবেঽপি দৃষ্টস্যাদৃষ্টস্য বা। দৃষ্টস্যাপি প্রযত্নস্যাভিঘাতাদেবাদৃষ্টস্যাপ্যাত্ম-সমবায়িনো বা, দৃষ্টবদাত্মসম্বন্ধাদস্যাপি সদাতনত্বেন প্রলয়াদ্যভাবদোষাৎ নাদ্যং কর্ম্মাণুষু, অতো আদ্যস্য কর্ম্মণো ভাবাৎ তজ্জনকস্যাপি তস্য সংযোগস্যাভাবঃ অসত্বং তদভাবাচ্চ সংযোগ সচিবাঃ পরমাণবো ন দ্ব্যণুকাদি ক্রমেণ জগদারভন্তে ইত্যর্থঃ।

সূত্র-ব্যাখ্যা—পরমাণুপুঞ্জে যে প্রথম ক্রিয়া (চলন) হয়, তাহার কারণ থাকা অঙ্গীকার কর বা না কর, উভয় পক্ষেই কর্ম্মোৎপত্তি (প্রচলন বা প্রস্পন্দ) হওয়ার বাধা আছে। পরমাণুতে অথবা আত্মাতে

অদৃষ্ট থাকে, তহলে পরমাণুতে ক্রিয়া হয়, এপক্ষেও প্রথম ক্রিয়া হওয়ার বাধা আছে এবং ক্রিয়ার অভাবে সৃষ্টির অভাবও প্রসক্ত হয়। পরমাণুর সংযোগ ও বিভাগ উভয়ই ক্রিয়ামূলক, পরন্তু তাহা (ক্রিয়া বা প্রচলন) হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়ার অভাবে সংযোগ বিভাগের অভাব, সংযোগ বিভাগের অভাবে সৃষ্টি প্রলয়ের অভাব হইতে পারে।

ভাষ্যানুবাদ। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—আমাদের মত সমর্থিত হইল, এক্ষণে তোমাদের মত আমরা পরীক্ষা করিব।

পূর্ব্ব-পক্ষ—দেখা যায়, বস্ত্রাদি সাবয়ব দ্রব্য (mass) সংযোগ-সহায় সূত্রাদি দ্রব্যের দ্বারা জন্মে। সেইরূপ যাহা কিছু সাবয়ব (that which is in space) সমস্তই স্বানুগত সংযোগ সহকৃত (Combination of particles) সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা জন্মিয়াছে। বস্ত্র অবয়বী, সূত্র তাহার অবয়ব। সূত্র অবয়বী, অংশু তাহার অবয়ব। অংশু অবয়বী, তদংশ তাহার অবয়ব। এইরূপে অবয়ব-অবয়বি-বিভাগ যে স্থানে সমাপ্ত হয়, যাহার আর বিভাগ নাই, তাহাই ক্ষুদ্রতার চরম স্থান তাহারই নাম পরমাণু—স চায়মবয়বাবয়বিভাগো যতো নিবর্ত্ততে সোঽপকর্ষপর্য্যন্তগতঃ পরমাণুঃ। *

---

* Democritus of Abdera, in Thrace, most learned of the Ionian physicists and the head of the ancient and modern materialistic school (420 B. C.) affirms the homogeneity of all bodies; but with Anaxagorus, he conceives this indeterminate matter as divided into an infinite number of infinitely small molecules, which come together and separate. In that way bodies are formed and destroyed. These molecules are infinite in number and indivisible, without, however, being mathematical points, for an unextended thing would be nothing; they are indentical in chemical quality, but differ in size and form. They are endowed with perpetual motion, which they do not receive from a transcendent principle, but which belongs to their essence. The force which moves them acts according to

গিরি নদী সমুদ্রাদি বিশিষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই সাবয়ব। যেহেতু সাবয়ব, সেই হেতু ইহার আদি ও অন্ত আছে। কার্য্য মাত্রেই সকারণ, বিনা কারণে কোনও কার্য্য হয় না। পরমাণুকেই জগতের আদি কারণ বলিতে হয়। ইহাই কণাদ মুনির মত।

কণাদ আরও বলেন, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু এই চারিভূত সাবয়ব, সুতরাং পরমাণুও চতুর্ব্বিধ—ভৌম, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। এই পরমাণু হইতেছে ক্ষুদ্রতার বিশ্রান্তি অর্থাৎ বিভাগবিনিবৃত্তির শেষ (ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশের আর কল্পনা করা যায় না)। যে কালে ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থ চরম বিভাগে বিভক্ত হয় অর্থাৎ সমগ্র জগৎ যখন আণবিক অবস্থায় উপস্থিত হয় তখন তাহাকে প্রলয় বলে। প্রলয় কালে চরম অবয়বী অনন্ত পরমাণুই থাকে, তাহার আর অবয়ব (particles) থাকে না। পরে যখন সৃষ্টি কাল উপস্থিত হয় তখন প্রথম কোনও অদৃষ্ট কারণে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে, যে যে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে সেই সেই বায়বীয় পরমাণুতে পরস্পর সংযুক্ত করে এবং দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক, ও চতুরণুকাদি ক্রমে বায়ু নামক স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। এই ভাবে অগ্নি, জল, পৃথিবী, সেন্দ্রিয় দেহ, অধিক কি সমুদয় বিশ্ব জন্মিয়াছে। অণু হইতেই সমুদয় বিশ্ব। যে অণুতে যে যে রূপ ও যে যে রসাদি ছিল, সেই রূপ ও সেই রসাদি হইতেই দ্ব্যণুক রূপের ও দ্ব্যণুক রসাদির জন্ম হয়। যেমন শ্বেত সূতায় শ্বেত বস্ত্র হয়; তেমনি, কারণ দ্রব্যের রূপাদি হইতেই কার্য্য দ্রব্যের রূপাদি জন্মে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—বিভাগ অবস্থা (Elemental state) হইতে যখন

---

necessity, and not as Anaxagorus seems to think, according to design and purpose also, though he somtimes employs a word in the sense of necessity. According to him, the word "chance" merely expresses man's ignorance of the real causes of phenomena. Nothing in nature happens without cause; all things have their reason and necessity.—History of Philosophy, Weber. P. 55.

পরমাণুরা সংযুক্ত হইতে থাকে তখন তাহাদের প্রথম ক্রিয়াসাপেক্ষতা (First motion) তোমাদের স্বীকার করিতে হইবে। ক্রিয়ার দ্বারা সংযোগ জন্মে সুতরাং সংযোগের নিমিত্ত কারণ ক্রিয়া। আবার ক্রিয়ারও যখন উৎপত্তি বা জন্ম আছে তখন তাহারও কারণ আছে। বিনা কারণে কিছুই হয় না। প্রলয়ে বা বিভাগ অবস্থায় পরমাণুতে ক্রিয়া থাকে না—তাহা হইলে পরমাণুর সংযোগ নিমিত্ত যে প্রথম ক্রিয়া তাহা আসিল কোথা হইতে ? অর্থাৎ—তাহার কারণ তোমাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি আত্মার প্রযত্ন গুণ (will) প্রথম ক্রিয়ার কারণ ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রলয় কালে শরীর না থাকায় আত্মায় গুণও থাকে না। কেন না তোমরা বল, শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগ না হইলে আত্মার প্রযত্ন গুণ জন্মে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি অভিঘাত ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রযত্ন ছাড়া অভিঘাত সম্ভব নহে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি অভিঘাত নিত্য ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা হইলে প্রলয় বা পরমাণুর বিভাগ অবস্থা অস্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি অদৃষ্টই অভিঘাতের কারণ এবং অভিঘাত হইতে ক্রিয়া জন্মে ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা হইলে অদৃষ্ট হয় আত্মার সমবায়ী (co-existent) না হয় পরমাণুর সহিত সমবায়ী সম্বন্ধে আছে। কিন্তু ইহার কোনটিও তোমরা স্বীকার কর না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি স্বীকার করি ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা হইলেও সৃষ্টি ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। কেননা অদৃষ্ট অচেতন। যাহাতে চেতনের অধিষ্ঠান নাই তাদৃশ কোনও অচেতন স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় না এবং কাহাকেও প্রবৃত্ত করায় না। সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতিবাদ খণ্ডনের সময় ইহা আমরা দেখাইয়াছি। তোমরা বল,

মনের সহিত সংযোগ হইলে আত্মাতে চৈতন্য গুণ জন্মে, তাহার পূর্ব্বে আত্মা অচেতন থাকেন। অদৃষ্ট যদি আত্মাতেই থাকে এবং অন্যত্র না থাকে তাহা হইলে আত্মা ভিন্ন যে পরমাণু তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ না থাকায় তাহা আণবিক ক্রিয়ার (Atomic motion) কারণ হইতে পারে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—অদৃষ্ট-আধার আত্মার সহিত পরমাণুর সম্বন্ধ আছে, কেন না আত্মা সর্ব্বব্যাপী।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—এরূপ বলিলে প্রলয় সিদ্ধ হয় না—কেননা, আত্মা যখন নিত্য, তখন তাহার সহিত পরমাণুর সম্বন্ধও নিত্য। আত্মার সহিত পরমাণুর সম্বন্ধ নিত্য হইলে, আত্মার সহিত সমবায়ী (co-existent) যে অদৃষ্ট তাহার সহিত পরমাণুর সম্বন্ধও নিত্য এবং অদৃষ্ট যদি সৃষ্টি ক্রিয়ার কারণ হয় তাহা হইলে সৃষ্টিও নিত্য হইয়া পড়ে—প্রলয় সিদ্ধ হয় না। অদৃষ্ট প্রলয় কালে নিদ্রিত থাকে এবং সৃষ্টিকালে জাগিয়া উঠে এরূপ কোনও নিয়ম তোমরা করিতে পার না। অতএব প্রথম আণবিক ক্রিয়ার (First Atomic motion) হেতু তোমরা দেখাইতে পারিলে না। নিমিত্ত না থাকিলে ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়া না থাকিলে সংযোগ হয় না, সংযোগ না হইলে দ্ব্যণুকাদি জন্মিতে পারে না, দ্ব্যণুকাদি না জন্মিলে স্থূলের (mass) উৎপত্তি অসম্ভব।

অতঃপর কণাদ-শিষ্যদের আমরা আর একটি প্রশ্ন করিতেছি—একটি পরমাণু যে আর একটি পরমাণুতে সংযুক্ত হয় সে সংযোগ কি সার্ব্বাত্মিক ?—না আংশিক ? সার্ব্বাত্মিক (identical) হইলে পরমাণু পরমাণুই থাকিয়া যায় উপচিত (বৃদ্ধিযুক্ত) হইতে পারে না, কাজে কাজেই তাহার মহত্ত্ব বা দীর্ঘত্ব অসম্ভব। আর যদি বল আংশিক তাহা হইলে দেখা যায় এক সাংশ দ্রব্যের একাংশের সহিত অপর সাংশ দ্রব্যের একাংশের স্পর্শকে লোকে সংযোগ বলে। কিন্তু পরমাণুর আংশিক (পাশাপাশি) সংযোগ (জোড় লাগা) স্বীকার করিলে পরমাণুর অংশ মানিতে হয়—কিন্তু তোমাদের মতে পরমাণুর অংশ নাই, কেন না যাহার অংশ আছে তাহা সাবয়ব, যাহা সাবয়ব তাহা নশ্বর।

পরমাণু যদি সাবয়ব হয় তাহা হইলে তাহা নশ্বর (প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ। একদেশে ন চেৎ সাবয়বত্ব-প্রসঙ্গঃ)।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি পরমাণুর বাস্তব অংশ না থাকিলেও কল্পিত অংশ আছে ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—যাহা কল্পিত তাহা বস্তু নহে—এবং সংযোগও অবস্তু বা মিথ্যা হইল। অতএব জন্য-পদার্থের (দ্ব্যণুকাদির) সংযোগকে তোমরা অসমবায়ী কারণ বলিয়াছিলে তাহা ঠিক হইল না; কারণ মিথ্যা-বস্তু বা অবস্তু কখনও কাহারও অসমবায়ী কারণ হইতে পারে না— অসমবায়ী কারণের অভাবে দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি অসম্ভব।

আবার দেখ, প্রথম সৃষ্টিক্রিয়ার কারণ তোমরা দেখাইতে পার নাই তেমনি মহাপ্রলয়ে পরমাণু বিশ্লেষক ক্রিয়াও অসম্ভব। কেন না সে সময়েও (সৃষ্টি শেষ হইয়াছে এইবার প্রলয় হওয়া উচিত) এমন কোন নিয়মিত নিমিত্ত থাকা প্রমাণ হয় না, কাজেকাজেই ধ্বংসক্রিয়া আরম্ভ হইতেও পারে অথবা সৃষ্টিক্রিয়া চলিতেও পারে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক অদৃষ্টই তাহার নিয়ামক ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখের নিয়ামক দেখা যায়। মহাপ্রলয়ের নিয়ামক কিরূপে ঠিক করিলে ?

সেই জন্য সৃষ্টির প্রথম এ শেষ ক্রিয়ার নিমিত্তের অভাবে, আণবিক ক্রিয়ার (Atomic motion) অভাব, আণবিক ক্রিয়ার অভাবে সংযোগ ও বিয়োগের (Attraction & Repulsion) অভাব, সংযোগ বিয়োগের অভাবে সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অভাব—এই হেতু পরমাণু-কারণবাদ অসিদ্ধ।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ অ ২, পা ২, সূ ১৩ ॥

দীপিকা। পূর্ব্বং সংযোগস্য নিমিত্তাভাবঃ উক্তঃ। ইদানীং সম্বন্ধাভাবঃ সমবায়স্যাভ্যুপগমোঽঙ্গীকারস্তস্মাৎ। সমবায়েঽপি সমানত্বাৎ সম্বন্ধ-ভেদস্য চ। সমবায়েঽপি অনবস্থিতিস্তস্যাঃ। সংযোগস্য সমবায়োনাঙ্গীকারে সিদ্ধান্তবিরোধাদিতি সমুচ্চিনোতি।

সূত্রার্থ। বৈশেষিক সমবায় নামক পৃথক পদার্থ মানেন। তাহাতেও পরমাণুবাদ ভঙ্গ হয়। তাহাদের মতে দুই পরমাণু যুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক হয়। এই দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। কেবল সমবায় নামক সম্বন্ধ বলে দুই পরমাণুতে দ্ব্যণুক, এইরূপ প্রতীতি জন্মে। সমবায়কে ভিন্ন বলেন অথচ তাহাকে ঐ নিয়মের অধীন বলেন না। আমরা দেখিতেছি, সমবায় অস্বীকার করিলে স্বমত-ভঙ্গদোষ এবং স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হয়।

সংক্ষেপে ভাষ্যের তাৎপর্য্য। বৈশেষিক মতে সমবায় নামক পদার্থ স্বীকার করা হয়। সূত্র ও বস্ত্রে সমবায় সম্বন্ধ। সেইরূপ সমবায় দ্বারা দুই পরমাণু যুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে। এবং বৈশেষিকেরা সমবায়কে ভিন্ন পদার্থ বলেন।

কিন্তু সমবায়কে ভিন্ন পদার্থ বলিলে অনবস্থাদোষ (Petitio principii) হয় কিংবা না বলিলে স্বীয়মত ভঙ্গ দোষ হয়। কেন না পরমাণু এক পদার্থ, দ্ব্যণুক অন্য পদার্থ এবং সমবায় সম্বন্ধ এই দুই ভিন্ন পদার্থকে সমবেত করিয়া দ্ব্যণুক 'প্রতীতি' করে। দ্ব্যণুক যেমন পরমাণু হইতে ভিন্ন হইয়াও সমবায় দ্বারা সম্বদ্ধ হয়, সেইরূপ সমবায়ও সমবায়ি-পদার্থ (পরমাণু ও দ্ব্যণুক) হইতে ভিন্ন হওয়ায় তাহা অন্য সমবায় দ্বারা সম্বন্ধিত হওয়া চাই। এইরূপে অনন্ত কাল ধরিয়া বিভিন্ন সম্বন্ধের কল্পনা করিতে গেলে উৎপত্তির ও জ্ঞপ্তির মূল নাশ হয়। আর যদি সমবায়কে গুণ বলা যায় তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা-হানি হয়। অতএব বৈশেষিকেরা পরমাণুবাদের দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব যে ভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহা অসিদ্ধ।

অতঃপর পরমাণুর স্বভাব বিচারিত হইবে।

(ক্রমশঃ) বাসুদেবানন্দ

৮

প্রাণমনের শুদ্ধি

অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোশ। ক্রমে তাহারও উপর। আনন্দময়ের পর যে অজ্ঞানরূপ পরদা, তাহা অপসারিত হইলে সৎ-চিৎ পূর্ণের প্রকাশ। মেঘ কাটিয়া গেলে, স্বপন টুটিলে যে কি হয়, তাহা মুখে বলা যায় না। কারণ উহা বাক্য মনের উপরকার কথা। মহাসাগরে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে দেহ মনের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা আঁচ করা যাইতে পারে, কিন্তু জলে পড়িলে কি দাঁড়ায় তাহা তীব্র সূক্ষ্মবুদ্ধি সহায়েও তীরের মানুষ জানে না, বুঝে না। যিনি হাবু-ডুবু খান তিনিই অন্তরে অন্তরে আস্বাদ করেন। কি যে করেন—তাহা কে জানে? জানিলেই বা কে বলিতে পারে?

শাস্ত্র একে একে পঞ্চকোশের উৎকর্ষ সাধন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। রজোগুণ হইতে উৎপন্ন উদান ব্যানাদি পঞ্চ প্রাণ, বাক্-পাণি-প্রমুখ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণময় কোশ। সত্ত্বাংশ-জাত মন ও চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া ইচ্ছাশক্তিমান মনোময় কোশ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি একত্রে জ্ঞানশক্তিমান বিজ্ঞানময় কোশ গঠন করে। আমাদের সূক্ষ্ম শরীর বলিতে এই সকল উপাদানকেই বুঝায়। আর অজ্ঞানই আনন্দময় কোশের আকার। উহারই অপর নাম কারণ-দেহ।

এই সকল আবরণ দ্বারা প্রতি ব্যষ্টির আসল চৈতন্য আবৃত। স্তরে স্তরে প্রতি পৈঠা এলাকার কার্য্য শেষ করিলে তবেই পূর্ণ প্রজ্ঞার আবির্ভাব বা সৎস্বরূপের স্বপ্রকাশ। সুতরাং ইহাদের কোনটিও অগ্রাহ্যের বস্তু নহে। তীক্ষ্ণ নজর সবগুলিরই উপর রাখা দরকার। তবে সচরাচর সাধারণ মানুষ প্রথম কোশে থাকিয়াই এ জীবন শেষ করে। পূর্ণ

চৈতন্যের প্রকাশ, অতি অল্পের ভাগ্যেই ঘটে। ঠিক ঠিক সন্ন্যাস বা অন্তরে বিষয় ত্যাগের কথা আসিয়া পড়িবে। ঐ প্রসঙ্গে পঞ্চকোশ বিবেকের মোটামুটি রহস্য শেষে বিবৃত করা যাইবে। বর্ত্তমানে আমরা যে প্রাণমনের উৎকর্ষ সাধনের কথা কহিব, তাহা অন্নময় কোশেরই তরফ হইতে, একথা বলিয়া রাখা ভাল। নতুবা বুঝিতে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

আমরা সাধারণ জীব, ঘোর বিষয়ে আবদ্ধ। আমাদের ভরপূর ভোগ্য-ভোক্তা-ভাব। এদেশের দর্শনশাস্ত্রে বলে, পরমাত্মা এক, বিভু বা সর্ব্বব্যাপী। বিভিন্ন সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ বা মনের সংঘাত সংস্পর্শেই ব্যষ্টিজীবের পার্থক্য বা তারতম্য। নতুবা হাত পা বহিরঙ্গের সাম্য সকলেই মিলিবে। একদিন না একদিন প্রত্যেককেই জীবনে আন্তর দ্বন্দ্বের মহা আহব অনুভব করিতে হইবে। অতএব এক কঠোর শুদ্ধি-প্রক্রিয়ার সাহায্য লইলে ধাপে ধাপে ক্রমানুযায়ী এই অশুদ্ধ অশুচি দেহান্তঃকরণমন বিধৌত হইয়া ভিতরে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উঠিতে থাকিবে; এবং সর্ব্বপরিশেষে একদিন সর্ব্বপরিচ্ছিন্ন বিহীন হইয়া পরতত্ত্বে বিলীন হইবে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির রহস্য এই মূল সূত্রের উপর দাঁড়াইয়া আছে।

প্রাণমনের দিক দিয়া আমরা যে ঘোর প্রসুপ্ত তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে কি? বাহিরের যা কিছু লম্ফ ঝম্ফ তাতো সবই মনের ভাবনার প্রকাশ। প্রত্যেকেরই জীবন ভাবময়। একটি প্রচলিত প্রথা লক্ষ্য করিবার জিনিষ—কাজে ও মনে বেশী রকমের বেফাঁস অসামঞ্জস্য ঘটিলে আমরা তখনই ক্ষমা চাহিয়া বলি, 'ভায়া কিছু মনে কোরো না। কথাটা বা কাজটা যে আকারে বেরিয়ে পড়েছে তাহা রূঢ় বটে কিন্তু মনে আমার কোন কিছু খল কপট ছিল না।'

প্রথমতঃ আমাদের শ্রদ্ধার অভাবের কথা মনে উঠে। পুরোহিত ঠাকুরকে পূজান্তে যে দক্ষিণা দেওয়া হয় তাহাতে শ্রদ্ধাকে হৃদয়ে পাওয়া যায়। দক্ষিণা শ্রদ্ধার প্রতীক। শ্রদ্ধা হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব। বেদ-

বচন আছে—দক্ষিণা শ্রদ্ধাং দদাতি, শ্রদ্ধয়া আপ্যতে জ্ঞানম (বা জসনেয়ী সংহিতা ১৯।৩০)।

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা' আমাদের নিত্যপাঠ্য। শ্রদ্ধাই জ্ঞানের দ্বার। একজন মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাম, নিজের সামনে একটি বার বছরের বালকের কথাবার্ত্তা কি সুন্দর শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছেন। দেখিবার, শিখিবার বিষয়! আর আমরা এমনি ওপোরচালাকিতে মত্ত যে যাহা ইচ্ছা শক্তিমানের বিরুদ্ধে বলিয়া চলিয়াছি। জিবে কিছু বাধিতেছে না; আমি বলছি—তুমি একটা আস্ত গরু। তুমি বলছো—আমি একটা প্রকাণ্ড ভৈঁষ। এর ফলে সদ্গুণ অর্জ্জন কি সম্ভব হইবে? নিজের ইষ্টনিষ্ঠা মানে কি পরনিন্দা বা পরের সদ্গুণ স্বীকারে অপারগতা? কিছুতে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শেষে ব্যক্তিগত নিন্দা, চরিত্র-দোষের মুখরোচক 'কেচ্ছা' গাহিতে থাকি।

ভদ্রবাক্য ভদ্রদৃষ্টি লাভের জন্য উপনিষদের শান্তি পাঠ সুপ্রসিদ্ধ। সংহিতায়ও এই প্রকার বচন পাওয়া যায়—"ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ"—অথর্ব ১৯,৪১ "জিহ্বা মে ভদ্রং বাঙ্"—যজু ২০।৬।

তারপর মনে পড়ে মনের ধৈর্য্যের কোঠায় আমাদের মস্ত ফাঁক। পাড়ায় ছেলেটি স-র-গ-ম সাধা ধরিয়াছেন। চটুলতা বা ফাল্তো কায়দায় বাজে ওস্তাদ বনিয়া ফয়তা দিবার জন্য নহে। আন্তরিক ভাবে বেশ পাকা পোক্ত কোরে সুর-বিজ্ঞানটি আয়ত্ত করিতে ইচ্ছুক। আমার গায়ের জ্বালা অসম্ভব। এ বিদ্যে শিখবে বল্লেই কি শিখবে? খালি তাহাকে প্রহার করিতেই বাকি। কাণ ঝালাপালা। আরে পাড়াপড়শী সবায়ের অধৈর্য্য হোয়ে গেল। আর তুমি ঠিক্ বেমালুম দৃঢ়কণ্ঠে সকাল বিকেল ঠিক সময়ে রোজের পর রোজ চেঁচিয়ে চলেছো, একদিনও কামাই নেই। জানো—আমরা পুলিশ করতে পারি, তোমার এ বেয়াদবী মস্ত অপরাধ। আমরা অতিষ্ঠ। ক্ষমা—হবে না, তুমুল আন্দোলন তুলবো, শীঘ্র 'মুন্সিপ্যাল'কে রিপোর্ট করবো, সবাই মিলে সই কোরে তোমার বিরুদ্ধে মস্ত দরখাস্ত দাখিল করা হবে, দেখি তোমায় সায়েস্তা করতে পারি কি না। তুমি আছো কি আমরা আছি, আর এটা জেনো এত-

গুলি লোককে চটিয়ে তোমার কখনও কিছু কি মঙ্গল হবে, আশা করো? ও তোমার চোদ্দপুরুষে কেউ গাইয়ে হোতে পারে নি, তুমি কি ভুঁইফোঁড় বা তালগাছ থেকে পড়ে ভাবছো একটা মস্ত ওস্তাদ হবে? গালাগালের চরম খেয়েও তোমার লাজলজ্জা নাই। আর বোল্লেই বলো, এজন্মে না হয় পরের খেপে তো হবে।

সে কেবল ধৈর্য্যের উপর উপদেশ দিয়ে বলে—আপনারা কি ও পাড়ার বাপে খেদান মায়ে তাড়ান সিধুকে জানেন না, যে দিন ১০।১২ মাইল হেঁটে এক হাঁটু পাঁক কাদা ঘেঁটে রোদে মাথার চাঁদি ফাটিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে আহার নিদ্রা ছেড়ে যতক্ষণ চোখচলে খ্যাপার মত একমনে স্থির নয়নে খানা ডোবা পুকুর যেখানে সুবিধে পায়, ছিপ ফেলে বসেই আছে। কখন কখন হয়ত একটা আধটা রুই মিরগেল, নিদেন বাচ্ছা বাটা, পোনা চুনা কিছু টোপে ধরা পড়ে। বাপ্ রে বাপ, তার কি অসীম ধৈর্য্য। আমি তাকে দেখে আশ্চর্য্য হই। রোগ ভোগ কিছু মানে না: কি বিশ্রী জিদ! আমার তাকে দেখে বুকে বল আসে। আর নিজের খেয়ালটাকে আরও নিবিড় কোরে বুকে জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। প্রাণ যায় যাক্। ধৈর্য্যের সীমা থাকলে কি হয়? ব্রহ্মের মতই বুঝি ধৈর্য্যের কুল কিনারা নাই। এক একজনের জপে কি ধৈর্য্য! পড়ায় কি অনুরাগ! যেন ধনুর্ভঙ্গ পণ! এই দেখুন না, একটা সামান্য কলা কৌশল হাত-সাফাই আদায় কত্তেই এত কোরে আদা ছোলা খেয়ে লেগে পড়ে থাকতে হয়। একি যার-তার কর্ম্ম। যে যত দুর্ব্বল তার তত অধ্যবসায় চাই। কারণ তার গাঁট যে সবচেয়ে শক্ত। খুলতে বেশী সময় লাগে।

যাঁরা নিজেরা ধৈর্য্য ধরিয়া সৎসাহসের একাগ্রতা দৃঢ়তার সহিত কোন অভ্যাসে লিপ্ত থাকিতে পারেন না, উপরকার কথা কি সেই সব অভিভাবকদের বহ্বারম্ভের নমুনা?

আবার, এক পিতার কথা জানতাম। আদুরে দুলাল তাঁহার কোলের ছেলে বর্ণপরিচয় বা দ্বিতীয় ভাগ দেখলেই আঁৎকে উঠ্তো। কিছুতেই 'লেকা'পড়া শিখবো না—এই ছিল তার কঠিন শপথ। বই হাতে দিলেই শ্রীমান ভেউ ভেউ কোরে কেঁদে কাপড় চোপড়, মেজের ফরাস

বিছানা সব ভাসিয়ে দিতো। যেন এক অতিবড় শত্রুতে তার কি ভীষণ সর্ব্বনাশ—বজ্রাঘাত ঘটিয়েছে। বিষম বায়না। 'সামঞ্জস্য' 'মৃত্যুঞ্জয়' এই সব বানান অভ্যাস করতে করতে বেচারার দাঁত ফেটে যাবার জোগাড়। কি অনিষ্টই মাষ্টারে কোরেছে। এতলোক ম'রে ভূত হোয়ে যায়—পোড়া ভাগ্য, আমার মাষ্টার মরে না? তাহোলে সব চুকে যায়। পরের দিন 'মৃত্যুঞ্জয়ের' পাল্লা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মাষ্টারের আড়ালে ফন্দিবাজ 'ফোক্‌রে' সেই পাতাখানা ছিঁড়ে দিলে। কিন্তু দেখ্‌লে তাতেও পরিত্রাণ নেই। বাবা ধৈর্য্যের অবতার। তিনিও 'কোট্' কোরেচেন বামুন কায়েতের ঘরে মুখ্যু পুষবেন না। মেরে ধরে বকুনি দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে মার্ব্বেল ঝুম্‌ঝুমি 'ল্যাবঞ্চুস্' কিনে দিয়ে—নানা উপায়ে তিনিই শেষে জিতলেন। 'ফোক্‌রে' এখন সাত আটটা খেতাব-ধারী। বার্লিন-মার্কিন-ফেরত। বড় বড় পণ্ডিত সংসদের মেম্বর প্রোফে-সর। কিন্তু ছেলেবেলায় পর পর আটখানা 'পেরথম্' ভাগ সে ছিঁড়ে ছিলো। এবং বাবাও কখনও রেগে কখনও মুচ্‌কি হেসে আটখানা ক্রমাগত গচ্চা দিয়েছিলেন। এখন পিতাপুত্রে সেই কথা আলোচনা করেন ও হাসিয়া কুটি-কুটি হন।

মানুষের মনের কারচুপী যে কতরকম তাহার ইয়ত্তা হয় না। প্রকার-ভেদ অনন্ত। বুড়ো-থু-থু্ড়ো ঠাকুমার নিকট শুনেছি, ধর্ম্ম ধন ও আয়ু এ তিন গোপনে রাখ্‌তে হয়। ইহা কি কেবল ভীমরতির উক্তি—মেয়েলী কথা মাত্র? অথবা সত্য হিতকর সদ্বচন জানি না। তবে আমরা তো বড়মুখ করিয়া খালি বলিতেছি, যত গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব কথার ভাণ্ডার সব তিনি আমাদের কাছে গোপনে রেখে গেছেন। আমাদের সাধন-ভজন জপতপ মন স্থিরের চেষ্টা এ সব কিছুই করতে হবে না। তিনি বোলে গেছেন, আমার বাড়াভাতে তোরা সব যে যার বসে যা। তিনি স্বয়ং আমাদের ভার নিয়েছেন। অতএব আমরা যা ইচ্ছে করে যাব। আমাদের ছাড়পত্র আছে—যেমন করছি তেমনি কর্‌বার। আর যা কিছু করছি সব তাঁর কাজ। তিনি করাচ্ছেন। তিনি মালিক। আমরা গোলাম। তিনি চালক। আমরা চালিত। তিনি যন্ত্রী।

আমরা যন্ত্র। যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি। অজ্ঞান না থাকলে জ্ঞানের কদর থাকবে না। আমি লিপ্ত আসক্ত বলেই, ছোট বলেই তোমার এত সুখ্যাতি এত উন্নতি। 'রসে-বসে' থাকতে বোলেছেন। শুক্‌না হোতে মানা। মুখে শরণাগতির চরম, আর মনে মনে কেবল মতলববাজী। উচ্চ তত্ত্বকে অবাই কোরে আমরা যে কি বিশ্রীখাদ্য বানাতে পারি তাহারই কিঞ্চিৎ নমুনা বা পরিচয়।

ভূতে বাঁদরে বিবাদ কি মিটিবে? আর ইহাই কি সমগ্র উপদেশের মূল উদ্দেশ্য মেঘাচ্ছন্ন করিয়া আপনার সুবিধামত শয়তানের শাস্ত্র উদ্ধার? বা নিজের শৈথিল্য গুরুর নামে চালান? তুমি বড়গুরুর বড় শিষ্য। খুব ভাগ্যবান। এবারের বা জন্মজন্মান্তরের সুন্দর যোগাযোগ। অকপটে কহিতেছি—নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেই জন্যই তো তোমার দায়িত্ব অধিক, গুরু বোঝা আরও ভারি হওয়া উচিত। গুরুর পরিচয়েই শিষ্যের পরিচয়—শতবার সত্য। কিন্তু তাঁকে সামনে রেখে নিজেদের বাঁদরামি সমর্থন কি যুক্তিযুক্ত?

আবার আমাদের মনের মরণ, নিশ্চেষ্ট জড়তা এতদূর যে, কোন গ্রামের বড় বড় মোড়লে একত্র হইয়া এস-ডি-ও-কে সটান সজোরে একবার বলিয়া দিলেন,—ও মশাই, আমাদের বদভ্যাস, কদভ্যাস যা আপনি ছাড়তে, সংশোধন করতে আদেশ করছেন তা মরে গেলেও পারব না। অমন কথা কইবেন না। 'ম্যালয়ারী'তে চার পাঁচ পুরুষ ভুগছি। গা সওয়া হোয়ে গেছে। ওতে কিছু এসে যাবে না। এসডিও-র অপরাধের মধ্যে ঝোপ জঙ্গল ময়লা আবর্জ্জনা সাফ করবার জন্য তিনি সবাইকে অনুরোধ করছিলেন। ইহা কি দূরদৃষ্টির অভাব-প্রসূত? না একান্ত পঙ্গু মনের প্রলাপ?

স্বামী নির্লেপানন্দ

বরষার ইন্দ্রজাল

হেরিলাম—তুষার ধবল
তুঙ্গগিরি ; তারা জলে শিরে ;
পদতলে সিন্ধু টলমল ;
কৃষ্ণ ফণী সারা অঙ্গ ঘিরে
রহে ঊর্দ্ধ-মুখ ।
দূরাগত সঙ্গীতের প্রায়
শূন্যে ধীরে মিলাইল কাল ;
অবিরল আনন্দ-ধারায়
সিরঞ্জিল রস অন্তরাল
গুপ্ত উৎস-মুখ ।

গিরিচূড়ে পুরুষ রমণী
বুকে বুকে আধ বিজড়িত ;
দুঁহু ভালে জলে নীলমণি,
জটা-জালে বেণী বিলম্বিত,
চাহি পরস্পরে ।—
অকস্মাৎ অশনির ভাষে
থেমে গেল নূপুরের রোল,
চেয়ে দেখি—আকাশে বাতাসে
বরষার হিল্লোল কল্লোল,
ছবি গেছে সরে ।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

সরল বেদান্ত

সূচনা

বেদান্তের তত্ত্বসমূহ অত্যন্ত গভীর ও জটিল বলিয়া সাধারণের ধারণা। হিন্দুর মুখ্য শাস্ত্র 'বেদান্ত' দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া সাধারণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মনে হয় যে, কিছুদিন ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে ঐ শাস্ত্র আলোচনা করিলে উহার আপাতঃ-প্রতীয়মান জটিলতা দূর হইয়া যায় এবং উহা ক্রমশঃ সহজ ও সুবোধ্য হইয়া উঠে।

প্রতিপাদ্য বিষয়

উপনিষদ্ সমূহ বা বেদের জ্ঞান-কাণ্ডই বেদান্ত নামে অভিহিত। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে দুঃখের চির অবসান হয় এবং নিত্যানন্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ যিনি স্বীয় উপলব্ধি দ্বারা এই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তিনি জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান।

শিশু ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইল। মাতৃস্তন্যপানে হাসি-ক্রন্দনের মধ্য দিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালক মধ্যে মধ্যে মাতৃ-ক্রোড় পরিত্যাগপূর্ব্বক সহচরবৃন্দের সহিত খেলায় উন্মত্ত হইল। খেলা-ধূলার মধ্যে মাতাপিতার প্ররোচনায় অধ্যয়নে মন দিতে হইল। মেধাবী শ্রদ্ধালু বালক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়নে রত থাকিয়া উত্তরোত্তর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করিতে করিতে যথাকালে উহার চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া শিক্ষকগণ ও আত্মীয় স্বজনকে চমৎকৃত করিল। পক্ষান্তরে, তাহার স্থূলবুদ্ধি খেলার সহচর মাতাপিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কিছুদিন বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য হইলেও অচিরেই বুঝিয়া লইল যে, অধ্যয়নকার্য্য তাহার পক্ষে সহজ ও সুখসাধ্য নহে। সে

তখন ইহার পরিবর্ত্তে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন সুখকর কার্য্যে চিত্ত-নিয়োগ করিল।

কিশোর অবস্থা চলিয়া গেল; যৌবনোদ্গম হইল। এখন পূর্ব্বের সেই ক্রীড়ারত বা বিদ্যারত চিত্ত এই সকল ক্ষুদ্র জিনিষকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রবলবেগে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইল। শত বাধাবিঘ্ন পর্য্যুদস্ত করিয়া বিষয়ভোগই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করিল। নিত্য নিত্য নব নব বাসনার স্ফুরণ হইতে লাগিল এবং উহাদিগকে চরিতার্থ করিতে কৃত-সংকল্প হইল। কই তৃপ্তি ত হইতেছে না! কিন্তু কামনারও যে শেষ নাই। যাক্ ভাবিয়া দেখিবার সময় নাই। যথাসাধ্য ভোগ করিয়া লওয়া যাউক। ভোগ চলিতে লাগিল এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যা, তাহারও আবির্ভাব হইতে বিলম্ব হইল না। শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ইন্দ্রিয় সমূহ শিথিল হইয়া গেল। প্রকৃতির দুর্লংঘ্য নিয়মের বাধা দেয় কে? হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা হৃদয়েই রহিয়া গেল! এদিকে বার্দ্ধক্য দেখা দিল।

শীর্ণশরীর শিথিলেন্দ্রিয় বৃদ্ধ চিন্তারাজি ও শোকতরঙ্গের ক্রীড়নক হইল। কোনওরূপে দিনাতিপাত করিতে করিতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভোগায়তন শরীর এখন দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ হইয়াছে, অপূর্ণ বাসনা-বিক্ষিপ্ত মন স্বেচ্ছাচারী হইয়া প্রভুত্ব করিতেছে। আত্মীয় স্বজনের ঘৃণা ও উপেক্ষা বৃদ্ধের জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। এই তীব্র যাতনার হস্ত হইতে অব্যাহতি দিবে কে? হৃদয়-তন্ত্রী হইতে ইহার প্রত্যুত্তর বাজিয়া উঠিতেছে—মৃত্যু! তাই বৃদ্ধ মৃত্যুর পথ-পানে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে।

যথা সময়ে মৃত্যু আসিল। বৃদ্ধকে জাগতিক জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিল। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় যাহার আরম্ভ হইয়া-ছিল তাহা এইরূপে শেষ হইল। কোন্ এক অজ্ঞাত দেশ হইতে আসিল—হাসিল—কাঁদিল; আবার অজ্ঞাত দেশেই চলিয়া গেল। কোথা হইতে আসিল? কোথায় গেল?

যে চলিয়া গেল তাহার মনে হয় ত এই সব প্রশ্ন উঠে নাই; অথবা

উঠিলেও উহারা যখনই উঠিয়াছিল হয় ত তখনই প্রদমিত ও অপসারিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাবুক দ্রষ্টা যিনি ঐ শ্মশান-দৃশ্য দেখিলেন, স্থির থাকিতে পারিলেন না; ভাবিলেন—এ কি প্রহেলিকা! এ প্রহেলিকার কি সমাধান হয় না? স্মৃতিপথে পূর্ব্বশ্রুত বাণী স্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠিল,—

"যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥"
[মোহ-মুদ্গর]

'জন্ম হইলেই মৃত্যু, আবার মৃত্যু হইলেই জননী-জঠরে শয়ন; সংসারের এই স্পষ্ট দোষ। হে মানব, এখানে কিরূপে তোমার সন্তোষ হইতে পারে?'

সংসার দুঃখময়। গর্ভবাসের অসহ্য যন্ত্রণা—বাল্যকালে মাতাপিতা ও শিক্ষকের তাড়না—যৌবনে বিষয়-ঘূর্ণিতে আবর্ত্তমান মনের চাঞ্চল্য ও তজ্জন্য ভীষণ অশান্তি—বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়-বৈকল্য ও শারীরিক দুর্ব্বলতা—সময়ে সময়ে ব্যাধির অনতিক্রমণীয় আক্রমণ—এবং পরিশেষে মৃত্যুর যাতনা;—ইহারা সকলেই করাল সংসার-চিত্রের এক একটি মসীময় রেখা। এই ঘোর ভীতিপূর্ণ চিত্রই সিদ্ধার্থকে কপিলা-বস্তুর সিংহাসন ও নবজাত সুকুমার শিশুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বোধিদ্রুমতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিল এবং স্বল্পবয়স্ক বাল-ব্রহ্মচারী শঙ্করকে মাতৃ-স্নেহ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া গুহাস্থ গোবিন্দপাদের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করাইয়াছিল।

কেহ কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন, উপরে যাহা বলা হইল তাহা একদেশ-দর্শীর দৃষ্টিতে সত্য; কারণ, সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তেমন সুখও ত আছে। গোলাপফুল তুলিতে গেলে কাঁটা ত ফুটিবেই, তা বলিয়া কি ফুল তোলা হইবে না? গোলাপের সৌরভে কণ্টকের যন্ত্রণা দূর হইয়া যাইবে। মাতাপিতার স্নেহ ও ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি হইতে যে সুখ পাওয়া যায় তাহার তুলনায় দুঃখ অকিঞ্চিৎকর।

স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে অন্যরূপ প্রতিভাত হয়। মাতাপিতা

ও আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বার্থপ্রণোদিত; ক্বচিৎ নিঃস্বার্থ দেখা যায়। আবার নিঃস্বার্থ হইলেও কেহই ত এই মর্ত্ত্যধামে দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। প্রায়ই দেখা যায়, যাঁহার স্বার্থহীন ভালবাসায় লোকে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের শুভাশুভের ভার তাঁহার উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়, তিনি অচিরে তাঁহার মুখাপেক্ষিগণকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া যান। বিষয়ভোগ হইতে যে সুখ পাওয়া যায় তাহা আপাতঃমনোরম হইলেও পরিণামে যে দুঃখপ্রদ—ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এই ভোগের আবার মাত্রা আছে। সংযমের সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই মাত্রা হইতে বহুদূরে যাইতে না যাইতেই ভোগের নিত্য সহচর রোগের হস্তে পতিত হইতে হয়। এবং তখন উহা, উপভোগে যে সুখটুকু আমরা পাইয়াছিলাম তাহার শতগুণ দুঃখ আমাদিগকে ভোগ করাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়। বিষয়সুখ ক্ষণিক। বিষয়ভোগজনিত যে আনন্দ তাহা ভোগকালেই অনুভূত হয়, তদনন্তর উহা স্থায়ী হয় না। অথচ আমাদের সকলেরেই হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ইচ্ছা যে, আমরা স্থায়ী আনন্দ উপভোগ করি। ক্ষণিক ও অস্থায়ী কোন কিছুতে আমরা তৃপ্ত নহি। তবে স্থায়ী কোন কিছু পাইনা বলিয়াই ক্ষণিক ভোগেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হই। হৃদয়ের এই যে নিত্যানন্দ উপভোগের ইচ্ছা—ইহা কোথা হইতে আসিল? এবং এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারায়—যে অশান্তি ভোগ করিতে হয় তাহার কি নিবৃত্তি নাই?

তাহা হইলেই এখন দেখা যাইতেছে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই—তিনি সত্যান্বেষীই হউন আর সুখান্বেষীই হউন—এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কালাতিপাত করিতে প্রস্তুত নহেন। সত্যান্বেষী ভাবিতেছেন—আচ্ছা, এই যে জন্মমৃত্যুর কৃষ্ণবর্ণ পর্দ্দা দুইখানা দুইদিকে লম্বমান রহিয়াছে—উহাদের পশ্চাদ্দেশে কি রহিয়াছে—তাহা কি জানা যায় না? পক্ষান্তরে, সুখান্বেষী ভাবিতেছেন—আচ্ছা, এমন সুখ কি পাওয়া যায় না যাহার শেষ নাই এবং যাহার পরিণামে দুঃখভোগ করিতে হয় না?

শ্রুতি সুস্পষ্টভাবে এই প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতেছেন,—"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্ব পাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।" 'আত্মদেবকে জানিলে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, ক্লেশসমূহ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং জন্মমৃত্যুর পারে যাওয়া যায়।'

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।"

'যিনি এক, নিয়ন্তা, সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন, যিনি এক রূপকে বহুপ্রকারে প্রকাশ করেন, সেই আত্মস্থ দেবকে যে সকল ধীর পুরুষ-সাক্ষাৎকার করেন, তাহাদেরেই নিত্য সুখ, অপর কাহারও নহে।'

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিলে, চিরদিনের মত এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়, এই পরিদৃশ্যমান অনিত্যের মধ্যে নিত্য কি তাহা জানা যায়, এবং নিত্যানন্দ ও শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারা যায়। এই জন্য মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য —ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বা জ্ঞান-লাভ।

(ক্রমশঃ) নিঃসঙ্গানন্দ

সংস্কারক বিবেকানন্দ

ভারতের সমগ্র প্রাণখানিই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে প্রতিবিম্বিত হইয়া গিয়াছিল। তাই যেখানেই ছিল ভারতের ব্যথা, সেইখানেই ছিলেন তিনি দরদী সেবক।

নব সংস্কার-যুগে যখন সংস্কারক দলের উদ্দাম সংস্কারকার্য্য চলিতেছিল, তখন স্বামিজীকে তাঁহার দরদী ভারতের ব্যথার ব্যথী প্রাণশক্তি লইয়া ঐ ভ্রান্ত সংস্কারের প্রতিরোধ করিতে হইয়াছিল।

সংস্কারক দল ভারতীয় সভ্যতায় আঘাত দিয়াছিল। ইউরোপ হইতে সরাসরি যদি এ আঘাত আসিত, তবে বিশেষ ক্ষতি হইত না। দেখা গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকের চেষ্টায় বিশেষ কিছু হয় নাই; যতখানি হইয়াছে তাহার স্বদেশী সংস্কারকের বিদ্রোহে। স্বদেশী সংস্কারক ছিলেন যেন বিভীষণ। সংস্কারকগণ দেশের সর্ব্বস্বকে ঘৃণা করিয়া উহা বর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য আদর্শকেই বড় করিয়া ধরিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ উহা খণ্ডন করিয়া জাতির বিভ্রান্ত দৃষ্টির কাছে ভারতের মহিমময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি দেখাইলেন ভারতের প্রতীক-উপাসনার মাহাত্ম্য, বর্ণাশ্রমের নিগূঢ় প্রকৃতি এবং ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তার সার্ব্বভৌমিকত্ব। ইহা যে তিনি শুধু তার্কিকের সুতীক্ষ্ণ তর্কশক্তির দ্বারাই করিলেন তাহা নহে, ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারাও প্রমাণ করিলেন।

ইউরোপ ভারতের বিরোধী বটে; কিন্তু ভয়ঙ্কর বিরোধী তাহার স্বদেশী সংস্কারক—যাহাকে বলে "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।" স্বামিজীর উক্তি—"সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা এক আধটু সংস্কার করিতে চান, আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁহাদের সংস্কার ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলা—আমার সংগঠন।"

স্বামিজী বলিতেছেন, "আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।" এই স্বাভাবিকতাই সংস্কারের প্রাণ। বাহির হইতে যাহা কিছু জোর করিয়া করা যায়, উহা সত্য নহে। স্বাভাবিক গতিতে যাহা সাধিত হয়, তাহাই সত্য ও শুভপ্রদ।

"উহার পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক দিয়া যাও, কিন্তু উহা আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী দেহ গঠন করিয়া লইবে।" ইহাই প্রকৃত সংস্কারের প্রকৃতি।

স্বামিজী ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন যে বাহিরের সংস্কার কি প্রকার ব্যর্থ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি আমেরিকার দাসপ্রথা উচ্ছেদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রকৃত সংস্কারের প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন—"এদেশে কি কখন সংস্কারকের অভাব হইয়াছিল? রামানুজ কি ছিলেন? শঙ্কর? নানক? চৈতন্য? কবীর? দাদূ? এই যে বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যগণ ভারত-গগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র প্রায় একে একে উদিত হইয়া আবার অস্ত গিয়াছেন, ইঁহারা কে ছিলেন?"

কিন্তু তাঁহাদের সংস্কার জাতির পক্ষে ছিল—আশীর্ব্বাদ। আর বর্ত্তমানের ইহা শাসন। জগতে যাহা কিছু সাধিত হয়, তাহা শুধু প্রীতির দ্বারা; শাসনে কিছু সিদ্ধ হয় না। নব্য সংস্কার ছিল স্নেহ-শূণ্য তাড়না বা আঘাত। স্বামিজী বলিয়াছেন, "আধুনিক সংস্কারকগণের ন্যায় তাঁহাদের মুখ হইতে কখনও অভিশাপ উচ্চারিত হইত না, কেবল আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইত।"

পাশ্চাত্য প্রণালী মত সংস্কার যে একান্ত অবৈজ্ঞানিক, স্বামিজী তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের পশ্চাতে আবার অন্যবিধ পরম্পরাগত সংস্কার ও সহস্র সহস্র বর্ষের কর্ম্ম রহিয়াছে। সুতরাং আমরা স্বভাবতঃই আমাদের সংস্কারানুযায়ী চলিতে পারি।"

জাতীয় চরিত্র একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে; তাহার পিছনে যুগ যুগান্তর্গত সাধনা সঞ্চিত আছে। উহার আমূল পরিবর্ত্তন অর্থে, উহার একেবারে ধ্বংস। নব্য সংস্কার এই ধ্বংসের পথেই ছুটিয়াছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আগমনের পরই দেশের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে জাতীয় জীবনের অংশবিশেষ দুর্ব্বল হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাঙ্গই বিষাক্ত হইয়াছিল। প্রাণটা রক্ষা পাইলে পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা থাকে। ব্যষ্টির প্রাণ যেমন জীবনী-শক্তিতে, জাতির প্রাণ তেমনি আত্মবিশ্বাসে। আমার জাতি, আমার দেশ, আমার ধর্ম্ম, আমার জাতীয় সভ্যতা—বিধি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ইহার একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে, আমার নিকট ইহা মহৎ, ইহাই গরিষ্ঠ, ইহাই আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধির সোপান, ইহাতেই আমার চতুর্ব্বর্গ-লাভ। হয় তো তুলনায় অপরের কিছু বড় হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর, শুভকর আর কিছু নাই। ইহাই জাতীয় আত্মবিশ্বাস।

এই আত্মবিশ্বাস-বিচ্যুতির মত জাতির পক্ষে সর্ব্বনাশজনক আর কিছুই নাই। প্রাচীন কালেও কতবার সমাজের অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রাণশক্তি অব্যাহত থাকাতে অর্থাৎ তাহার আত্ম-বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকাতে উহা শীঘ্রই ঘুচিয়া গিয়াছে, এবং সংস্কারচেষ্টা সফল হইয়াছে।

আত্মবিশ্বাসের বিলুপ্তিতে সংস্কারের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যায়। কাহার জন্য সংস্কার? কিসের সংস্কার? যাহা নিকৃষ্ট তাহার উদ্ধারের আবশ্যকতাই বা কি? এই চিন্তায় জাতি যাহা গ্রহণ করিতে যায় তাহা পরধর্ম্ম, যাহা বৈনাশিক—যাহা ভয়াবহ।

শঙ্কর-রামানুজের যুগের সংস্কারের মত বিবেকানন্দের কার্য্য সহজ ছিল না; বিবেকানন্দের ব্রত যেমন কঠিন, তেমনি জটিল। শঙ্কর-রামানুজের সময় জাতি বাঁচিয়া ছিল, এখন জাতি আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছিল। ইউরোপ ভারতীয় জাতির আত্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করিতেছিল। উন্নতি বলিয়া যাহা হইতেছিল, তাহা ধ্বংসেরই নামান্তর। কারণ জাতি তাহার সনাতন জাতীয়তা ত্যাগ করিয়া ফিরিঙ্গী বনিতে-ছিল। পাশ্চাত্য যুগের সংস্কারে ইহাই দারুণ ব্যাধি।

ভারতের যুগ যুগান্তের তপস্যা, তাহার সনাতন সভ্যতা ইউরোপের বিশ্লেষ-ছুরিকায় খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছিল। আত্মবিস্মৃত জাতি পশ্চিমের দীক্ষায় জাতীয় উন্নতি বলিয়া যে ব্যবস্থার আয়োজন করিতেছিল, তাহাতে তাহার মরণের পথকে আরও নিকটবর্ত্তী করিয়াছিল। স্বামিজী ইহা রুদ্ধ করিলেন। আর ইহাই বোধ হয় তাঁহার সমগ্র কার্য্যের ভিত্তিভূমি। বিবেকানন্দ জাতীয় আত্মবোধের জাগ্রত বিগ্রহ,—বিস্মৃত জাতির আত্মা যেন বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথম সম্বিৎ লাভ করিল। স্বামিজীও প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য ভাবের স্পর্শ লইয়া জাতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছিলেন।

কিন্তু জাতিকে মোহপঙ্ক হইতে উদ্ধারের জন্যই বিবেকানন্দের আত্ম-বোধের বিকাশ। শঙ্কর, রামানুজ এমন কি স্বামিজীর সমগ্র শক্তির উৎস ঠাকুর রামকৃষ্ণের দ্বারাও ইহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ ভুক্তভোগী যে, সেই কেবল পাশ্চাত্য কদর্য্যতার সাক্ষী এবং তাহারই প্রতিকার চেষ্টা অমোঘ।

ইউরোপীয় জাতির আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু কেহই ভারতকে প্রকৃত ভাবে জয় করিতে পারে নাই; শক হুন ভারত-অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল; মুসল-মানও আরবের মরুসভ্যতা ত্যাগ করিয়া ভারতকেই দেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

ইউরোপ অন্য পন্থা অবলম্বন করিল। যে বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা অটুট রহিলে দেশের আবার উদ্ধারের আশা থাকে, সেই শ্রদ্ধা-বুদ্ধিকেই ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। ইহারই নাম "কাল্‌চারাল্ কন্‌কোয়েষ্ট"। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের ইহাই অন্যতম গূঢ় কারণ। ভারতবাসীকে অজ্ঞান অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই যে মেকলে প্রভৃতি ইংরেজ কাতর হইয়াছিলেন তাহা নহে। উদ্দেশ্য—ভারতকে তাহার মহিমা হইতে বিচ্যুত করা—তাহাকে আত্মবিস্মৃত করা। আফ্রিকা আমেরিকার নিগ্রো কাফ্রি জাতি যেমন পাশ্চাত্য জাতি সমূহের দাস—ইউরোপীয় জাতির পরিচর্য্যা ছাড়া তাহাদের যেন আর কোন জীবনো-

দেখেই নাই—তেমনি ভারত আত্মবোধ শূন্য হইলেও পশ্চিমের চিরদিনের দাস হইয়া যাইবে—ভারত-বিজয় সম্পূর্ণ হইবে।

এই বিজয়াভিযান যে ভাবে চলিতে লাগিল, তাহাতে, উহা অব্যাহত থাকিলে আর্য্যসভ্যতা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। তাহার প্রমাণ,—ইংরাজী শিক্ষিত সমাজ যে উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করিল, তাহাও খৃষ্টীয় অনুকরণে; যেন ভারতের পূর্ব্ব সাধনা সবই ভ্রান্ত। জাতীয় পরিচ্ছদও পরিত্যক্ত হইতে লাগিল, যেন উহা বর্ব্বরোচিত। এইরূপ জাতীয় যাহা কিছু সবই অনাদৃত হইতে লাগিল। পরবর্ত্তীকালে দেশ যে স্বাধীনতা চাহিল, তাহাও "কলোনিয়াল সেলফ গবর্ণমেণ্ট"। যেন ইউরোপ ভিন্ন আর গতি নাই। ইউরোপের সংস্রবের পূর্ব্বে যেন ভারতের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

পুরুষোত্তম বিবেকানন্দ তাঁহার অলৌকিক মনীষার কিরণ-সম্পাতে দেশের অমা-রজনীর অবসান ঘটাইলেন। ইংরাজীতে সুপণ্ডিত হইয়াও তিনি বেদান্ত উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী হইলেন, নব সৃষ্ট ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উৎসাহী সভ্য হইয়াও তিনি একজন পূজারী নিরক্ষর—ফেরঙ্গ-বিচারে অসভ্য বর্ব্বর-তুল্য ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। আর এইখানেই স্বামিজীর সংস্কারের মূল সূত্রটি নিহিত রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)   শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়

আমরা আজ এক মহাপুরুষের জীবনবেদ আলোচনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে যে মহৎ জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহা আমরা যতই আলোচনা করিব ততই আমাদের মঙ্গল। বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চিরদিন কিরণ বিতরণ করিবেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। শৈশবকালে তাঁহার খেলাধূলায় তেমন অনুরাগ ছিল না, কখনও বা সঙ্গীদের আগ্রহে খেলিতে হইত। খেলিবার সময়ে কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না, যদি কেহ বলিত তবে সে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা না-চাহা পর্য্যন্ত তিনি আর তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। একবার সত্যকথা বলার ফলে, তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে ধানক্ষেতের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ঐ কষ্টকে তিনি ভ্রূক্ষেপের মধ্যেই আনেন নাই। বারো তেরো বৎসর বয়সের সময়ে তিনি স্বীয় গ্রাম হইতে ঢাকা বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেন, ইহাতে তাঁহাকে নিত্য দশক্রোশ পথ হাঁটিতে হইত।

পরের উপকার করা শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের জীবনের ব্রত ছিল। শৈশব কাল হইতেই তাঁহার হৃদয় অন্যের দুঃখে কাঁদিত। মানুষের ত কথাই নাই, বন্য পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিলে তিনি তাহাদিগকে নিজের আহার্য্য দিয়া দিতেন। ধীবরেরা জীবন্ত মৎস্য বিক্রয় করিতে আসিলে, তিনি তাহা কিনিয়া পুকুরে ছাড়িয়া দিতেন। উত্তর-জীবনেও তিনি নারায়ণজ্ঞানে অতিথি সেবা করিতেন। অতিথি সেবায় নিজের শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে একেবারেই তাকাইতেন না। একবার তাঁহার শূলবেদনা হইয়াছে, এমন সময়ে কয়েকজন অতিথি হয়া উপস্থিত। কি করিবেন ঐ বেদনার মধ্যেই বাজারে চলিলেন।

বাজার করিয়া পথে মোট লইয়া আসিতে আসিতে শরীর অবশ হইল, পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়, হায়, ভগবান আজ একি করিলেন, গৃহে নারায়ণ উপস্থিত তাঁহাদের সেবায় বিলম্ব হইল।" পরে বেদনার উপশম হইলে মোট লইয়া বাড়ী ফিরিয়া অতিথিদের বলিলেন, "আপনাদিগের নিকটে সেবাপরাধী হইলাম।" অন্য এক সময়ে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের ভাল ঘরখানা ছাড়িয়া দিয়া বাহিরে দুর্যোগের মধ্যে কাটাইলেন।

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় গাছের একটি পাতা ছিঁড়িতেও হৃদয়ে বজ্রবেদনা অনুভব করিতেন। অন্য কাহাকেও ছিঁড়িতে দেখিলে বলিতেন, "আহা! এদেরও ত সুখ দুঃখ আছে।" ঘাসের উপর দিয়া চলিতে পারিতেন না। বাড়ীতে আম গাছ হইতে আম পাকিয়া পড়িয়া গেলে লোকে খাইতে পারিত, কাহাকেও গাছ হইতে ছিঁড়িতে দিতেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার পিতা বলিতেন, "দুর্গাকে দশটাকা দিলেও গাছের একটি পাতা ছেঁড়ান যায় না।"

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের বাল্য সুহৃদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বলেন, "নাগ মহাশয়ের জীবন বাল্য হইতেই একেবারে কলিমা-শূন্য। ধর্ম্মভাব শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তাহার সহজাত ছিল।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে যাইবার বহুপূর্ব্বে তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া আত্মহারা হইয়া ধ্যান করিতেন। একবার গঙ্গায় জোয়ার আসিয়া তাঁহার দেহ ভাসাইয়া লইয়া যায়, পরে জ্ঞান হইলে সাঁতরাইয়া ফিরিয়া আসেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহারই আদেশে গৃহবাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি গৃহেই থেকো, যেন তেন করে মোটা ভাত কাপড়ে চলে যাবে।"

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, "গৃহে কিরূপে থাকা যায়? পরের দুঃখ কষ্ট দেখে কিরূপে স্থির থাকা যায়?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "ওগো আমি বলছি, মাইরি বলছি,

ঘরে থাকলে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোকে অবাক হয়ে যাবে।" তিনি শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়কে প্রায়ই বলিতেন, "তোমার ত খুব উচ্চ অবস্থা।"

কাশীপুরে গলরোগে যখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন একদিন শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, "ওগো তুমি কিছু ঝাড়ফুঁক জান, দেখ যদি রোগ সারাতে পার, ডাক্তার কবিরাজেরা ত সব হার মেনে গেছে।" শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় নতমুখে চিন্তা করিলেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাংঘাতিক ব্যাধি নিজ দেহে মানসিক শক্তিবলে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। এই ভাবিয়া যেমনি শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় অগ্রসর হইবেন, অমনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তা তুমি রোগ সারাতে পার, তোমার শক্তি আছে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অসুখের সময়ে আমলকী খাইতে চাহিলে, শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় বাগানে বাগানে ঘুরিয়া আমলকী আনিয়া দেন অথচ তখন আমলকীর সময় নয়। তিনি লীলা সম্বরণ করিলে শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় কয়েক দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকেন, পরে লোকপরম্পরায় স্বামী বিবেকানন্দ ইহা শুনিতে পাইয়া অনেক বলিয়া কহিয়া কৌশলে উপবাস ভঙ্গ করান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "ফুল ফুটিলে মধুপান করিবার নিমিত্ত ভ্রমরকে ডাকিয়া আনিতে হয় না। ভ্রমর নিজেই আসিয়া মধুপান করে।" শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল এবং সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যান। তখন বেলুড় মঠ নির্ম্মিত হইতেছে। স্বামিজী তাঁহাকে বলেন, "দেখুন, এসব যে মঠ ফঠ হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে ?"

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি ? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "জহুরী না হলে জহর চেনা যায় না।" শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় কি ছিলেন তাহা স্বামিজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

স্বামিজী প্রায়ই বলিতেন—"পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম কিন্তু নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"

স্বামিজী স্বীয় বাগ্মিতায় পাশ্চাত্য জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "ওদেশে গিয়ে বেশী কিছু বলবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নাই, যে দেশ নাগ মহাশয়ের চন্দ্রালোকে আলোকিত তথায় গিয়া আমি আর বেশী কি বল্‌বো।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ন্যায় নিষ্ঠাবান কেহ কোন দিন দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজায় তিলমাত্র ব্যাতিক্রম হইলে তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইতেন। একবার শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় মধ্যাহ্নে ঠাকুরের শয়ন হইবার পরে মঠে যান। শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের আহারাদি হয় নাই শুনিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া ঠাকুরকে শয়ন হইতে উঠাইয়া ভোগ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মঠের নিয়মের এইরূপ ব্যতিক্রম কোন রাজা মহারাজার অনুরোধেও করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা, তাঁহার পিতৃদেবকে গঙ্গা আনিয়া দেখান, ঘটনাটি এইরূপ হইয়াছিল। একবার শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় অর্দ্ধোদয় যোগের পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে বাড়ী যান। তাঁহাকে এই সময়ে বাড়ী আসিতে দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, "কতলোকে এই সময়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গঙ্গা স্নান করিবার জন্য কলিকাতা যাইতেছে, আর তুই কিনা গঙ্গা তীর হইতে বাড়ী চলিয়া আসিলি।"

তিনি ইহাতে উত্তর করেন, "মনে যদি যথার্থ অনুরাগ থাকে, তবে আর তাহাকে কোথাও যাইতে হয় না। মা ভাগীরথী নিজগুণে তাহার গৃহে আসিয়া কৃতার্থ করেন। পরে যোগের সময় সত্যই বাড়ীর অগ্নিকোণ ভেদ করিয়া কল্ কল নাদে জল উঠিয়াছিল। শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়, তাঁহার ভগ্নী, সহধর্ম্মিণী সকলেই উহাতে স্নান করেন। পরে জল সমস্ত বাড়ী প্লাবিত করিবার উপক্রম হইলে, লোকে জানিতে পারিবে বলিয়া

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় "জয় গঙ্গে" বলিয়া হাত চাপা দিলেন, অমনি গঙ্গা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনা শ্রবণে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"তার আর আশ্চর্য্য কি? তিনি সিদ্ধসংকল্প মহাপুরুষ, ইহাতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য মনে করি না। ইঁহাদের অমোঘ ইচ্ছা শক্তি বলে জীব উদ্ধার পাইয়া যাইতে পারে।"

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় "তৃণাদপি সুনীচেন" ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন, "এরই ঠিক ঠিক দীনভাব।" কিন্তু তিনি প্রয়োজন হইলে সিংহের চাইতে বেশী তেজীয়ান হইতে পারিতেন। একবার এক ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিন্দা করাতে তাহাকে জুতা দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। এক সাহেব তাঁহার গ্রামে পক্ষী শিকার করিতে গেলে তাহার হস্ত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় গার্হস্থ্য আশ্রমের আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার অতিথি সংকারের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতিথি অভ্যাগতদের স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আদর যত্ন করিতেন। বারমাসে তের পার্ব্বণ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা, শ্রীশ্রীকালী পূজা, সব পূজাই করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে সচ্চিদানন্দময়ী মা বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সতত ইষ্টচিন্তা করিতেন। এক ব্যক্তির তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইয়া মনে হইয়াছিল—"সাধুর আবার স্ত্রী কেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "দোষ কি? মা অন্নপূর্ণা রান্না করিয়া খাওয়াইতেছেন।"

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় কি ছিলেন তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করা কঠিন। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র 'সাধু নাগ মহাশয়' ও 'শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়' গ্রন্থদ্বয়ে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ সকলেই শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের জন্মস্থান দেখিবার নিমিত্ত দেওভোগ গ্রামে গিয়াছিলেন।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র

সংস্কৃত সঙ্গীত-বিদ্যার লেখক, গ্রন্থ ও তারিখ

	গ্রন্থ	লেখক	তারিখ
১।	নাট্যশাস্ত্র	ভরত	খৃষ্টীয় প্রথম সপ্ত শতাব্দীর মধ্যে ; পঞ্চম শতাব্দীতে বলিয়া মনে করিবার কিছু সম্ভাবনা দেখা যায়।
২।	সঙ্গীত রত্নাকর	সার্ঙ্গদেব	১২১০—১২৪৭ খৃঃ অঃ।
৩।	সঙ্গীতোপনিষদ্	সুধাকলস	১৩২৪ খৃঃ অঃ।
৪।	সঙ্গীতোপনিষদ্-সার		
৫।	রসিকপ্রিয়	রাণা কুম্ভকর্ণ মহিমেন্দ্র	১৪৫০ খৃঃ অঃ।
৬।	সঙ্গীত-মীমাংসা		
৭।	সঙ্গীত-রাজ		
৮।	সঙ্গীত রত্নাকর টীকা	কালীনাথ	১৪৬০ (বা ১৫৮০)।
৯।	সঙ্গীতসার	হরিনায়ক (?)	১৫০০ (বা পূর্ব্বে)।
১০।	আনন্দ-সঞ্জীবন	মদনপাল দেব	১৫২৮ খৃঃ অঃ।
১১।	রাগমালা	ক্ষেমকর্ণ	১৫৭০ খৃঃ অঃ।
১২।	স্বর-মেল-কলানিধি	তিমমত্য	ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ।
১৩।	সঙ্গীত রত্নাকর	ভানুরাকা	
১৪।	নর্ত্তন-নির্ণয়	পন্দরিকবিত্তল	
১৫।	রাগমঞ্জরী		
১৬।	শীঘ্রবোধিনী-নামমালা		
১৭।	সদ্রাগ-চন্দ্রোদয়		
১৮।	রাগ-মালা		
১৯।	সঙ্গীতাবর্ত্ত রত্নাকর		

২০।	রাগবিবোধ	সোমনাথ	১৬০৯ খৃঃ অঃ।
২১।	হার্দ্দিয় প্রকাশ	হার্দ্দিয় নারায়ণ	সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ।
২২।	সঙ্গীতানুপঙ্কুশ	ভবভট্ট	১৬৪০ খৃঃ অঃ।
২৩।	সঙ্গীত-দর্পণ	দামোদর মিশ্র	১৫৬০—১৬৪৭ খৃঃ অঃ।
২৪।	সঙ্গীতসার-সংগ্রহ	রাজা জগজ্জোতির্মল্ল	১৬৫০ খৃঃ অঃ।
২৫।	সঙ্গীত-ভাস্কর	রাজা জগজ্জোতির্মল্ল	১৬৫০ খৃঃ অঃ।
২৬।	অনুপসঙ্গীত বিলাস	ভবভট্ট	১৬৮০ খৃঃ অঃ।
২৭।	মুরলী-প্রকাশ	ভবভট্ট	১৬৮০ খৃঃ অঃ।
২৮।	নষ্টোদ্দিষ্ট প্রবোধক ধ্রোপদ টীকা	ভবভট্ট	১৬৮০ খৃঃ অঃ।
২৯।	সঙ্গীত মকরন্দ	বেদ	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ।
৩০।	সঙ্গীত দামোদর	শুভঙ্কর	সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগ।
৩১।	সঙ্গীত নারায়ণ	পুরুষোত্তম মিশ্র	১৭৩০ খৃঃ অঃ অথবা পূর্ব্বে।
৩২।	সঙ্গীত নারায়ণ	নারায়ণ দেব	১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে।
৩৩।	সঙ্গীত-পারিজাত	অহোবালা পণ্ডিত	অষ্টাদশ শতাব্দী।
৩৪।	সঙ্গীত সারামৃত	রাজা তুলাজী	১৭৭০ খৃঃ অঃ।

ইহা ব্যতীত আরও ৩৮টি গ্রন্থ আছে; ইহাদের লেখকের নাম ও হস্তলিপির স্থান জানা আছে, কিন্তু তারিখ জানা নাই; আরও ১৪টি আছে—ইহাদের মাত্র লেখকের নাম জানা আছে; ১৭টি আছে—ইহাদের মাত্র হস্তলিপির স্থান জানা আছে। অতএব গ্রন্থের মোট সংখ্যা— ৩৪ + ৩৮ + ১৪ + ১৭ = ১০৩।

The music of Hindostan—A. H. Fox Stangways

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের জন্মোৎসব

আগামী ১১ ভাদ্র, রবিবার, শুক্লাপ্রতিপদ তিথি, পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্র, সিংহরাশিতে, শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের জন্মতিথি পূজা এবং আগামী ১৮ই ভাদ্র, (ইংরাজী ৪ঠা সেপ্টেম্বর) রবিবার, শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের দ্বি-অশীতিতম জন্মোৎসব, কলিকাতায়, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ মিত্রের ৫।১এ নং পাঁচুখানসামা লেন, শিয়ালদহস্থিত বাটীতে অনুষ্ঠিত হইবে।



স্বামী সারদানন্দ

মহাসমাধি

'ভারতে শক্তিপূজা'র সিদ্ধ মহাপুরুষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের অন্যতম প্রধান গঠনকর্ত্তা ও পালয়িতা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-বেদ রচয়িতা, শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ ও লীলাসহচর, আশ্রিতবৎসল, আর্ত্তত্রাতা, মহাপ্রাণ, আচার্য্যবর শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ এ যুগের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বিগত ১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ২—৩০ মিনিটের সময় মহাসমাধি-যোগে স্বস্বরূপে মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার স্থূল শরীরের এই অপ্রকাশ—'সংঘের', ভারতের, শুধু তাহাই নহে—সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের এক বিরাট অংশকে শূন্য করিয়া দিয়াছে। এই শূন্যস্থান ততদিন শূন্যই থাকিবে, যতদিন না তিনি আবার আসিয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবেন।

স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি শরচ্চন্দ্রকে (স্বামী সারদানন্দ) ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পৌষ-শুক্লা-ষষ্ঠী তিথিতে পাইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম নীলমণি দেবী। কলিকাতা মহানগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি ভারতবর্ষ পবিত্র করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান হ্যারিসন রোড ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলই এই মহাপুরুষের জন্মস্থান। বাল্যকালে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ এলবার্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার খুল্লতাত পুত্র পূজ্যপাদ শশী মহারাজও (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ঐ স্কুলে পড়িতেন। তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণের প্রতিষ্ঠিত একটি সমিতি ছিল। তাঁহারাও দুই ভাই ঐ সমিতির সভ্য ছিলেন। একবার সমিতির বার্ষিক আনন্দ-উৎসব উপলক্ষে বালকগণ দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানে গমন করেন।

বালক শরৎ মহারাজ ও শশী মহারাজ তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তারপর ১৮৮২ খৃঃ অব্দে যখন স্বামী সারদানন্দ সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে পড়িতেন তখন হইতেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিয়মিতরূপে যাতায়াত আরম্ভ করেন। ঐ সময় হইতেই তিনি ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এবং শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন। পরস্পরের এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে ও ভ্রাতৃপ্রেমে পরিণত হইয়া, শ্রীভগবানকে কেন্দ্র করিয়া যে মহাশক্তিশালী ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিল তাহা আজ দুর্লঙ্ঘ্য গিরি মরু সাগর কান্তার পার হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শক্তিসঞ্চার করিতে ছুটিয়াছে। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গলরোগে আক্রান্ত হইয়া কাশীপুর-বাগানে রোগশয্যায় শায়িত তখন স্বামী সারদানন্দ তাঁহার অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক, শ্রীভগবান স্থূল শরীর ত্যাগ করিলে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দ হইতে তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এবং কঠোর তপস্বী, দীর্ঘ দশ বৎসর সাধনান্তে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে স্বামী সারদানন্দ জগদ্ধিতায় পাশ্চাত্য কর্ম্মক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অনুগত সহকর্ম্মী, তারপর ভারতপ্রত্যাগত হইয়া স্বামিজী-নির্দ্দিষ্ট পথে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণের সহিত তিনিও বিন্দু বিন্দু শোণিতদানে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের পোষণকর্ত্তা। লোককল্যাণসাধনে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পুষ্টির জন্য, যখন তাঁহার শরীরের শেষ শোণিত বিন্দু নিঃশেষিত হইয়াছে তখন আমরা তাঁহাকে হারাইয়াছি।

লোকহিতায় এই মহাপুরুষের অখণ্ড অনবদ্য জীবনকে আমরা বহুরূপে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি তাঁহাকে উদ্বোধনের সম্পাদক এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ,' 'ভারতে শক্তিপূজা' 'Stray thoughts on the Literature and Religion of India' প্রভৃতির শক্তিমান লেখকরূপে, বক্তৃতামঞ্চে অপূর্ব্ব বক্তারূপে, সংঘের পরিচালকরূপে,

শাস্ত্রব্যাখ্যাতা আচার্য্যরূপে, জগজ্জননী শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর একনিষ্ঠ সেবক-রূপে, মাতৃজাতির সেবার জন্য 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে'র প্রতিষ্ঠাতা-রূপে, সুরজ্ঞ গায়করূপে, লোকগুরুগণের ভাব কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য শ্রীশ্রীমাতৃদেবী, আচার্য্যবর স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমাধিমন্দির নির্ম্মাতারূপে এবং সর্ব্বশেষ—সমষ্টি ও ব্যষ্টি মানবের মুক্তির জন্য সকলের অকৃত্রিম সখা, স্নেহময় পিতা, এবং উপদেষ্টা ধ্যানী ও জ্ঞানী গুরুরূপে। তাঁহার জীবনের এক একটি দিক, এক একটি ভাবের নিখুঁত সম্পূর্ণ ছবি। যে ভাব তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার জন্মজন্মান্তরের ঐকান্তিক সাধনা তাহা বিন্দুমাত্র অসম্পূর্ণ থাকিতে দেয় নাই। সেই বিভিন্নমুখী ভাব ও পূর্ণ সাধনা সহায়ে তিনি যুগাবতারের কার্য্য বহুবার সম্পাদন করিয়াছেন, এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি 'ঋষি' (যিশু) খৃষ্টের দলেও দেখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা মনে পড়িতেছে। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তখন স্বামী সারদানন্দের সহিত অল্পদিনমাত্র পরিচিত হইয়াছেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ উদ্বোধন কার্য্যালয়ে আসিয়া তাঁহার আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতেন এবং কথাবার্ত্তা শুনিতেন। একদিন কি জানি কি ভাবিয়া, ক্ষীরোদ বাবু বলিয়া ফেলিলেন,—মহারাজ, সেণ্ট পিটারের সহিত আপনার বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, * * * পূজনীয় শরৎ মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—রোমে সেণ্ট পিটারের ষ্ট্যাচু (statue) দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে একথা তিনি মঠেও বলিয়াছেন। এই যে ইঙ্গিত, ইহাই অন্যান্য সিদ্ধ সাধক হইতে যুগাবতারের পার্ষদগণের বিশেষ পার্থক্য। জন্ম-মরণের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সিদ্ধ পুরুষ চলিয়া যান, তিনি আর ফিরিয়া আসেন না। কিন্তু এই শ্রেণীর মহাপুরুষগণ জীব-দুঃখে কাতর হইয়া, মুক্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রীভগবানের সহিত স্বেচ্ছায় আগমন করেন এবং চিরজীবন জীবসেবায় কাটাইয়া যান। জীবের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াও কিন্তু, তাঁহারা মনে করেন না যে, কাহারও

উপকার তাঁহারা করিতেছেন, অন্যের সেবা করিবার অধিকার পাইয়া নিজেরা ধন্য হইতেছেন—ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর হইতে এপর্য্যন্ত বহু নর-নারীকে ধর্ম্মের ক্ষুরধার পথে চলিবার সহায়তা করিলেও, স্বামী সারদানন্দ নিজেকে কখনও 'গুরু' ভাবিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরই জগদ্‌গুরু। ইদানীং দীক্ষা দিবার জন্য প্রায়ই দ্বিপ্রহরাবধি তাঁহাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হইত। পরিণত বয়সে অসুস্থ দেহে, শরীরের উপর নিত্য এই-রূপ অত্যাচার হইলে শীঘ্রই উহা একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে—মনে করিয়া, আমাদের একজন তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন,—কিছুদিনের জন্য দীক্ষা দেওয়া বন্ধ রাখিলে কিংবা সংখ্যা কমাইয়া দিলে ভাল হয়, নতুবা আপনার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে। তাহাতে পূজ্যপাদ মহারাজ উত্তর করিয়াছিলেন,—কাহাকেও ভগবানের নাম শোনাইবার অধিকার হইতে আমায় বঞ্চিত করিও না। আমি যে অন্যকে ঠাকুরের নাম শোনাইতে পারি—ইহা আমারই পরম সৌভাগ্য। তাহাতে শরীর অসুস্থ হইল তো কি হইবে? স্বামী বিবেকানন্দ কর্ম্মযোগীর জন্য এই আদর্শই রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—অন্যের দুঃখ কষ্ট অপনোদন করিয়া ভাবিও না যে, তুমি তাহার কিছু উপকার করিলে, তাহার সেবা করিবার অধিকার পাইয়া নিজে ধন্য হইয়াছ—ইহাই মনে করিও। স্বামী সারদানন্দ এই আদর্শের জীবন্ত প্রতীক—এই সাধনার সিদ্ধ মহাপুরুষ। আদর্শ কর্ম্মযোগী হইলেও শক্তিসাধনাই ছিল তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় সাধনা। তাঁহার সমস্ত ভাব, সমস্ত প্রেরণা, জীবনের সমস্ত ঘটনা ইহাকে অবলম্বন করিয়াই সংঘটিত হইত। এই ভাবেরই পরিণতি 'ভারতে শক্তিপূজা'য় তিনি আংশিক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়া বিধৃত রহিয়াছে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার পরম রহস্য প্রকাশ করিতে গিয়া পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাব-তীয় নারীমূর্ত্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তকখানি ভক্তিপূর্ণ-

চিত্তে অর্পিত হইল।" "জগতের যাবতীয় নারীমূর্ত্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ প্রকাশ"—এই সত্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"হে বীর সাধক, তোমাকেই অধিকতর অবহিত থাকিতে হইবে। তোমাকেই ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া নারীপ্রতীকে জগচ্ছক্তিরূপিণী জগদম্বার পূজা করিতে হইবে। প্রবৃত্তির কুহকে ভুলিয়া তোমারই ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া পদস্খলিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। জানিও, ভারতের তন্ত্রকার তোমার জন্য নিশিপূজার বিধান করিয়া তোমাকে দিবাপেক্ষা নিশিতেই অধিকতর অবহিত থাকিতে সঙ্কেত করিতেছেন—কারণ হিংস্র শ্বাপদকুলের ন্যায় ভীষণ ইন্দ্রিয়গ্রাম নিশার তিমিরাবগুণ্ঠনেই নিঃশঙ্ক প্রসরণে সাহসী হইয়া উঠে। ভাবিও না, নিষ্কাম-ভাবে নারীপূজা তোমার ভাবাশ্রয়ে হইবার নহে। নিস্তেজ-ইন্দ্রিয়গ্রাম বৃদ্ধ দম্পতির শরীরসম্বন্ধ উঠিয়া যাইয়া পরস্পরের প্রতি ঘনীভূত প্রেমসম্বন্ধে অবস্থিত হইবার কথা একবার স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ, পুরুষের নিকট রমণী তখন সখীভাবে পরিণতা; অথবা রমণীতে এবং জননীতে তখন আর বিশেষ প্রভেদ কোথায়? কালধর্ম্মে তাহারা তখন যে অবস্থায় উপনীত, অবহিত থাকিয়া সাধনা সহায়ে সর্ব্বকাল নারীর সহিত তোমায় ঐ ভাবে অবস্থিত থাকিতে হইবে, তবেই তোমার ভাবসিদ্ধি উপস্থিত হইবে। বিপদ সমূহ, কিন্তু তজ্জন্য তোমাকে তোমার গুরূপদিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিতে বলিতে পারি না। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাহারও ভাব কখনও নষ্ট করেন নাই বা কাহাকেও তদ্রূপ করিতে শিক্ষা দেন নাই। অবহিত থাকিয়া, ত্যাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শুদ্ধ ভাবে উপাসনায় রত থাকিলে তুমিও কালে জগদম্বার দর্শনলাভে সিদ্ধকাম হইবে—গুরুভক্ত, শ্রদ্ধাবান, সাধক. এই কথা তোমাকেও তিনি বারবার বলিয়া অভয় দিয়াছেন। অতএব জগদ্‌গুরুর শ্রীপাদুকার ধ্যান করিয়া, তাঁহার ঐ অভয়বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অবহিত হইয়া শক্তিপূজায় অগ্রসর হও—ধন্য হও।"

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ নবীন ভারতকে শক্তিপূজায় আহ্বান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভোগলুব্ধ আধুনিকের ঐ পূজার সামর্থ্য কতটুকু তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। জানিতেন, ঐশী শক্তি সহায় না হইলে দুর্ব্বল ভারত শক্তিপূজা করিয়া কখনও শক্তিমান হইতে পারিবে না। তাই ঐশী শক্তিরই রূপান্তর গুরুশক্তির নিকট নবীন ভারতের জন্য আচার্য্যবর বারংবার প্রার্থনা করিয়াছেন,—"হে নিত্যমুক্ত আত্মারাম গুরো! তুমি আমাদের জ্ঞানচক্ষু সম্যক প্রস্ফুটিত কর। তোমাকে বারবার প্রণাম করি। তোমার কৃপায় প্রত্যেক ভারত-ভারতী নবীন আধ্যাত্মিক জীবনের দিব্যভাবের অমিত তেজে সম্যক উদ্বুদ্ধ হউক এবং শ্রদ্ধাসহকারে তোমার পূজা করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদানে সমর্থ হউক। হে শ্যামা, গুরুরূপিণি! পদাশ্রিত ভারতে নবযুগে নবশক্তি সঞ্চারিত কর; যাহাতে তোমার শ্রীমূর্ত্তির মহিমা প্রচারে সে চির কৃতার্থ হইতে পারে, অপরকেও তদ্রূপ করিতে পারে।"

নবীন ভারত গড়িবার জন্য স্বামী সারদানন্দ জগজ্জননী শ্যামার নিকট যেমন এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়াছেন, তেমনি পতিত ভারতে শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের স্থায়িত্ব-কল্পে আজীবন তিনি কঠোর কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি সাধারণ সকলের কর্ম্মপদ্ধতি হইতে পৃথক ছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। যাহাতে কর্ম্মীর অন্তর্নিহিত শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ হয়, এইজন্য কর্ম্মের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া দূর হইতে লক্ষ্য করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে সাহায্যের জন্য তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। ইহাই ছিল তাঁহার কর্ম্মের কৌশল। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর আর একটি জিনিসের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত—যেন তাহার ভাব নষ্ট না হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার শিষ্যগণকে বারংবার সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, "কাহারও ভাব নষ্ট করিও না,"—কর্ম্মীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য স্বামী

সারদানন্দ শ্রীগুরুর এই সতর্ক-বাণী কায়মনোবাক্যে মানিয়া চলিতেন। শরীর ত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বেও আমরা তাঁহাকে নিজমুখে বলিতে শুনিয়াছি,—"কোন organisation এ যোগদান করিয়াছে বলিয়া কি কাহারও ব্যক্তিগত কোন মতামত থাকিতে পারে না?—এ কি রকম কথা?" কিন্তু ইহাও তিনি চাহিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবানুযায়ী তাঁহাদের পদানুগ কর্ম্মিবৃন্দের মতামত গঠিত হউক, কারণ তাঁহারা যে-ভাব দিয়া গিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান যুগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক।

সংহতি শক্তির পুষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য স্বামী সারদানন্দ প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল যেমন 'মিশনে'র সম্পাদকতা করিয়াছেন, ব্যক্তিত্ব বিকাশ-কল্পে কর্ম্মী সাধক ভক্ত, বালক যুবক বৃদ্ধ—তিনি সকলেরই সহিত তেমনি নানা ভাবে অত্যন্ত অন্তরঙ্গের ন্যায় মিশিয়াছেন। কাহারও নিকট তিনি গুরু, পিতা, নেতা, আবার কাহার নিকট সখা, সমবেদক ও আশ্রয়-দাতা। প্রয়োজন হইলে তিরস্কার করিয়াছেন আবার ভালবাসিয়াছেন, যাহাকে সকলে ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে কোল দিয়াছেন। আশ্রিতের সকল বিপদ নিজ বিশাল বক্ষে অবিচল ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কত দিন কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত যে, ঐ বিশাল বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তথাপি উহা অচল, অটল ও অক্ষুব্ধ। মনে হইত—পর্ব্বত-শৃঙ্গেরও শক্তি ও ধৈর্য্যের সীমা আছে, অশনিপাতে তাহাও খসিয়া পড়ে, কিন্তু এই মহাপুরুষের শক্তি ও ধৈর্য্য অসীম; বজ্রের বহ্নিজ্বালাও বুঝি এই শান্ত শীতল বক্ষের স্পর্শে নিভিয়া যায়। কত দুঃখী, শোক-তাপগ্রস্ত নর-নারী যে, তাঁহার নিকট আসিয়া, তাঁহার কাছে ক্ষণকাল বসিয়া শান্তি পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সেদিনও তাঁহার শেষ অসুখের সময় জনৈকা সদ্য-স্বামিহারা স্ত্রীভক্ত নয়নজলে ভাসিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। আসিয়া, তাঁহাকে রোগশয্যায় শায়িত দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "একি ঠাকুর! এখানে আসিলাম একটু জুড়াইবার জন্য, আবার এখানে তুমি একি করিলে?"

শুধু তিনি কেন?—অনেককেই নানা অবস্থায় পড়িয়া নিরাশ্রয়

হইয়া এইরূপে কাঁদিতে হইবে ; অনেককেই তাঁহার চরণ-চিহ্ন নয়নজলে চিরদিন সিক্ত করিতে হইবে। সকলের জন্য তাঁহার কল্যাণচিন্তা, যাহা সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত, তাহা আজও নিশ্চিত আমাদিগকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার ভক্ত ও প্রিয়জনের মন তাহাতে প্রবোধ মানিবে-না, উহার চিন্তা তাহাদের অশ্রুর পরিমাণ হ্রাস না করিয়া, বৃদ্ধিই করিবে। তাঁহার মহাসমাধির দিন, অসংখ্য সাধু, ভক্ত ও নর-নারীর ক্ষত বিক্ষত হৃদয় হইতে যে-রুদ্ধ-ক্রন্দন নিষেধ না মানিয়া, ধারায়-ধারায় বাহির হইয়াছে তাহা চিরদিন অবিচ্ছিন্ন ভাবেই ঝরিতে থাকুক্, কারণ তাঁহার বিরহব্যাকুল নয়নাশ্রু আমাদের অন্তরের আবিলতা বিধৌত করিয়া, একদিন তাঁহারই নিকট আমাদের লইয়া যাইবে। কেন না, আমাদের আচার্য্যবরের 'স্তব্ধীভূত বাসনাজাল', 'স্তিমিত-সলিলরাশি—প্রখ্যানাখ্যাবিহীন', 'বিগতভেদাভেদ শমিতসর্ব্বনামরূপ' বর্ত্তমান যে নিত্য অবস্থা তাহাই যে তাঁহার সকল ভক্তের, সকল শিষ্যের এবং সকল সন্তানের একমাত্র গতি—একমাত্র মুক্তির স্থল।

কথাপ্রসঙ্গে

আশ্বিনের আহ্বান

মূকেরও ভাষা আছে, যে জানে—সে তাহার কথা শুনিতে পায়। মূক-বালিকার মনের কথা তাহার জননী বুঝিতে পারে, মূক পরাণিয়ার চোখের ভাষা তাহার হৃদয়-দেবতার কানে কানে গুঞ্জন করিয়া সবই বলিয়া দেয়। মূক প্রকৃতির আভাস ইঙ্গিত, তেমনি কাহারো কাছে অতি সহজেই ধরা পড়ে।

উষার কপোলে শুকতারার আনন্দ-উজ্জ্বল দীপ্তি হইতে—শিশির-নিশীথে শেফালিকার গোপন-প্রস্ফুটন—যে কবি, যে ভাবুক অন্তরের আঁখি মেলিয়া দেখেন, তিনিই জানেন—আশ্বিন আমাদের দ্বারে আসিয়া কি কথা বলিয়া যায়। প্রভাতের সবিতা, মেঘ-বলাকার শ্বেত পক্ষে তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্য, শিশির-ধোয়া লতাপাতার সজীবতা, শরৎ-সুন্দরীর কবরী-বন্ধনে ধানের গন্ধ, মাঠে মাঠে আলভাঙ্গা পথে কল কল জল-স্রোত, নদীর তীরে তীরে কাশ-বধূর রূপের তুফান, সারাদিন মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুৎ-বহ্নি, কখন ঝরঝর বারিপাত, কখন কেয়াবনে আলো-ছায়া, সুকুমারী কমলিনীর নির্ম্মল হাসি, সন্ধ্যার অন্ধকারে সহস্র জোনা-কীর দীপালী-উৎসব,—বলিতে পার ইহারা বর্ষে বর্ষে এমনি সময়ে আসিয়া কিসের ইঙ্গিত তোমায় করিয়া যায়? গ্রীষ্মের মরু, বর্ষার সাগর পার হইয়া, শরৎ বারে বারে তোমার দ্বারে কাহাকে ডাকিয়া আনে? বিষাদ যেখানে ছায়া ফেলে না, বুদ্ধি বিচারাতিশয্যে যাহার স্বচ্ছন্দ গতিপথে কণ্টক বিছাইয়া দেয় না, অভাব অনাটন দুঃখ শোক বলিয়া যেখানে কোন জিনিস নাই, যেখানে নিষ্ফলতার অভিযান ব্যর্থ হইয়া যায়, জীবনের জয়গানে মধ্যাহ্নগগন যখন মুখর হইয়া উঠে, সেই যৌবন-অমৃত-রসে আশ্বিন তোমার মনের রন্ধ্রগুলি পূর্ণ করিয়া দেয়।

আশ্বিন, প্রকৃতির যৌবন ডাকিয়া আনে। বৈশাখী প্রভাতে কমল-

বনে নবজন্ম লাভ করিয়া, বরষার অমৃত ধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, শরতের স্নিগ্ধ হাওয়ার পুলক স্পর্শে প্রথম তাহার যৌবন জাগিয়া ওঠে। ষোড়শীর ভুবনমোহিনী জননী-মূর্ত্তির প্রতিমা গড়িয়া তাই আমরা তখন পূজা করি। যিনি শক্তি ও কান্তিরূপে প্রতি জীব-হৃদয়ে অবতীর্ণা হইয়া বীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে তাহার মনপ্রাণ ভরিয়া দেন—ইহা তাঁহারই পূজা। নষ্টশক্তি হৃতবল শ্রীরামচন্দ্র এই শক্তিরই পূজা করিয়া, যৌবনের উৎসাহ ও আনন্দ হৃদয়ে জাগাইয়া, রাজলক্ষ্মী জানকীকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

স্থবির ভারতকে, আশ্বিন এই যৌবন-শক্তির পূজায় আহ্বান করিতেছে। জাতির যৌবন জাগাইয়া, অদম্য শক্তিকে সংযত করিয়া জীবনের পথে সুপরিচালনায়—তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ করতলগত, অন্যথা—মৃত্যু অনিবার্য্য। বিপথে চলিয়া এইরূপে সে বহুবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে, আবার ভুল বুঝিয়া, ফিরিয়া আসিয়া, নিজের ভিতর হইতেই তাহার যৌবন-শক্তিকে পুনরায় আহরণ করিয়া লইয়াছে। সেই যৌবন-রস নানা দিকে নানা ভাবে, নব নব আশীর্ব্বাদরূপে পৃথিবীর বুকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দেশ-বিদেশে সে তাহার সুশাসন, শিল্পকলা ও ধর্ম্মের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আবার কত দেশের কত বর্ব্বর জাতিকে এখানে টানিয়া আনিয়া, পরিপাক করিয়া তাহাদিগকে একেবারে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল; সেই অসংস্কৃত বর্ব্বর-শক্তি ভারতীয় শোণিতে শোধিত হইয়া ক্ষাত্রশক্তিরূপে বাহিরের পশু-শক্তিকে সেদিন পর্য্যন্ত প্রতিহত করিয়া আসিয়াছে। ইহাই ছিল তখনকার দিনের যুবক-ভারতের বিজয় অভিযান। তাহার সেই বিজয় অভিযানের রথচক্রে দুর্ব্বল জাতিনিচয়ের অস্থিমাংস চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় নাই, তাহার বিজয়োদ্ধত জয়োল্লাস কাহারো মনে ত্রাসের সঞ্চার করে নাই, তাহার উন্মুক্ত তরবারী কোন দেশের সভ্যতাকে শোণিত-স্রোতে ভাসাইয়া দেয় নাই; যৌবনের মাধুর্য্য লইয়া, সে দেশে দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সৌন্দর্য্যকে বিকীর্ণ করিয়াছিল। তাহার স্মৃতি-সৌরভ এখনও কত দেশের ভগ্নস্তূপে ও গিরিগুহায় গুমরিয়া মরিতেছে।

আশ্বিন, তুমি বরষে বরষে বারংবার জাতির হৃদয়ে এইরূপে যৌবন জাগাইয়া দাও, কিন্তু অচিরেই শৈত্যের বার্দ্ধক্যে তাহা শীর্ণ হইয়া যায়। এবার এমন মন্ত্র শুনাইয়া যাও, যাহা বার্দ্ধক্যের জীর্ণতা, স্থবিরত্বের পঙ্গুতা ও মৃত্যুর বিরাট শূন্যতাকে চিরদিনের মত নবীনের চাঞ্চল্য ও পূর্ণতায় ভরিয়া রাখে।

দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দর্শন-শাস্ত্রে চিন্তার স্বাতন্ত্র্য

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র-সমূহ বেদ প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের উপপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু মুখ্য ও গৌণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। দর্শনের মুখ্য সিদ্ধান্ত পরমর্ষিগণের স্বকপোলকল্পিত নহে কিন্তু শ্রুতি হইতেই সংগৃহীত।

এমন কি অবৈদিক চার্ব্বাক দর্শনের সিদ্ধান্ত পর্য্যন্তও বেদ হইতে সংগৃহীত। পরমর্ষিগণ মুখ্যতঃ শ্রৌত-সিদ্ধান্তের উপপাদন প্রদর্শন করিয়াছেন। দর্শন-প্রবক্তা আচার্য্যগণের অবলম্বিত উপায় বিভিন্ন হইলেও উপেয় শ্রৌত-সিদ্ধান্ত এক অভিন্ন সনাতন ও সত্য। সর্ব্বত্রই উপেয় সত্য, উপায় অসত্য। অসত্য উপায় অবলম্বন দ্বারা সত্য উপেয় বস্তুর অধিগতি সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। এই অসত্য উপায় বিষয়ে প্রবক্তা আচার্য্যগণের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদাই আছে। কিন্তু উপেয় সিদ্ধান্তের অন্যথা করণে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই। যাহা কল্পিত তাহা অন্যথা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। আর যাহা অকল্পিত-সত্য তাহা কালত্রয়েও অন্যথা ভাব

প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরম পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি স্বীয় বাক্যপদীয়গ্রন্থে ইহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"উপায়াঃ সর্ব্ব এবৈতে বালানামুপলালনাঃ।
অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে॥
উপেয়-প্রতিপত্ত্যর্থা উপায়া অব্যবস্থিতাঃ।"

পরম পূজ্যপাদ মণ্ডনমিশ্র এই ভর্তৃহরির উক্তি ভঙ্গ্যন্তরে বলিয়াছেন,—

"যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি।
সা সৈব প্রক্রিয়া সাধ্বী সা চ সর্ব্বাঽব্যবস্থিতা॥"

আর এই উক্তিরই অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্বীয় বুদ্ধি বৈভব অনুসারে উপেয়-প্রাপ্তির নানারূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সূত্রগ্রন্থ বিবরণে আচার্য্যগণের প্রবৃত্তি

অনাদি পূর্ব্বপক্ষাভাসরূপে অবস্থিত বাহ্য দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত নিরসন-পূর্ব্বক যথার্থ সিদ্ধান্ত স্থাপনের রীতি ভগবতী শ্রুতি নিজেই প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে :—

"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ ইতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

এই বাক্যে শ্রুতিই পূর্ব্বপক্ষরূপে শূন্যবাদ বা অসৎকারণবাদ উদ্ভাবন-পূর্ব্বক যুক্তিদ্বারা তাহার নিরাস করিয়া "সদ্বস্তুই জগতের উপাদান" এই সিদ্ধান্তের উপদেশ করিয়াছেন। এই অনাদিকাল-প্রবৃত্ত শ্রুতি-প্রদর্শিত আভাসীভূত পূর্ব্বপক্ষ-সমূহ যুক্ত্যাভাস ও উপপত্ত্যাভাস দ্বারা যখন যখন বিরুদ্ধবাদী পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উপোদ্বলিত হইয়াছে, তখনই সিদ্ধান্তবাদী বৈদিক আচার্য্যগণ স্ব স্ব দার্শনিক সিদ্ধান্তে যথার্থ যুক্তি ও উপপত্তিসমূহ উদ্ভাবিত ও বিবৃত করিয়া বৈদিক সিদ্ধান্তের সংরক্ষণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষাভাস-সমূহ উপোদ্বলিত হইলে বৈদিক পূর্ব্বাচার্য্যগণ অভিনব দর্শন-সূত্রের অবতারণাতে ব্যাপৃত না হইয়া পরমর্ষিগণ প্রদর্শিত যুক্তি ও উপপত্তির বিশদ বিবরণে যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা তাঁহাদের অল্পজ্ঞতার

পরিচয় নহে, প্রত্যুত আর্ষদর্শন-সমূহের সম্যক্ পরিজ্ঞানই তাহার কারণ। পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহা সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন যে, বৈদিক সিদ্ধান্তের পরমর্ষিগণ প্রদর্শিত উপপত্তি প্রকার যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে আর তাহাতে কোনও আপত্তি হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। যতক্ষণ সেই উপপত্তি প্রকার সমূহ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম না হইতেছে ততক্ষণই বিরুদ্ধবাদের সম্ভাবনা। এজন্য তাঁহারা পরমর্ষিগণ-প্রদর্শিত উপপত্তিসমূহ বিশদভাবে বুঝাইতেই প্রয়াস করিতেন। বৈদিক সিদ্ধান্তের অনববোধই পূর্ব্বপক্ষ উত্থানের একমাত্র কারণ, পরমর্ষিগণ হইতে পূর্ব্বাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত ইহা উত্তমরূপে অবগত ছিলেন।

আমাদের জ্ঞানের অল্পতা-প্রযুক্ত মনে হয় যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ বোধ হয় পরতন্ত্র-বুদ্ধি হইয়াই আর্ষসূত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, নূতন দর্শন-সূত্রের অবতারণা করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ নিপুণভাবে অবলোকন করিলে এরূপ অলীক আপত্তি আর হইতে পারে না পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিবরণ-শূন্য ছয়খানি দর্শন-সূত্রের পরিবর্ত্তে যদি সহস্রখানি দর্শন সূত্রগ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে আজ আমরা দর্শনের মূল দর্শন পর্য্যন্তও করিতে পারিতাম না। এইরূপ দর্শন-সূত্রগুলি এক বিচিত্র প্রহেলিকায় পর্য্যবসিত হইত। যেমন সপ্তম রসের বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থের কল্পনা অসম্ভব সেইরূপ অভিনব দর্শনের কল্পনাও অসম্ভব। বাগিন্দ্রিয়ের অষ্টস্থানাতিরিক্ত নবম দশম স্থান যেমন অসম্ভাবিত, অতিরিক্ত দর্শনের কল্পনাও সেইরূপই অসম্ভাবিত। প্রপানকাদিতে নানা রসের সংমিশ্রণ থাকিলেও তাহা যেমন সপ্তমরস নহে সেইরূপ বিভিন্ন আর্ষদর্শন শাস্ত্র হইতে কিছু কিছু অংশ আকর্ষণ করিয়া তাহাদের বিমিশ্রণে নূতন একটা কিছু হইলেও তাহা স্বতন্ত্র দর্শন-পদবাচ্য হইতে পারে না। দর্শন শাস্ত্রে যে প্রথম আকস্মিকবাদ, দ্বিতীয় সংঘাতবাদ, তৃতীয় আরম্ভবাদ, চতুর্থ পরিণামবাদ, পঞ্চম বিবর্ত্ত-বাদ, ও ষষ্ঠ অজাতবাদ নামে ছয়টি বাদ দেখিতে পাওয়া যায় এতদপেক্ষা একটা সপ্তমবাদ কল্পিত হইতে পারে না। এই ছয়টি বাদই দর্শন-শাস্ত্রের মূল গ্রন্থি। বিস্তার-ভয়ে এই আলোচনা হইতে বিরত

হইলাম। প্রসিদ্ধ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে যে ষোলটি দর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও পূর্ব্বোক্ত ছয়টি বাদেরই অন্তর্গত সংজ্ঞামাত্রের আধিক্য হইলেও বস্তুতঃ দর্শনের আধিক্য হয় নাই।

দর্শন-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও অধিকার

পরমর্ষিগণ হইতে পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত ভারত-জননীর ক্রোড়-লালিত শ্লাঘ্য সন্তানগণ যে রাজপথে বিচরণ করিয়া পূর্ণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন, সেই পবিত্রতম পথে পদ বিক্ষেপ করিয়া মোক্ষনগরীর গোপুর দ্বারে উপনীত হইতে অভিলাষী হইলে, স্বীয় নিরতিশয় কল্যাণ কামনা হৃদয়ে সমুদিত হইলে, পরমকল্যাণবিরোধী শাঠ্যকাপট্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া শ্রদ্ধা-নির্ম্মল হৃদয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরণ প্রান্তে আগত হইতে হইবে। ভুস্তর্ক ও দাম্ভিক্যের বশবর্ত্তী না হইয়া পরম কল্যাণ-কামনায় এই দর্শন-শাস্ত্র অধীত ও সেবিত হইলে শাস্ত্রের যথার্থ রহস্য উপলব্ধ হইতে পারিবে।

উচ্ছৃঙ্খলিত অশ্রদ্ধাকলঙ্কিত হৃদয় লইয়া এই দর্শন সিন্ধুমথিত করিলে, সিন্ধু হইতে অমৃত উত্থিত না হইয়া হলাহলই উত্থিত হইবে। মোক্ষ-নগরীর গোপুর দ্বারে উপনীত না হইয়া, আমরা অন্ধকূপে নিপতিত হইব। পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে দৃষ্টিতে পরমর্ষিগণকে ও তাঁহাদের কৃতিসমূহকে অবলোকন করিতেন, যেমন পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র ভগবান গোতমকে স্মরণ করিয়া তদুদ্দেশে প্রণিপাত করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

"নমামি ধর্ম্মবিজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যশালিনে।
নিধয়ে বাগ বিশুদ্ধীনামক্ষপাদায় তায়িনে ॥"

এক কথায় বলিতে গেলে শাস্ত্র শ্রবণের অধিকার নিরূপণ করিতে যাইয়া মহর্ষিগণ অধিকারীর যাদৃশ গুণ নিরূপণ করিয়াছেন সেই গুণাবলীর মধ্যে অন্ততঃ সংযম সহিষ্ণুতা অলোলুপতা প্রভৃতি গুণরাশি তেমনি এই শাস্ত্র-আলোচয়িতৃগণের থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

বড় অধিক দিনের কথা নহে, এই বঙ্গভূমির পশ্চিমভাগে বিহার-

প্রান্তে পূজ্যপাদ ভবনাথ মিশ্রের শ্লাঘনীয় সন্তান ন্যায়প্রস্থানের ব্যাখ্যাতা পূজ্যপাদ শঙ্কর মিশ্র শৈশবে একদিন স্বীয় সহচরগণের সহিত ক্রীড়া-নিরত ছিলেন। সেই সময় বেতিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূমিপতি সেই ক্রীড়াস্থানের সমীপ দেশ দিয়া যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ সেই ভূমিপতির দৃষ্টি শিশু শঙ্কর মিশ্রের উপরে পতিত হইয়াছিল। বেতিয়ার অধিপতি এই শিশুর বদনমণ্ডলে অলৌকিক প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করিয়া শিশু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, আদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার! তুমি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ কি?"

তখন শিশু শঙ্কর মিশ্র বিনয়-গর্ব্বিত বচনে উত্তর করিয়াছিলেন, "মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণসন্তান, বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি বৈ কি?" মহারাজ হৃষ্ট হইয়া শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক! আমাকে একটা শ্লোক শুনাইতে পার?" উত্তরে শঙ্কর বলিলেন, "নূতন শ্লোক শুনাইব কি পুরাতন?" রাজা বিস্মিত হইয়া শঙ্কর মিশ্রকে বলিলেন, "নূতন পুরাতন উভয়ই শুনাও।"

তখন শঙ্কর মিশ্র—

"চলিতশ্চকিতশ্ছন্নঃ প্রয়াণে তব ভূপতে।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥"

হে মহারাজ! অপনার যুদ্ধযাত্রা কালে চতুরঙ্গিনী সেনার সমাবেশে সহস্রশীর্ষা পুরুষ অনন্তদেব বিচলিত, সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় স্বর্গরাজ্যের আক্রমণ ভয়ে চকিত, এবং সেনাগণের পদবিক্ষেপে সমুত্থিত ধূলিরাশিদ্বারা সহস্রপাৎ সূর্য্যদেব সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। রাজা শিশু শঙ্কর মিশ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় শিবিরে লইয়া গিয়া শিশু শঙ্কর মিশ্রের যথেষ্ট সৎকার করিলেন রাজসৎকৃত হইয়া কুমার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, স্বীয় নিবাস কুটীরে তাঁহার মাতা রুগ্নপ্রায় হইয়া শায়িতা রহিয়াছেন। মাতার এই অবস্থা দর্শন করিয়া ব্যথিতচিত্তে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমার কি হইয়াছে?" মাতা সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "শরীর অসুস্থ।" মাতার অস্বাস্থ্যের কারণ জানিবার জন্য শঙ্কর নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে জননী নিতান্ত অনিচ্ছা-

সঙ্গে বলিলেন, "পুত্র! আজ তিন দিন হইল আমি আহার করি নাই তোমার পিতা অযাচিত-ব্রত, এজন্য তাঁহার অযাচী মিশ্রনামে প্রখ্যাতি হইয়াছে। আজ তিন দিনের মধ্যে অযাচিত বৃত্তিতে যাহা কিছু লব্ধ হইয়াছে, তাহা তোমাদের দুইজনের ক্ষুধানিবৃত্তিতেই নিঃশেষিত হইয়াছে। আমার আহার করিবার মত কিছু অবশিষ্ট ছিল না। এই দিনত্রয়ব্যাপী উপবাসে শরীর বড় দুর্ব্বল, সেইজন্য আমাকে রুগ্নের মত দেখাইতেছে।" মাতার এই অনশন ক্লেশের সংবাদ শ্রবণ করিয়া শঙ্কর মর্ম্মাহত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে মাতার ক্লেশ নিবারণ করিব? মনে মনে স্থির করিলেন, যে গুণজ্ঞ নরপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সৎকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে যাইয়া আমার অবস্থা নিবেদন করিব। এইরূপ স্থির করিয়া শঙ্কর সেই নরপতি সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং নিজের অবস্থা রাজসন্নিধানে কীর্ত্তন করিয়া তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। রাজা অতিমাত্র লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, আহার্য্য বস্তুরাশিতে শকট পূর্ণ করিয়া, এই শিশু শঙ্কর মিশ্রের আশ্রমে পাঠাইয়া দাও। রাজার আদেশ অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হইল; শকটপূর্ণ আহার্য্যবস্তু শঙ্কর মিশ্রের কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। শঙ্কর মাতৃসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, "মা! এই ত শকটপূর্ণ আহার্য্য-রাশি তোমার কুটীর দ্বারে আসিয়াছে, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই আহার্য্য বস্তু লইয়া ক্ষুধানিবৃত্তি কর।" জননী তখন সন্তানের আগ্রহে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "বৎস! যে দ্রব্যসম্ভার তুমি রাজ-সমীপ হইতে আনয়ন করিতেছ, তাহা আমার ক্ষুধানিবৃত্তির যোগ্য নহে। কারণ যে দিন তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে সেই দিন যে ধাত্রী তোমার নাড়ীচ্ছেদ করিয়াছিল, সেই সময় তাহাকে দিবার মত বস্তু আমার কিছুই ছিল না। তখন আমি ধাত্রীকে বলিয়াছিলাম,—ধাত্রি! আজ তোমাকে দিবার মত আমার কিছুই নাই, কিন্তু এই সন্তান যাহা প্রথম উপার্জ্জন করিবে তাহাই তোমার প্রাপ্য হইবে। এই বস্তুসম্ভার তোমার প্রথম উপার্জ্জন, আর ইহা ধর্ম্মতঃ সেই ধাত্রীরই প্রাপ্য, এজন্য এ সমস্ত বস্তু-সম্ভার ধাত্রীগৃহে প্রেরণ কর। মাতার আদেশ অনুসারে সমস্ত বস্তু বালক শঙ্কর ধাত্রীগৃহে পাঠাইয়া

দিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, আমি মাতার বড়ই অযোগ্য সন্তান। মাতার ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখে অন্ন প্রদান করিতে পারিলাম না। শঙ্কর বিমনায়মান হইয়া কুটীর-প্রান্তে বসিয়া রহিলেন, এদিকে রাজভৃত্যগণ যাহারা আহার্য্য সম্ভার লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজসন্নিধানে গমন করিলে রাজা তাহাদিগের নিকটে সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার প্রেরিত দ্রব্যসম্ভার শঙ্করের অভিলষিত পূরণ করিতে পারে নাই। রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ দ্রব্যসম্ভার শঙ্কর মিশ্রের গৃহে প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে আহার্য্য বস্তু শঙ্কর মিশ্রের কুটীরে প্রেরিত হইল। শঙ্কর মিশ্র মাতাকে বলিলেন, "মা! এবার তোমার আহার করিতে আপত্তি নাই, এখন তুমি আহার কর।" তখন শঙ্কর মিশ্রের জননী রন্ধনাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ভবনাথ মিশ্র ও শঙ্কর মিশ্রকে আহার করাইলেন এবং তৎপরে নিজেও আহার করিলেন। রাজসন্নিধান হইতে আহার্য্যরাশির আগমন-সংবাদ ভবনাথ মিশ্র কিছুই অবগত ছিলেন না, অবগত থাকিলে এই প্রার্থিত দ্রব্যসম্ভার ভবনাথ মিশ্রের কুটীরে আসিতে পারিত না।

আহার সমাপ্ত করিয়া ভবনাথ মিশ্র শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাশি লইয়া যথাপূর্ব্ব অভ্যাস অনুসারে শাস্ত্রচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু ভবনাথ মিশ্রের চিত্ত আর পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট হইতেছিল না। হৃদয়ে চিন্তার স্ফূর্ত্তি নাই, কি যেন গ্লানি অনুভব করিয়া ভবনাথ মিশ্র বড়ই ব্যথিত হইতেছিলেন; ভাবিতেছিলেন, কেন আজ এমন হইল, কোনও চিন্তার স্ফুরণ নাই, সর্ব্বাঙ্গে কেন এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইতেছে। শাস্ত্রে মনোনিবেশ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেদিন চিত্ত বড়ই চঞ্চল, কিছুতেই চিত্ত শাস্ত্রচিন্তায় উন্মুখ হইল না। অবশেষে ভবনাথ মিশ্র পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ চিত্তের গতি এমন হইল কেন? শরীরে আজ এত যন্ত্রণা বোধ হইতেছে কেন?" শুনিয়া পত্নী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, পরে মনে করিলেন হয় ত গুরুতর আহার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার এইরূপ হইয়া থাকিবে। এইরূপ মনে করিয়া রাজ-সন্নিধান হইতে প্রভূত আহার্য্য-রাশির আগমন সংবাদ স্বামি-

সন্নিধানে কীর্ত্তন করিলেন এবং বলিলেন—বোধ হয় অপরিমিত অধিক আহার করিয়াছেন বলিয়া এরূপ অস্বাস্থ্য বোধ করিতেছেন। ভবনাথ মিশ্র বিরক্ত হইয়া পত্নীকে বলিলেন, "আজ রাজ-সমীপ হইতে আহার্য্য আসিল কেন?" শাস্ত্রচিন্তা-নিমগ্ন-চিত্তে ভবনাথ মিশ্র আহার করিয়াছেন; কি আহার করিয়াছেন, প্রতি দিন এরূপ আহার করেন কিনা, এ বিষয়ে কোনও মনোযোগ করেন নাই। এজন্য আহারের গুরুত্বের কথা শুনিয়া ভবনাথ মিশ্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তখন ভবনাথ মিশ্রের পত্নী বিনীত ভাবে সমস্ত নিবেদন করিলেন। শঙ্কর রাজ-সন্নিধান হইতে এ সমস্ত সামগ্রী লইয়া আসিয়াছে জানিয়া অতিমাত্র বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া ভবনাথ মিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, শঙ্কর কি প্রার্থনা করিয়া এ সমস্ত সামগ্রী লইয়া আসিয়াছে। তখন শঙ্করকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! তুমি কি প্রার্থনা করিয়া রাজ-সন্নিধান হইতে এই সমস্ত সামগ্রী লইয়া আসিয়াছ?" শঙ্কর অবনত মস্তকে বিনীতভাবে বলিলেন, "হাঁ।" ভবনাথ মর্ম্মাহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" শঙ্কর তখন জননীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। ভবনাথ মিশ্র তখন মর্ম্মাহত হইয়া পুত্রকে ধিক্কার প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন, "কুলাঙ্গার পুত্র! তুমি অযাচিত ব্রতভঙ্গ করিয়াছ! তুমি সামান্য কারণে আজ যে ব্রত ভঙ্গ করিয়াছ, তাহা আমি শতবিপৎ-পাতেও কখনও ভঙ্গ করি নাই। এই ব্রত রক্ষা করিতে যাইয়া এমন কত দিন অনাহারে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সপ্তাহকাল-ব্যাপী দীর্ঘ উপবাসও কখনও করিতে হইয়াছে। আজ তুমি সামান্য কারণে এই ব্রতভঙ্গ করিলে, যাহা হউক আর আমি তোমাদের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করি না। আমি গঙ্গাতীর সমাশ্রয় করিতে চলিলাম।" —এই বলিয়া ভবনাথ মিশ্র একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া স্বীয়গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্লোকটি এই—

"অধীতমধ্যাপিতমর্জ্জিতং যশো ন শোচনীয়ং কিমপীহ ভূতলে।
অতঃপরং শ্রীভবনাথ-শর্ম্মণো মনো মনোহারিণি জাহ্নবীতটে॥"

এই ভবনাথ মিশ্রের মত একনিষ্ঠ, শাস্ত্রব্যসনী সংযমী অসংখ্যাত

পূর্ব্বাচার্য্যগণ শাস্ত্র-রহস্য উদ্‌ঘাটনে বদ্ধাদর হইয়াছিলেন। একাগ্র চিত্তেই এই শাস্ত্র রহস্য প্রতিভাত হইয়া থাকে। লোভ-ক্ষোভাদি দ্বারা ব্যাকুলিত চিত্ত লইয়া শাস্ত্র রহস্য পরিজ্ঞানের প্রয়াস বৃথা। মহাভাষ্য-কার ভগবান্ পতঞ্জলি পাণিনি-সূত্রের বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়া কোনও সূত্রের ব্যর্থতা শঙ্কাতে বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যস্তু দর্ভ-পবিত্র-পাণিঃ আসনোপবিষ্টঃ প্রাঙ্‌মুখঃ আবাস্তঃ-বদ্ধশিখঃ একাগ্রমনাঃ শাস্ত্রং প্রণিনায় তত্র একেনাপি বর্ণেন অনর্থকেন ন ভবিতুং যুক্তং কিংপুনরিয়তা সূত্র-সন্দর্ভেণ।"

আচার্য্য পাণিনির এই সুস্থিত একাগ্রভাব প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহাভাষ্যকার আবার বলিয়াছেন,—

"নহি সূত্রাণি কৃত্বা প্রতিনিবর্ত্তয়ন্ত্যাচার্য্যাঃ।"

এই সুসমাহিত চিত্তের উদগার-রূপ শাস্ত্র রাশিতে লোভাদি ব্যাকু-লিত জনের ন্যূনতা প্রদর্শন প্রয়াস সাহসিকতা মাত্র।

যে দার্শনিক চিন্তা এই ভারতের পরমসাংখ্য মজ্জাগত ধর্ম্ম ছিল সেই চিন্তা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লোপোন্মুখ হইয়াছে। কি উপায়ে এই চিন্তাধারা পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই শাস্ত্রালোচনায় প্রাচীন আদর্শ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে, স্বধর্ম্ম ও ত্যাগ-বুদ্ধিতে এই শাস্ত্র আলো-চিত না হইলে ভারতে শাস্ত্ররক্ষার দ্বিতীয় উপায় বোধ হয় আর নাই। এক সময় ভারতে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় এই ভারতীয় শাস্ত্ররক্ষার ভার লইয়াছিলেন, আজ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ও এই বিষয়ে উদাসীন। অর্থো-পার্জ্জনের সহায়রূপে এই শাস্ত্র আলোচিত হইয়া কখনও পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে না। এই দর্শন-শাস্ত্র মোক্ষ-শাস্ত্র; স্বধর্ম্ম-বুদ্ধিতে আলোচিত না হইলে ইহার পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। আজ আমাদের দুর্দ্দৈব গতিকে ও বর্ত্তমান সময়ের প্রতিকূলতায় স্বধর্ম্ম বোধে আদর করিবার সামর্থ্যও আমাদের ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি, যদি ভাবা যায় তাহা হইলে বোধ হয় ইহাই শেষ কথা যে, যাঁহারা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা যদি নিজে আদর্শ

হইয়া প্রকাশমান হন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া এখনও দুইচারিজন এই পথে অগ্রসর হইতে পারে। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়, তীর্থ-রক্ষক-সম্প্রদায় এবং পণ্ডিত-বংশধরগণ, যাঁহারা পূর্ব্বে শাস্ত্রালোচনায় নিরত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় আবার এই উৎসাহ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। অবশ্য বর্ত্তমানে যে শাস্ত্র-চর্চ্চার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে যে কিছুই অনুকূলতা করিতেছে না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইহাকে যথার্থ-রূপে ফলবতী করিতে হইলে যথেষ্ট সংস্কার প্রয়োজন। আর সে সংস্কার অর্থসাপেক্ষ। অধ্যেতা ও অধ্যাপয়িতৃগণকে ধন-মানাদি দ্বারা পরিপোষণ করা প্রধান কর্ত্তব্য। অনেকেই ইচ্ছাসত্ত্বেও দারিদ্র্য-বশতঃ শাস্ত্রালোচনায় পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন স্বধর্ম্ম-বুদ্ধিও দারিদ্র্য-প্রযুক্ত কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেশের ধনিবৃন্দ যদি এ বিষয়ে মনোযোগ করেন তবেই ইহার সুফল আশা করা যায়। ত্যাগী ও ধনী এই উভয় সম্প্রদায় অগ্রসর হইলেই সে আশা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে।

যাহা হউক এই দুর্দ্দিনে যাঁহারা দর্শন-শাস্ত্র আলোচনায় এই ক্ষীণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার স্মৃতিরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও এই লোপোন্মুখ শাস্ত্রালোচনার পুনরুজ্জীবনে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতেছেন সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নিকটে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা যে, এই দর্শন-শাস্ত্রের ক্ষীণ স্রোতকে প্রসারিত করিতে যাঁহারা প্রয়াসী তাঁহাদের সেই প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সাফল্য-মণ্ডিত হউক ইতি শম্।

যদত্র সৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তদ্‌গুরোরেব মে নহি।
যদত্রাসৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তন্মমৈব গুরোর্নহি॥

সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থোপাধিক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা
কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের বেদান্তাধ্যাপক

(সমাপ্ত)

ইউরোপে চার্চ্চিয়ানিটী

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বা 'ক্রিশ্চিয়ানিটী'কে (Christianity) অনেকে, 'চার্চ্চিয়ানিটী' (Churchianity) বা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সহিত একার্থবোধক মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুইটি জিনিসের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যিশুখৃষ্ট মানবসাধারণকে জাগতিক সর্ব্ববিধ অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে অমূল্য উপদেশ সমূহ দিয়া গিয়াছেন—খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বলিতে তাহাই বুঝায়, কিন্তু সেই ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও প্রচার করিবার জন্য যে প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহাই 'চার্চ্চিয়ানিটী'। 'চার্চ্চিয়ানিটী' বা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মহামণ্ডল না থাকিলে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র এরূপ প্রসার লাভ করিতে পারিত না।

'চার্চ্চিয়ানিটী'র সূত্রপাত

'চার্চ্চিয়ানিটী'র ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইলে রোমক-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রতন্ত্রের বিষয় মনে পড়িয়া যায়, কারণ, ইহার সহিত রোমক-সাম্রাজ্যতন্ত্রের গভীর সম্বন্ধ ছিল। রোমরাজ্য যখন ঐশ্বর্য্য ও শক্তির উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছে অর্থাৎ তাহার রাজ্যসীমা যখন সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিম-ইউরোপ ছাড়াইয়া, পশ্চিম-এসিয়ার অনেকাংশে ও উত্তর-আফ্রিকায় গিয়া ঠেকিয়াছে, তখন রোমক-রাজ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়। রোমক-সম্রাটগণ এই ধর্ম্ম সুনজরে দেখিতেন না। যাঁহারা ইহা প্রচার করিতেন এবং যাঁহারা এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন, তাঁহাদের উভয়কেই নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইত। কিন্তু এই নির্য্যাতনের ফলে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম রোমক-রাজ্যে দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিল। ইহা খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর কথা। তারপর চতুর্থ শতাব্দীতে রোমক-সম্রাটগণই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রাজ-সহায়ে ইহার প্রসারতা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল, শেষে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম রোম-সাম্রাজ্যেরই ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সময়ে ভারতবর্ষে অনেক নৃপতিও বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই

নানাবিধ সহায়তায় ইহা দেশ-দেশান্তরে অপূর্ব্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু রোমক-সম্রাটগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে আরো গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এবং তাঁহাদের প্রজাবর্গ, পারিবারিক জীবনে, সমাজে, শিক্ষা শিল্প ও রাষ্ট্রে ইহাকে এরূপ নিবিড় করিয়া ধরিয়াছিলেন যে, তখন 'রোমক' বলিলেই 'খৃষ্টান' এবং 'খৃষ্টান' বলিলেই 'রোমক' বুঝাইত; 'রোমক' ও 'খৃষ্টান' এই দুইটি শব্দ তখন একার্থবোধক হইয়া গিয়াছিল।

রোমকদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একজন সর্ব্বপ্রধান যাজক বা "বিশপ" নিযুক্ত হইতেন, বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার অধীনে অনেক সহকারী যাজক থাকিতেন, তাঁহাদিগকে বলা হইত—"আর্চ্চ-বিশপ"। প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে "বিশপ" ও "আর্চ্চ-বিশপ"গণ কোন স্থানে সমবেত হইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ হইবে, তাহা আলোচনা করিতেন। এইরূপে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ধীরে ধীরে শক্তিশালী সংহতি-শক্তিতে পরিণত হইল। এই সংহতি-শক্তি বা organisation—খৃষ্টীয় 'চার্চ্চ' বা 'চার্চ্চিয়ানিটী' নামে অভিহিত। রোমক-সম্রাটগণ যে রাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণও সেই নীতির আদর্শে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি গঠন করিয়া তাহারই উপর 'চার্চ্চিয়ানিটী'কে স্থাপন করিলেন।

রোমক-সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন সম্রাট, বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা বা গভর্ণরগণ সেই সেই প্রদেশ শাসন করিতেন, আবার তাঁহাদের অধীনস্থ নিম্নতর ও নিম্নতম রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে শাসনকার্য্যে তাঁহারা সহায়তা পাইতেন; তেমনি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সর্ব্বময় প্রভু ছিলেন একজন "বিশপ," তাঁহাকে "পিতা" বা "পোপ" বলা হইত। তাঁহার অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে সহকারী অধ্যক্ষ বা "আর্চ্চ-বিশপ" হইতে সাধারণ যাজকমণ্ডলী পর্য্যন্ত একটি ক্রম-পর্যায়ের সৃষ্টি হইল; তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের কেন্দ্রস্থল যেখানে, সেখান হইতে পোপ-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন।

এইরূপে চার্চ্চিয়ানিটী ধীরে ধীরে শৃঙ্খলিত ও শক্তিমান হইয়া উঠিলেও তখন পর্য্যন্ত ইহা রোম-সম্রাটের অধীন ছিল, অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে ইহাকে রোমক-রাষ্ট্রনীতির নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হইত। সেইজন্য 'চার্চ্চিয়ানিটী' তখনও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে নাই। তাহার পর রোম-সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মানজাতি প্রবল পরাক্রমে পশ্চিম-রোম-রাজ্যের উপর আসিয়া পড়িল; তরঙ্গের মত একের পর একটি করিয়া দল আসিয়া বিরাট রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া দিল। দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত এই আক্রমণের ফলে পশ্চিম-রোম-সাম্রাজ্য লোপ পাইল। তখনকার দিনের বর্ব্বর জার্ম্মান-জাতির প্রচণ্ড আঘাত সুসভ্য রোমীয়গণ সহ্য করিতে পারিল না। এই দুই তিন শত বৎসর রাজ্য বিপ্লবের সময়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য কোন রাজশক্তি ছিল না বলিয়া, নিজের প্রভুত্ব ও স্থায়িত্ব ইহা দৃঢ়ীভূত করিয়া লইল।

তদানীন্তন রোম-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অনেকটা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের তুল্য। রোম-সাম্রাজ্যের ন্যায় যখন ভারতবর্ষ সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে তখন মুসলমানগণ সীমান্তপ্রদেশে আসিয়া উপনীত হইল। লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিয়া একদল চলিয়া গেল, অন্য দল আসিল; তাহারা চলিয়া গেল, পুনরায় আর একদল আসিল। ক্রমে তাহারা সীমান্ত প্রদেশ হইতে মধ্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। সুসভ্য ভারতীয় নৃপতিগণ তাহাদের আক্রমণে বাধা দিয়াছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হন নাই। ধীরে ধীরে সমগ্র হিন্দুরাজা মুসলমানের পদানত হইল। পার্থক্য এই যে, মুসলমানগণ বহু শতাব্দী এদেশে বসবাস করিয়া আংশিক হিন্দুভাবাপন্ন হইলেও, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের ভিতর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য একেবারে লোপ করিয়া দেয় নাই, কিন্তু রোমক-বিজয়ী জার্ম্মানগণ তাহা দিয়াছিল। অধিকৃত পশ্চিম-রোম-সাম্রাজ্যে তাহারা বাস করিতে লাগিল। রোমক-রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি (খৃষ্টীয় ধর্ম্ম) শিল্প কলা শিক্ষা প্রভৃতি রোমীয় সভ্যতার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস তাহা অবলম্বন করিয়া অথবা রোমীয় সভ্যতায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়া, পূর্ব্বতন রোমবাসীদের সহিত তাহারা

একেবারে মিশিয়া গেল। সুতরাং প্রাচীন পশ্চিম-রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলেও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল না, কেননা বিজয়ী জার্ম্মানগণও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'চার্চ্চিয়ানিটী'র অধীন হইল।

জার্ম্মান বিজয়ের পর পশ্চিম-রোমক-সাম্রাজ্য হইতে পূর্ব্ব-রোমক-সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহার রাষ্ট্রীয় শাসন-কেন্দ্র ছিল গ্রীসের নিকট। তজ্জন্য ইহার অধিবাসিগণ অধিক মাত্রায় গ্রীক্‌ভাবাপন্ন হইল। ক্রমে পূর্ব্ব-রোমক সাম্রাজ্যের অপর নাম "গ্রীক্ সাম্রাজ্য" হওয়ায় এই অংশের 'চার্চ্চিয়ানিটী' ও "গ্রীকচার্চ্চ" নামে অভিহিত হইতে লাগিল। ইহার প্রধান অধ্যক্ষ, বিশপ বা পোপের নাম হইল "প্রেট্রিয়ার্ক" (Patriarch)। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যান্ত "গ্রীকচার্চ্চে"র প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল—পূর্ব্ব-রোমক-সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টি-নোপল। পরে তুর্কীগণ এই রাজ্য ও রাজধানী অধিকার করিয়া লইলে "গ্রীক্‌চার্চ্চের" কেন্দ্রস্থল রুষরাজ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ) চন্দ্রেশ্বরানন্দ

শংকর ও কণাদ

পরমাণুবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র, অ ২, পা ২, সূ ১৪ ॥

শংকরানন্দকৃত-দীপিকা।—অণূনাং প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে সর্গস্য নিবৃত্তি-স্বভাবত্বে প্রলয়স্যোভয়-স্বভাবত্বে কার্য্যস্য পূর্ব্বাপরকাল-বৈকল্পস্য-অনুভয়-স্বভাবত্বে নিমিত্তস্য নিত্যং সর্ব্বদা ভাবাৎ প্রলয়াদ্যভাবদোষঃ।

সূত্র-ব্যাখ্যা।—পরমাণু যদি প্রবৃত্তি-স্বভাব, বা নিবৃত্তি-স্বভাব অথবা অনুভয়-স্বভাব হয়, সকল পক্ষেই সৃষ্টি-প্রলয়ের ব্যাঘাত আপত্তি হইবে।

সংক্ষেপ-ভাষ্য-তাৎপর্য্য।—পরমাণু সকল কি স্বভাব? (১) প্রবৃত্তি-স্বভাব? (২) কি নিবৃত্তি-স্বভাব? (৩) কি উভয়-স্বভাব? বা (৪) কি অনুভয়-স্বভাব?

(১) প্রবৃত্তি-স্বভাব বলিলে নিত্য প্রবৃত্তি বা নিত্য সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু প্রলয় সিদ্ধ হয় না।

(২) নিবৃত্তি-স্বভাব বলিলেও সেইরূপ প্রলয় সিদ্ধ হয়, কিন্তু সৃষ্টি সিদ্ধ হয় না।

(৩) একাধারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়-স্বভাব থাকিতে পারে না।

(৪) নিঃস্বভাব বলিলে সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ই অসিদ্ধ হয়।

পূর্ব্ব-পক্ষ—নিঃস্বভাব হইলেও নিমিত্ত অর্থাৎ কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্ছা-বশতঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ঘটিতে ত পারে?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কিন্তু কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্ছা তোমাদের মতে সৃষ্টি সম্বন্ধে নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত, সুতরাং সে পক্ষেও নিত্য-প্রবৃত্তির (সৃষ্টির) ও নিত্য-নিবৃত্তির (প্রলয়ের) আপত্তি হইতে পারে অর্থাৎ নিমিত্ত যখন সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, তখন হয় সর্ব্বদা সৃষ্টি হোক আর না হয় সর্ব্বদা প্রলয় হোক।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি ঐ নিমিত্ত-ত্রয় অস্বতন্ত্র বা অনিত্য ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহাতে নিত্য অপ্রবৃত্তির আপত্তি হইবে অর্থাৎ নিমিত্ত সকল স্বাধীন নয় তখন সৃষ্টির প্রবৃত্তি তাহাতে না ও উঠিতে পারে।

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ॥ অ ২, পা ২, সূ ১৫॥

দীপিকা।—নিত্যাস্তু বিপর্যায়োঽনিত্যত্বং অণূনাং, কুতঃ, রূপাদি মত্ত্বাৎ, রূপাদিমতাং ঘটাদীনাং অনিত্যত্বদর্শনাৎ কর্ম্মব্যতিরিক্তস্য নিমিত্তস্য দুর্লভত্বং সমুচ্চিনোতি।

সূত্রব্যাখ্যা।—পরমাণুর রূপাদি স্বীকার থাকাতেই পরমাণুর পরমাণুত্ব ও নিত্যত্ব বিদূরিত হইয়াছে। কেননা, লোকমধ্যে রূপাদিবিশিষ্টের স্থূলতা ও অনিত্যতাই দেখা যায়।

ভাষ্যের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব-পক্ষ—চতুর্ব্বিধ পরমাণুর রূপরসাদি গুণ আছে। রূপাদিমান্ পরমাণু নিত্য এবং ভৌতিক পদার্থ সকলের উৎপাদক।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—এ কল্পনা অযুক্ত, কারণ রূপাদি আছে বলিলে, 'স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব' উপলব্ধ হয়। রূপাদিমানের স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব লোক মধ্যেও দৃষ্ট হয় যথা বস্ত্র সূত্র অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, সূত্র অংশু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বৈশেষিক মতে নিত্যের লক্ষণ—'কারণ-পরিশূন্য ভাব-পদার্থ নিত্য'—সদকারণবন্নিত্যং (বৈ, অ ৪। আ ১। সূ ১) এবং নিত্যের আর একটি লক্ষণ—'অনিত্য বলিতে বুঝিতে হইবে বিশেষ-প্রতিষেধের অভাব। বিশেষ কি না জন্য বস্তু, তাহার অভাব। অর্থাৎ নিত্য কি ?—না যাহা জন্য বস্তু নহে। অনিত্যমিতি চ বিশেষতঃ প্রতিষেধাভাবঃ বৈ, অ ৪। আ ১। সূ ৪)। প্রদর্শিত লৌকিক প্রকারে পরমাণুরও কারণ থাকা সিদ্ধ হয়। সেই হেতু আমরা বলি নিত্য পদার্থ পরমাণুরও কারণ ব্রহ্ম। পরমাণু যে ব্রহ্ম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য ইহা বৈশেষিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তাহা ছাড়া অণুর নিত্যত্ব রক্ষার জন্য তাঁহারা, অবিদ্যাচ (বৈ, অ ৪। আ ১। সূ ৬) নামক সূত্র রচনা করিয়াছেন। তাহার অর্থ দৃশ্যমান জগতের মূল কারণ অপ্রত্যক্ষ এই জন্য তাহার নাম অবিদ্যা।

পূর্ব্ব-পক্ষ—সেই অবিদ্যা অণু-নিত্যতার অন্যতম হেতু। কারণ দ্রব্যের নিত্যতার প্রতি অবয়বের বিভাগ অথবা বিনাশ এই দুই কারণ ব্যতীত তৃতীয় কারণ থাকা পক্ষে যে অসম্ভাবনা আছে, সেই অসম্ভাবনার নাম অবিদ্যা। (অর্থাৎ পরমাণু কোন কারণ দ্রব্য হইতে জন্মে নাই, সেই হেতু পরমাণুর অবয়ব বা অংশ নাই, সেই কারণে তাহার অবয়বের বিভাগও নাই, বিনাশও নাই, কাজেই তাহা নিত্য। অবিদ্যা=অজ্ঞান—না জানা। অর্থাৎ নাশ কারণ না জানা যাওয়াই নিত্যতার লক্ষণ। সূতার বিভাগে বস্ত্রের বিনাশ হইতে দেখা যায়। তাহাতে স্থির হয় যে, অবয়বের বিভাগ ও বিনাশ- এই দুই পদার্থই বিনাশের কারণ। ঐ দুই কারণ নিরবয়ব পরমাণু হইতে দূরে অবস্থিত, সেই কারণে পরমাণু নিত্য (অর্থাৎ অবিনাশী।)

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—'বহু অবয়ব সংযুক্ত হইয়া দ্রব্যান্তর জন্মায়'—ইহাই তোমাদের কথার তাৎপর্য্য। কিন্তু যদি বিশেষ-বর্জ্জিত (অজন্য) সামান্যাত্মক কারণের বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হওয়াকে আরম্ভ বলা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই ঘৃত-কাঠিন্য বিনাশের দৃষ্টান্তে ঘনীভূত অবস্থার বিনাশেও, বিনাশ হওয়া সঙ্গত হইতে পারে। অর্থাৎ কঠিন ঘৃতের পরমাণুর নাশ বা বিভাগ না হইয়াই গলিত ঘৃত হইতে পারে। ইহাতে কঠিন ঘৃতের অবস্থান্তর বা নাশ আমরা বলিতে পারি।

আর যদি অপ্রত্যক্ষ হওয়াই নিত্যতার কারণ হয়, তাহা হইলে দ্ব্যণুকও নিত্য হইত কারণ তাহা অপ্রত্যক্ষ।

উভয়থা চ দোষাৎ॥ অ ২। পা ২। সূ ১৬॥

দীপিকা।—সমান-পরিমাণত্বে বা যবীয়ানামপি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সম্ভাবো দোষঃ অসমান-পরিমাণত্বে হেতোরসিদ্ধিদোষঃ।

সূত্রার্থ।—পরমাণুর উপচয় (বৃদ্ধি) অপচয় (ক্ষয়) হওয়া স্বীকার থাকুক বা না থাকুক উভয় প্রকারেই দোষ হয়।

ভাষ্যের সংক্ষেপ-তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব-পক্ষ—পৃথিবী জল অপেক্ষা স্থূল। পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ চারিটি গুণ আছে, জলে রসাদি তিনটি গুণ। জল আবার তেজ অপেক্ষা স্থূল, কারণ তেজের দুইটি গুণ গন্ধ

ও স্পর্শ। তেজ বায়ু অপেক্ষা স্থূল, বায়ুর একটি গুণ স্পর্শ। এইরূপ গুণের উপচয় অপচয় দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—উক্ত উপচয় কি পরমাণুর গুণ? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে কি পার্থিব পরমাণুর গুণ জলীয় পরমাণুর গুণ অপেক্ষা অধিক? গুণের উপচয় অপচয় স্বীকার করিলে পরমাণুর পরমাণুত্ব থাকে না। গুণের উপচয় অপচয়ে মূর্ত্তিরও উপচয় অপচয় হয় অর্থাৎ পার্থিব পরমাণুকে গুণাধিক্য-হেতু স্থূল বলিতে গেলে তাহাকে অণু বা সূক্ষ্ম বলিতে পারা যায় না। যদি গুণের উপচয় অপচয় স্বীকার না কর তাহা হইলে পৃথিবীতেও তেজের গুণ প্রতীত হইতে পারে।

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা॥ অ ২। পা ২। সূ ১৭॥

দীপিকা:—ন পরিগ্রহোঽপরিগ্রহঃ সাংখ্যাদিবাদস্য সৎ-কার্য্যাদ্যংশে পরিগ্রহঃ সোঽপ্যস্য ন, তস্মাদত্যন্তমনপেক্ষা, শিষ্টৈঃ পরিগ্রহোঽণুমাত্রমপি ন ইত্যর্থঃ।

সূত্রার্থ।—কোনও ঋষি পরমাণু কারণবাদের কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। অতএব, শিষ্ট-বহির্ভূত বলিয়া পরমাণুবাদ বেদবাদীর অগ্রাহ্য।

ভাষ্য-তাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—মনু প্রভৃতি ঋষি বেদের সৎকার্য্য-বাদের পুষ্টির জন্য সাংখ্যের কোনও কোনও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু পরমাণু কারণবাদের কোন অংশই কোনও বৈদিক ঋষি গ্রহণ করেন নাই।

আবার দেখা যায়, বৈশেষিকেরা তাঁহাদের শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-রূপে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় (বৈ, ১ অ, ১ আ, ৪ সূ) এই ছয় পদার্থকে অত্যন্ত ভিন্ন বলেন এবং সে সকলের লক্ষণও দেখান। (দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং, সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।—ভাষাপরিচ্ছেদ।—নব্য-ন্যায় মতে উক্ত অভাব সপ্তম পদার্থ)। ঐ ছয় পদার্থ মনুষ্য, অশ্ব ও শশ প্রভৃতির ন্যায় পরস্পর ভিন্ন ও ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত। ঐরূপ স্বীকার সত্ত্বেও তাঁহারা যে স্বীকৃত বিরুদ্ধ গুণাদি-পঞ্চকের দ্রব্যাধীনতা স্বীকার করেন, তাহা কোনও ক্রমে উপপন্ন হয় না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—অনুপপন্ন কেন ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—বিবেচনা কর—ধব, কুশ, পলাশ প্রভৃতি যে কিছু অত্যন্ত ভিন্ন সৎ-পদার্থ, সমস্তই পরস্পর স্বাধীন, কেহ কাহারও অধীন নহে ; তেমনি অত্যন্ত ভিন্ন দ্রব্য, গুণাদি পদার্থ, অত্যন্ত ভিন্নতা প্রযুক্ত গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচটি কি করিয়া দ্রব্যের অধীন হইবে ? অথচ তাঁহারা, বলেন ছয়টি পদার্থ পরস্পর স্বাধীন কিন্তু গুণ, কর্ম্ম, সামান্য বিশেষ, ও সমবায় এ পাঁচটি পদার্থ দ্রব্য পদার্থের অধীন। এ কথা অসিদ্ধ।

পূর্ব্ব-পক্ষ—দ্রব্য থাকিলেই গুণাদি থাকে, না থাকিলে থাকে না, এই কারণে দ্রব্যই সংস্থানাদি (আকারাদি—modes) ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অভিধেয় ও জ্ঞেয় হয়, যেমন, একই দেবদত্ত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন নামের নামী হয়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—এরূপ বলিলে সাংখ্যসিদ্ধান্ত স্বীকার ও বৈশেষিকের নিজ সিদ্ধান্ত বিরোধ হইবে। যেমন সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন একই প্রধান আকারাদি ভেদে বহু হইয়াছেন।

পূর্ব্ব-পক্ষ—ধূম অগ্নি নহে, অগ্নি ভিন্ন কিন্তু ধূমের জ্ঞান অগ্নির অধীন—ইহা দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—দেখা যায় সত্য, কিন্তু ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হওয়ায় অগ্নি ধূমের ভিন্নতা নিশ্চিত আছে এস্থলে অর্থাৎ দ্রব্য ও গুণ পক্ষে সেরূপ ভিন্নতা দেখা যায় না। শুক্ল-কম্বল, লোহিত-ধেনু, নীল উৎপল প্রভৃতি দ্রব্য তাহাদের শুক্ল, লোহিত প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারাই প্রতীত হয়। দ্রব্য ও গুণ পৃথকরূপে কেহ কখনও দেখে নাই। ধূম ছাড়া অগ্নি যখন দেখা যায়, ধবলতা ছাড়া দুগ্ধ সেরূপ দেখা যায় না, সেইজন্য আমরা বলি গুণ দ্রব্যেরই রূপবিশেষ এবং যে যুক্তিতে গুণের দ্রব্যাত্মকতা প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ যুক্তিতেই কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের দ্রব্যাত্মকতা সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি অযুত-সিদ্ধতার বলে (অপৃথকরূপে উৎপন্ন, Co-existent) গুণের দ্রব্যাত্মকতা (দ্রব্যাধীনতা) প্রতীত হয়, দ্রব্য ও গুণ এক বলিয়া অনুভূত হয়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—অযুত-সিদ্ধতা কি ? দুই বিভিন্ন পদার্থ অপৃথকরূপে যে উৎপন্ন হয়, তাহা কি দেশে, না কালে, না স্বভাবে ?

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি অপৃথক দেশতাই অযুত-সিদ্ধতা ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা হইলে স্বমত বিরুদ্ধ হইবে। কেননা তাহা হইলে তোমাদিগকে বলিতে হয়, সূত্রের দেশই সূত্রারব্ধ বস্ত্রের দেশ, কেননা, সূত্রেই বস্ত্রের অবস্থিতি। সেইরূপ বস্ত্রের দেশই বস্ত্রের শুক্লাদি গুণের দেশ, শুধু সূত্রের দেশ নহে। কিন্তু সূত্রাকার কণাদ মহর্ষিও ইহার বিরুদ্ধে সূত্র রচনা করিয়াছেন—দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্ বৈ, অ ১, আ ১, সূ ১০ দ্রব্য-সমূহ দ্রব্যান্তরই জন্মায়। কখনও গুণান্তর জন্মাইতে পারে না। সেইরূপ গুণ-সমূহ গুণান্তরই জন্মায়, কখনই দ্রব্যান্তর জন্মাইতে পারে না। কারণ-দ্রব্য সূত্রদ্বারাই কার্য্য-দ্রব্য বস্ত্রের উৎপত্তি হয়। সূত্রস্থ শুক্লাদিগুণ কার্য্য-দ্রব্য বস্ত্রে স্বসমান-জাতীয় শুক্লাদি গুণ জন্মাইয়া থাকে। এবং দ্রব্য ও গুণ যখন পৃথক পদার্থ এবং দ্রব্যান্তর ও গুণান্তর জন্মায় তখন তাহাদের একদেশতা সিদ্ধ হয় না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি অপৃথক কালই অযুত-সিদ্ধতা ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা বলিতে পার না। কারণ তাহা হইলে পশুর বাম-দক্ষিণ শৃঙ্গদ্বয়ের অযুতসিদ্ধতা মানিতে হইবে, কিন্তু তাহা মানা যায় না। শৃঙ্গদ্বয় এককাল-প্রভব হইলেও তাহা পৃথক—অপৃথক প্রতীতির বিষয় নহে।

পূর্ব্ব পক্ষ—অপৃথক স্বভাবত্বই অযুত-সিদ্ধত্ব।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা হইলে তোমাদের প্রতিবাদিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। কেননা তাহা হইলে দ্রব্যের ও গুণের স্বরূপতঃ ভেদ অসম্ভব। দ্রব্য ও গুণ স্বভাবতঃই যদি অপৃথক হয় তাহা হইলে গুণকে দ্রব্যের সহিত অভেদরূপে প্রতীয়মান হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ গুণাদি-পদার্থ দ্রব্য-পদার্থ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, এ সিদ্ধান্ত অনুভব-বিরুদ্ধ।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যুতসিদ্ধ (পৃথকরূপে উৎপন্ন) পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম সংযোগ ও অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম সমবায়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—এ সিদ্ধান্তও ঠিক নয়। কেননা উভয় পদার্থের অথবা অন্যতর পদার্থের মধ্যে কাহার অযুতসিদ্ধতা?—কার্য্যের পূর্ব্বে কারণের সিদ্ধতা থাকায় উভয়ের অযুত-সিদ্ধতা পক্ষ আদৌ উপপন্ন হয় না। এবং অন্য পক্ষও সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ কারণের সহিত অযুত-সিদ্ধ কার্য্যের যে সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধের নাম সমবায়; এইরূপ অন্যতর ঘটিত অঙ্গীকারেও অনিবার্য্য দোষ আছে। কারণ পৃথক সিদ্ধ, কিন্তু কার্য্য অপৃথক সিদ্ধ, এ কথা সম্বন্ধ-নির্ব্বাচনের যোগ্য নহে। যে ক্ষণে কার্য্য দ্রব্য অসিদ্ধ ছিল অর্থাৎ স্বরূপ লাভ করে নাই সে ক্ষণে সে কিরূপে কারণের সহিত সম্বদ্ধ হইবে? সম্বন্ধ যখন উভয়ের অধীন—তখন তাহা কিরূপে একের নিঃস্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ না থাকা অবস্থায় ঘটিতে পারে? প্রথম ক্ষণে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ স্বরূপ নিষ্পত্তি হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহা কারণ দ্রব্যের সহিত সম্বদ্ধ হয়, এরূপ বলিলে তাহা সংযোগই হইল, সমবায় হইল কৈ? নিষ্পন্ন পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধের নাম সংযোগ, এই সংযোগ সম্বন্ধই প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইতেছে। সম্বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কার্য্য দ্রব্যের নিষ্পন্নতা স্বীকার করিলেই অযুতসিদ্ধতার অভাব স্বীকার করিতে হইবে এবং করিলে বৈশেষিকের 'যুতসিদ্ধি না থাকায় কার্য্য কারণের সংযোগ বিভাগ নাই' এই উক্তিও ঠিক হইবে না।

পূর্ব্ব পক্ষ—যদি বলি, দ্রব্য উৎপত্তি-ক্ষণে নিষ্ক্রিয় থাকে, সে অবস্থায় সংযোগ-সম্বন্ধ ঘটে না, সংযোগের কারণ ক্রিয়া সুতরাং নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তিরূপ সংযোগ ঘটে না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে কার্য্য-দ্রব্য সকল উৎপত্তি-ক্ষণে নিষ্ক্রিয় থাকিলেও তোমাদের মতে যেরূপে আকাশাদি বিভু-দ্রব্যের সহিত তাহার সংযোগ-সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, আমাদের মতে সেইরূপেই কারণ-দ্রব্যের সহিত কার্য্যের সংযোগ-সম্বন্ধ হয়, সমবায় নামক পৃথক সম্বন্ধ হয় না। ফলে, সংযোগই বল, আর সমবায়ই বল, কোনও সম্বন্ধ সম্বন্ধী হইতে পৃথক বা অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সম্বন্ধী ব্যতিরেকে সম্বন্ধের অস্তিত্ব পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। সম্বন্ধীর সত্তাতেই সম্বন্ধের সত্তা, সম্বন্ধের আর পৃথক সত্তা নাই।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যাহার সহিত সম্বন্ধ সে সম্বন্ধী। সংযোগ ও সমবায়ের বোধক শব্দ ও জ্ঞান পৃথকরূপে থাকিতে দেখা যায়; সুতরাং সংযোগের ও সমবায়ের পৃথগস্তিত্ব অবশ্যই আছে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—না, তাহাও বলিতে পার না। বস্তু এক হইলেও—অপৃথক হইলেও স্বরূপ ও বাহ্য রূপ (সম্বন্ধানুযায়ী রূপ) অনুসারে তাহাতে নানা শব্দের ও নানা জ্ঞানের ব্যবহার হয়। শব্দ ও জ্ঞান নানা হইলেই যে বস্তুরূপ নানা হয়, এমন কিছু হইতে পারে না। দেবদত্ত এক কিন্তু তাঁহাকে স্বরূপ ও সম্বন্ধিরূপ অনুসারে মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয়, বদান্য, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদি নানা শব্দের ও নানা জ্ঞানের বিষয় হইতে দেখা যায়। রেখা বস্তুও এক; কিন্তু তাহা স্থান ও সন্নিবেশ বশতঃ ১, ১০, ১০০, ১০০০ আদি বহু শব্দের ও জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। অতএব সম্বন্ধী পদার্থ সকল তদ্বোধক শব্দ-প্রত্যয় (জ্ঞান) ব্যতীত অব্যতিরেকে সংযোগ সমবায়-শব্দ-প্রত্যয়ের যোগ্য হয়, ব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বরূপে হয় না। অর্থাৎ উপলব্ধি-লক্ষণ-প্রাপ্ত পদার্থান্তরের অভাব অনুপলব্ধি-বশতঃই নিশ্চিতই হয়। তাৎপর্য্য এই যে, নাম আছে ও জ্ঞান হয়, ইহা দেখিয়া তোমরা সংযোগকে ও সমবায়কে স্বতন্ত্র বল, কিন্তু তাহা ভ্রম। উক্ত উভয়ের স্বাতন্ত্র্য কোনও প্রমাণে উপলব্ধ হয় না অর্থাৎ তাহা সম্বন্ধি-পদার্থের অতিরিক্ত নহে। যে হেতু সম্বন্ধি-পদার্থ ছাড়িয়া উপলব্ধ হয় না, সেই হেতু তাহার নাস্তিত্বই নিশ্চিত। অঙ্গুলি-সংযোগ কি?—অঙ্গুলি-সংযোগ অঙ্গুলিদ্বয়ের নৈরন্তর্য্য (অব্যবধান) ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সমবায়ের ত কথাই নাই। সমবায় এ পর্য্যন্ত কাহারও গোচরে আইসে নাই। সম্বন্ধ-বাচক শব্দ ও সম্বন্ধ ইত্যাকার জ্ঞান সম্বন্ধীকেই বিষয় করে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—তদুভয়ের সান্তত্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদে বা নিরন্তরিতরূপে সম্বন্ধবুদ্ধি যখন হইতেছে তখন সম্বন্ধ ও সম্বন্ধীর পৃথক অস্তিত্ব কেন স্বীকার করিবে না?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—না তাহা হইতে পারে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কেন ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা বলিয়াছি, স্বরূপ ও বাহ্যরূপ অনুসারেই ঐ ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। নৈরন্তর্য্য অবস্থায় অঙ্গুলিদ্বয়ের ও রূপরূপীর সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়, স্বতঃ প্রতীয়মান হয় না। বস্তুদ্বয় থাকিলে সম্বন্ধ প্রতীয়মান, বস্তুদ্বয়ের অভাবে সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয় না।

তাহার পর দেখ, পরমাণু, আত্মা ও মন এ সকলের প্রদেশ নাই। প্রদেশ বা অবয়ব বা অংশ না থাকায় সংযোগ-সম্ভাবনাও নাই। প্রদেশবান্ দ্রব্যতেই অন্য প্রদেশবান দ্রব্যের সংযোগ হইতে দেখা যায়।

পূর্ব্ব-পক্ষ—প্রদেশ না থাকিলেও ঐ সকলের কল্পিত প্রদেশ স্বীকার করিব ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহাও বলিতে পার না, কেন না, কল্পনা করিলেই সে পদার্থ সিদ্ধ হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সবই কল্পনার দ্বারা সমাধান হইয়া যাইত।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যেগুলি দরকার সেইগুলির কল্পনার প্রয়োজন, অযথা কল্পনার প্রয়োজন নাই।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—বিরুদ্ধই হউক আর অবিরুদ্ধই হউক, এতগুলি পদার্থ কল্পনীয়, তাহার অধিক অকল্পনীয়, এমন কোনও নিয়ম নাই এবং নিয়মের কোনও কারণও নাই। কল্পনা নিজের অধীন, যত ইচ্ছা ততই করিতে পার। বৈশেষিক ছয় পদার্থের কল্পনা করিয়াছেন, তাহার উপরে আর কেহ অধিক পদার্থের কল্পনা করিবে না, অন্যে শত কিংবা সহস্র পদার্থের কল্পনা করিবে না, এ বিষয়ে নিবারণের কিছু মাত্রও হেতু নাই। কল্পনাকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না। কল্পনা করিলেই যদি পদার্থ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যাহার যাহার যে যে পদার্থে রুচি, তাহারা সেই সেই পদার্থের কল্পনা করুক ও তাহা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হউক। কোনও দয়ালু কল্পনা করিবেন জীবের দুঃখ-বহুল সংসার থাকিবে না, তাহাতে আবার আমোদ কি ? অতএব সংসার নিত্য বা সর্ব্বকাল থাকুক। অন্যে কল্পনা করিবে মুক্ত জীবও পুনঃ সংসারী হইবে। এই সকল বিরুদ্ধ কল্পনার নিবারণ করিবে কে ?

তাই আমরা বলি, নিরবয়ব দুই পরমাণু সংশ্লিষ্ট হইয়া সাবয়ব দ্ব্যণুক জন্মাইতে পারে না। যাহারা নিরবয়ব—তাহাদের সংশ্লেষ আকাশের সংশ্লেষের ন্যায় অনুপপন্ন। পৃথিব্যাদিতে কাষ্ঠে জতুসংশ্লেষের ন্যায় আকাশের সংশ্লেষ হয় না—কারণ আকাশ নিরবয়ব।

পূর্ব্ব-পক্ষ—ঐরূপ বিনা সমবায়ে কার্য্যকারণের আশ্রিতাশ্রয় ভাব উপপন্ন হয় না সেইজন্য সমবায় অবশ্য কল্পনীয়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহাতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়। যেমন—কার্য্য ও কারণ অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইলে আশ্রিতাশ্রয় ভাব সিদ্ধ হয়, এবং আশ্রিত আশ্রয় ভাব সিদ্ধ হইলে কুণ্ড-বদরের ন্যায় কার্য্যের ও কারণের ভিন্নতা সিদ্ধ হয়। কুণ্ড আশ্রয়, বদর আশ্রিত—ঐরূপ হওয়াকে ইতরেতরাশ্রয় বলে। কুণ্ড ও বদরের ন্যায় কার্য্য কারণ ভিন্ন হইলে কার্য্যের উৎপত্তি এবং কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধ-জ্ঞাপ্তি সিদ্ধ হয় না। এই জন্য ইহাকে দোষ বলে।

সেই জন্য বেদান্তীরা কার্য্য ও কারণের ভেদ ও আশ্রিতাশ্রয় ভাব মানেন না। এবং সেই জন্যই কারণ দ্রব্যের সংস্থান বা অবয়ব-বিন্যাস বিশেষকেই কার্য্য নামে উল্লেখ করেন।

অপর দিকে, পরমাণু যখন পরিচ্ছিন্ন পদার্থ তখন তাহার ৬, ৮, ১০ যতগুলি দিক থাকুক, সেই সকল অবয়বই তাহাকে সাবয়ব করিবে, তাহা হইলেই তাহা নশ্বর। সেই হেতু পরমাণুর নিত্যতা ও নিরবয়বতা পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি তোমরা যে সকল দিগ্‌ভেদভেদী অবয়ব বা অংশ বলিবে—সেইগুলিই আমাদের পরমাণু?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ইহা বলিতে গেলে স্থূল ও সূক্ষ্মের তারতম্য বা অল্পাধিক্য হইবে, তাহাতে তাহা পরম কারণ অপেক্ষা বিনাশী ইহাই উপপন্ন হয়। এই পৃথিবী দ্ব্যণুকাদি অপেক্ষা স্থূলতম, ইহা বস্তু সৎ হইলেও বিনাশী। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পৃথিবীও সমজাতীয়তা হেতু বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে দ্ব্যণুকও বিনষ্ট হয়। পার্থিব দ্ব্যণুকের বিনাশের ন্যায় পার্থিব পরমাণুও সমজাতীয়তা হেতু বিনষ্ট হইতে পারে—

পূর্ব্ব-পক্ষ—যাহারা বিনষ্ট হয় তাহারা অবয়ব বিভাগের পর বিনষ্ট হয় কিন্তু পরমাণুর অবয়ব না থাকায়, বিভাগ না থাকায় বিনাশ হয় না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ঘৃত-কাঠিন্য বিলয়ের ন্যায় তাহা বিনা বিভাগেও বিনষ্ট হইতে পারে। যেমন ঘৃতসংঘাত ও সুবর্ণ প্রভৃতি বিনা অবয়ব বিভাগে অগ্নি সংযোগ বলে দ্রবভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরমাণু-পুঞ্জও পরম-কারণ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া অমূর্ত্ত ও বিনষ্ট হইতে পারে।

আরও দেখ, কেবল অবয়ব সংযোগ দ্বারাই যে কার্য্য জন্মে, তাহা নহে। দুগ্ধ ও জল বিনা অবয়বান্তর সংযোগে বর্ষ (দধি) ও উপল (শিলা অর্থাৎ বরফ) জন্মাইয়া থাকে। ঈশ্বর কারণ প্রতিপাদক শ্রুতির বিরুদ্ধ বলিয়াই এই অসার তর্ক কলুষিত মত, শ্রুতি-প্রবণ শিষ্ট মনু প্রভৃতি ঋষি গ্রহণ করেন নাই।

ইতি বৈশেষিক মত খণ্ডন

হরি ওঁ তৎ সৎ

বাসুদেবানন্দ

বঙ্গসাহিত্যে ভাব-বৈষম্য

বঙ্গভাষার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইলে ভারতীয় প্রতিভার ধারাকে সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সুদূর পশ্চাতে—সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভারত যে ভাব-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাকেই বিশেষ প্রকারে লক্ষ্য করিতে হইবে। ভারত যে সনাতন কাল হইতে তাহার একটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈশিষ্ট্য লইয়া সর্ব্বজাতির সমক্ষে প্রোজ্জ্বল কনক-কিরীটশোভী গৌরীশৃঙ্গেরই মত প্রদীপ্ত, প্রতিভাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই বিশেষত্বকে—সেই বৈশিষ্ট্যকে ভাষাতত্ত্বের মধ্য দিয়াই অন্বেষণ করিতে হইবে। ভারতীয় মনীষার পরিস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল কোন্

অনন্তযুগে—তাহার সন্ধান লইয়া তাহার প্রাচীনত্বই আমাদের স্পর্দ্ধার বিষয় হইতে পারে না। ভারতীয় ঋষি, যাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে উৎখাত হইয়াছিল পরব্রহ্মের বাণী—বেদবাণী—যাহা বেদান্ত উপনিষদ্ দর্শন মীমাংসা পুরাণ তন্ত্রাদিক্রমে মহামন্ত্র স্বরূপে সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভারতের সর্ব্বস্বরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাই ভারতের একান্ত শ্লাঘার বিষয় এবং ভাষাতত্ত্ব হিসাবেও আলোচ্য হওয়া বিধেয়।

এখন দেখিতে হইবে সুচিন্তিত চিন্তাধারার ভিতর দিয়া, বুঝিয়া লইতে হইবে ঐ সকলের মূল উৎস কোথায়—তাহারই সন্ধান লইয়া। ভারতের ঋষি বলিতে পারিয়াছিলেন—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তাঁহারাই অনুভব করিয়াছিলেন—'ভূমৈব সুখম্'। সুতরাং ঐ সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের উদাত্ত গাথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব—ভারত ছিল ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সেইজন্যই ভারতের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, যাহা কিছু স্বাতন্ত্র্য তৎসমস্তই ধর্ম্মেরই নামান্তর বা প্রকারান্তর।

ভারতবর্ষ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই ধর্ম্মবাণীকে বক্ষের নিধি করিয়া কত যুগযুগান্তর ধরিয়া আরাধনা করিল, ধ্যান করিল এবং অনুভূতির বিমলানন্দ উপভোগ করিল। জীব কখনও সুখকর বস্তু লাভ করিয়া একাই তাহা উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, শ্রেয়বস্তু প্রিয়কে দিয়াই তৃপ্তির পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। যে ভারত বিশ্বকে একান্ত আপনার ভাবিয়াছিল, সেই ভারত 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'রূপ ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি-জনিত ভূমানন্দ বিশ্বে বিতরণ করিতে উৎসুক হইয়াছিল। তাই তাহার প্রকাশের জন্য ঋষিগণ সৃষ্টি করিলেন সুললিত ভাষা। সে ভাষা কথিত ভাষা, অবশ্য দেব-ভাষা—সংস্কৃত ভাষাই যে তাঁহাদের ভূমানন্দ অভিব্যক্তির ভাষা হইয়াছিল ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

ভারত-মস্তিষ্কে যে অনাহত মহাধ্বনি কতকাল ধরিয়া ধ্বনিত হইতেছিল—যাহা অতীন্দ্রিয়, তাহারই স্ফূর্ত্তির জন্য ভারতীয় ঋষিকুল জাগিয়া উঠিলেন। মৌখিক সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়া তাঁহাদের মহাভাবের বহুদিন ধরিয়া আদান প্রদান চলিয়া গিয়াছিল। তখনও

তাঁহারা লিখিত ভাষার আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গ্রীক্ সভ্যতা উন্মেষের সমসাময়িক কালেই নাকি ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু আছে কিনা তাহাও বলা দুরূহ। কিন্তু ইহা অতি সত্য—ইহাই বিশ্বাস করা অধিকতর সমীচীন, যে জাতি উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছিল শব্দই ব্রহ্ম—মহানাদ হইতেই সকল নাদের সৃষ্টি, তাঁহাদের পক্ষে বর্ণমালার আবিষ্ক্রিয়া পৃথিবীর যে কত শৈশব কালেই হইয়াছিল, তাহা সুধীজন মাত্রেই বিচার করিতে পারেন।

সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের চিন্তাধারাকে তাঁহারা অন্যদিকে প্রধাবিত করিতে বাধ্য হইলেন। সে সময় তাঁহাদের বংশ বিস্তার হইয়াছে, গুণকর্ম্মানুসারে তাঁহাদের কর্ম্মবিভাগ সমাধান করিলেন ঐ ধর্ম্মেরই ভিতর দিয়া। তখন ভারতীয় ঋষিগণ এই সাধনা—এই সুমহান কর্ম্মপ্রেরণায় প্রেরিত হইয়া, উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের সমাজ বন্ধন করিতে। সামাজিক অনুশাসনগুলিও ধর্ম্মের অনুশাসনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইল। ধর্ম্মকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সমাজে পঞ্চপর্ব্বের সৃষ্টি হইল এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ সাধন সামাজিকগণের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইল। তখন ভারত ব্রহ্মবাদানুকল্পিত বেদ, মন্ত্র, যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধির পথে অতি সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তৎসহ বেদমন্ত্রগুলিও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকর্ত্তৃক ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। বেদের ঋষি উদাত্ত সুরে গাহিলেন 'ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃপতিরেক আসীৎ।' সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভ অশরীরী মহাদেবতার আবির্ভাব বর্ণন করিলেন। এই যুগের ভাষার সাক্ষ্য দিল ঋক্ সাম যজুঃ অথর্ব্ব এই চারি বেদ। যে যুগের অনুশাসনের দ্বারা সমাজ পরিচালিত হইল, পরিপুষ্টি লাভ করিল সেই যুগের নাম হইল বৈদিক যুগ। এখন দেখা যাইতেছে, বেদ যে যুগকে বিশেষিত করিল সে যুগের ভাষার ধারাকে ধর্ম্মই যে ওতঃপ্রোতরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

শুধু সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রণয়নে সমাজ রক্ষিত হয় না, উহার পালনে, উহার রক্ষণে ও উহার স্থিরীকরণেই সমাজ-শৃঙ্খল সুদৃঢ় হয়। বেদের ঋষিগণ সমাজের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরোধ ভাব রক্ষা-কল্পে এই সময় প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন। পাছে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বা সামাজিক বিদ্রোহে জনগণের দৃষ্টি ধর্ম্ম হইতে শ্লথ হইয়া পড়ে সেই ভাবিয়া বিরাট সমাজকে তাহার তাবৎ বিধি ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্র পারিবারিক গ্রন্থির মধ্যেও ব্যবস্থিত করিবার জন্য তাঁহারা সজাগ হইয়া উঠিলেন; তাহারই ফলে সমষ্টিশক্তির মধ্য দিয়া যে ধর্ম্মভাব অব্যাহত গতিতে প্রসার লাভ করিতেছিল তাহাকে ব্যষ্টিশক্তির মধ্য দিয়াও প্রচার করিলেন। মন্বাদি-প্রবর্ত্তিত তাৎকালিক পরিবার-গঠন-প্রণালী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পরিবারস্থ জনগণের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধই কেবল নির্ণীত হয় নাই, পরন্তু তাহাদের সকলের ও প্রত্যেকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপক শাস্ত্র আবিষ্কৃত হইল,—ইহাই মনু-যুগ নামে অভিহিত।

মন্বাদি ঋষির যুগে ভারত শুধু তাঁহার আচার ব্যবহার রীতি পদ্ধতি প্রভৃতি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না, অধিকন্তু তাঁহারা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার জন্য নানা পুরাণাদিও লিখিয়া গিয়াছেন। দার্শনিকের চক্ষে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি তাঁহাদের নামের মধ্য দিয়াই সূচিত হইতেছে। এই ভাবে ঐ সকল পুরাণবেত্তা ঋষিগণের দ্বারা যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের সমাজ ও পরিবার শৃঙ্খলিত, সুগঠিত ও সুশোভিত হইয়াছিল সেই যুগকেই সাহিত্যিকগণ পৌরাণিক যুগ বলিয়া পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই যুগেও সাহিত্যের মধ্য দিয়া কেবল মাত্র ধর্ম্মভাবই প্রকটিত হইয়াছে—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ধর্ম্ম যখন ভারতীয় সমাজকে আক্রমণ করিয়া পরিবারের মধ্য দিয়া অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল তখন তাহার নিয়ন্তার প্রয়োজনও ঋষিগণ ভাবিয়াছিলেন। এই সুচিন্তিত ভাবধারার প্রভাবে ভারতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা গাহিলেন, 'মহতী

দেবতা রাজা নররূপেণ তিষ্ঠতি'। তাঁহারা ভাবিলেন, অনুভব করিলেন, রাষ্ট্র-পরিচালনার যোগ্য সম্পত্তিসম্পন্ন পুরুষ রাজা, প্রজারঞ্জনই হইল তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য—প্রজাপালনই হইল তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য—ধর্ম্মরক্ষণই হইল তাঁহার একমাত্র সাধনা। সুতরাং এই যুগেও রাষ্ট্রতন্ত্র সৃষ্টি করিবার জন্য চাণক্যাদি ঋষির ন্যায় নীতি-বিদ্‌ কর্ত্তৃক বিশিষ্ট শাস্ত্র প্রণীত হইল। ইহাও আপদ্‌-ধর্ম্মাদি নামে পরিচিত।

সাম দান ভেদ দণ্ড—এই চতুর্ব্বিধ রাষ্ট্রবিধি যে সকল উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়াছিল সে সকল মস্তিষ্কে ধর্ম্মই যে লীলা খেলা করিতেছিল আপদ্‌-ধর্ম্ম গ্রন্থের নামই তাহার বিশিষ্ট প্রকাশক। এই ভাবে বৈদিক যুগ হইতে মন্বাদি যুগ পর্য্যন্ত সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছিল।

ভারতীয় সাহিত্যবেদে যে ব্রহ্মস্তুতি উদ্গীত হইয়াছিল, তাহা যে কেবল নীরস ধর্ম্মভাবকেই অবলম্বন করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর তাহার কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা নহে, উহার মধ্য দিয়া ভারতীয় ঋষিগণ রসধারাও বিস্তার করিয়াছিল। সারাৎসার ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল সেই সাহিত্যে 'রসো বৈ সঃ' এই মহাবাণী প্রসূত হইয়াছিল। আর্য্য ঋষিগণ এই ভাবকে সরস ও প্রাঞ্জল করিয়া সাধারণে অমূল্য নিধি-স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। সাহিত্যে রস সৃষ্টি ভারতীয়গণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় ঋষিগণ আদি করুণ প্রভৃতি নব রসকে প্রকাশ করিয়া জগতের নিকট একটি মহাদানরূপে উপস্থাপিত করিলেন। সে রস-সমূহের মধ্যে কোন আবিলতা ছিল না—উহা দ্যোতক, ভাস্বর ও সর্ব্বাবস্থায় আপামর সাধরণের অধিগম্য। এখানেও দেখা যায়, সেই রসভাব অবিরোধ ধর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, সর্ব্বোত্তম অলঙ্কার পরিহিত হইয়া 'সত্যং শিবং সুন্দরম্‌' রূপে। এই ভাবে ভারতের ভাষা ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধ-রসালঙ্কার সংযুক্ত হইয়া মোহন ও কল্যাণকর ভাবে ক্রমোন্নত হইতেছিল। কিন্তু খৃঃ

খৃঃ ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বপর্য্যন্ত উহা গ্রন্থাকার ধারণ করিয়াছিল কিনা তাহার কোন বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাষার প্রকটমূর্ত্তি লইয়া মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

রামায়ণ মহাভারতের মধ্য দিয়াই ভারতীয় সাহিত্যের এক মাত্র বৈশিষ্ট্য—ধর্ম্ম ও রস অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্য ও রামায়নীয় সাহিত্যকলার মধ্যে এইটুকুই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে বৈদিক মন্ত্রগুলি বিশেষ বিশেষ ঋষি কর্ত্তৃক আখ্যাত হইয়াছিল তাহা ব্যক্তিগত ভাবে সাহিত্যের পুষ্টি সম্পাদন করিলেও ঐতিহাসিক হিসাবে তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, কিন্তু পরোক্ত গ্রন্থের ভিতর দিয়া মনোনিবেশ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, উক্ত মহাকাব্যের প্রণেতা মহামুনি বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ঋষির রচিত আখ্যান ফুটাইয়া তুলিলেও বৈদিক ভাষায় বলিতে হইলে এই মহাকাব্য-মন্ত্রের ঋষি—বাল্মীকির দেবতা ছিলেন আদর্শ মানবাবতার শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী। ছন্দ প্রায়শঃই অনুষ্টুপ। সুতরাং এস্থলে দেখা যায়, বৈদিক যুগ হইতে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত সাহিত্যের গতি একমাত্র ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া স্তরে স্তরে বিভিন্ন কালে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণতার দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু রামায়ণের ঋষি একই কালে এই মহাকাব্যকে অবলম্বন করিয়া সেই বিভিন্ন যুগপ্রসূত ভাবচয়কে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

রামায়ণে লোকোত্তর চরিত্রসম্পন্ন দেবগুণভূষিত রামচন্দ্রের চরিতাখ্যানের মধ্য দিয়াই যে কেবল ধর্ম্মের ময়ূখমালী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নহে, অধিকন্তু তৎকালের ঋষি চরিত্র, প্রভৃতিও বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছিল। বাল্মীকি তপঃসিদ্ধ উন্নতধর্ম্মা, নীতিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, প্রভাববান ও মানবচরিত্রে বিশেষজ্ঞ মহাপুরুষ। বশিষ্ঠ ঋষি তপঃশক্তিসম্পন্ন, মন্ত্রদ্রষ্টা, নির্ম্মলচরিত্র ও জ্ঞানযোগী, ভরদ্বাজ যোগৈশ্বর্য্যবান এবং বিশ্বামিত্র ছিলেন সর্ব্বোন্নত তপস্বী, সর্ব্বদর্শী,

ও সিদ্ধ মহাপুরুষ। সুতরাং এই সকল ঋষির আদর্শ ধর্ম্মভাব ও কবিত্বের মাধুর্য্যে মহিমান্বিত সেই সুমহান কাব্য যে ধর্ম্মনীতির পোষক এবং সত্য ও সুন্দরকে অবলম্বন করিয়াই লিখিত তদ্বিষয়ে আর কিছু মাত্র মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

পরবর্ত্তী ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্র-বিপ্লবই ভাষা-বিপ্লবের একমাত্র হেতু হইয়াছিল, পারিপার্শ্বিক জাতীয় রাজশক্তির লোলুপদৃষ্টি যখন শস্য-শ্যামল ভারতের দিকে পড়িয়াছিল, যখন বৈদেশিক শক্তি সমগ্র বাঙ্গলাকে সাময়িক ভাবে গ্রাস করিতেছিল, তাহার রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাসাহিত্যেও একটা প্রবল আলোড়ন ঘটিয়াছিল। ইহাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উপর যেমন ভারতেতর প্রদেশের ভাব সংক্রামিত হইয়াছিল, বঙ্গ দেশের উপরও তাহার প্রভাব বিস্তারে ক্রুটি হয় নাই। আলোচ্য বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সে ভাবাবলীর প্রতিচ্ছায়া প্রকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। তাহারই ফলে প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতার অদৃষ্টবাদ এবং ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভাব বঙ্গভাষায়ও স্থান পাইয়াছে। গ্রীক অদৃষ্টবাদ বাঙ্গলার কাব্য সাহিত্যে যুগান্তরকারী কবি মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের ভিতর দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী রাবণ অদৃষ্ট-কর্ত্তৃক ধিকৃত হইয়াও, তাঁহার ধ্বংস নিশ্চিত জানিয়াও মানবাবতার শ্রীরামচন্দ্রের সহিত একটা আপোষ করিলেন না। ভারতীয় অদৃষ্টবাদীর হিসাবেও কবিবর তাঁহাকে নিরস্ত্র করিতে প্রয়াসী হন নাই। অবশেষে রাবণ সবই হারাইলেন—"নিজ কর্ম্মফলে মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।" কবিবর তাঁহার কাব্য প্রতিভার আলোকে এই দৃশ্যটি এক কথাতেই বেশ সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

'এক লক্ষ পুত্র তার সোয়ালক্ষ নাতি।
কেহ না রহিল তার বংশে দিতে বাতি' ॥

এই সময়কার বঙ্গসাহিত্যে বৈদেশিক ভাব যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার ভূয়সী প্রমাণ আমরা সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব। ইহার পর হইতেই বাঙ্গলার কাব্য তাহার স্বরূপ হারাইয়া বিভ্রান্ত ও পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছে, দেখিতে পাই। পাশ্চাত্যের প্রভাবই যে ইহার একমাত্র কারণ, সন্দেহ নাই। ভারতীয় সাহিত্য-শিল্পী যেন সাহিত্যের মূল উপাদান হারাইয়া কোন এক অজানা কাল্পনিক আদর্শের পানে ছুটিয়াছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ভাবাবলীও অবাধে তাহাকে নানা উপাদান দান করিয়া বিনা খরচে দাতাকর্ণের ন্যায় যশস্বী হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য—'সত্যং শিবং সুন্দরম্'—এই মহান আদর্শ ভুলিয়া গিয়া পরকীয়া প্রেম-লুব্ধ হইল তাহার ফলে তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস-বন্ধন শিথিল হইয়া গেল, তাহার সুপ্রাচীন সুরক্ষিত সমাজ উন্মার্গগতি লাভ করিল, তাহার সুরক্ষিত রাষ্ট্রনীতিতে বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারই ফলে তাহার সুনিয়ন্ত্রিত পরিবারেও পরতন্ত্রতা অধিকার করিয়া বসিল। বস্তুতঃ ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে বঙ্গসাহিত্যে ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। তাহার হেতু অন্বেষণ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে, ভারত—তথা বাঙ্গালা তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস হারাইয়াছে—সত্য শিব সুন্দর স্বরূপকে যুগপৎ বিস্মৃতির জলে নিমজ্জিত করিয়া, সাহিত্য-সমাজে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের স্থানে বিলাস-বিভ্রান্ত মানুষী সৌন্দর্য্যের আসন পাতিয়াছে। যে বিরাট সাহিত্যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিশ্বস্রষ্টার মূর্ত্তি "সত্যং শিবং সুন্দরম্" রূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই ত্রিমূর্ত্তি বা ত্রয়ী নামে আখ্যাত। এই তিনটি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সাহিত্যের পূর্ণতা-বিকাশের মুখ্য উপাদান। ইহাদের কোন একটিকে বাদ দিলে এ দেশীয় সাহিত্য কখনই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ইহার কোন একটি অঙ্গের বিচ্যুতি ঘটিলে বঙ্গীয় সাহিত্য-মূর্ত্তি পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ যে সাহিত্যের মধ্যে সত্যাদর্শ আদৃত না হয়, যাহার মধ্যে

মঙ্গল-স্বরূপ শিবত্ব প্রতিষ্ঠিত না থাকে, যে সাহিত্যে পরম সুন্দরের সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি না হয়, তাহা আদর্শ সাহিত্য শ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারে না। তাই দেখিতে পাই, হীন তুচ্ছ প্রমোদকে লইয়া সাহিত্যিক আজ বাস্তবতার সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহার পরম কল্যাণকর শিব-স্বরূপকে বাদ দিয়া।

বাঙ্গালার সাহিত্য-মনীষাকে আবার পশ্চাতের দিকে—'সত্যং শিবং সুন্দরম্' এর বিশ্ববিমোহনকারিণী মূর্ত্তির দিকে অবহিত করাইতে হইবে, ভাষার মধ্যে পুনশ্চ একাধারে সেই সত্য শিব সুন্দররূপের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণকে তাঁহাদের বিলোল দৃষ্টির পরিবর্ত্তন করিয়া এই বস্তুতান্ত্রিকতা ত্যাগ করিতে হইবে, জাড্য ঘুচাইয়া সবল কর্ম্মপরতা আনিতে হইবে, নচেৎ বঙ্গভাষা রসহীন ও সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া ক্লীবত্ব ও জড়ত্বকেই আলিঙ্গন করিবে।

ভাষায় সৌষ্ঠব ও শ্লীলতাই তাহার একান্ত গৌরবস্থল। এ গরিমাহীন ভাষা 'ভাষা' পদবী প্রাপ্তির অযোগ্য। এ যোগ্যতা সাহিত্যিকগণকে রক্ষা করিতেই হইবে—বিশেষতঃ বঙ্গসাহিত্যিকগণকে। ভাব ও ভাষার সাহিত্যই 'সাহিত্য' আখ্যায় আখ্যাত সুতরাং ভাবকে ত্যাগ করিয়া ভাষার সেবা করা হয় না, পক্ষান্তরে ভাষাকেও বিদায় দিয়া ভাবের গৌরব রক্ষা করা চলে না। সুতরাং ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য-সহকারিতা-রক্ষা অবশ্যই করিতে হইবে এবং শ্লীলতাকেও সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

আজিকালকার বঙ্গভাষার রূপ-সৌন্দর্য্যে আপাতমনোহর অলীক সুন্দরতার বেথাপাত হইয়াছে। বর্ত্তমানের বঙ্গ-সাহিত্যে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের প্রকৃত প্রচেষ্টা চলিতেছে কিনা, উহা মঙ্গলকর কিনা, সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর উহা স্থাপিত কিনা, উহা সত্যাকারের সৌন্দর্য্যে ভূষিত কিনা, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার দিন আসিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যের যে দিন শৈশব ছিল, যেদিন বঙ্গ-সাহিত্য সবে মাত্র ভাগবত ভাবকে গ্রহণ করিতে শিখিতেছিল, সেদিনের সাহিত্যিক-

গণ যাহা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও পরম প্রীতিপ্রদ, কল্যাণকর ও উপভোগ্য ছিল। সেই সকল দিনের বঙ্গসাহিত্যসেবক ছিলেন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, লোচনদাস ইত্যাদি রসিক ও ভক্ত কবিগণ। তাঁহারা ভাষার সেবা করিয়াছিলেন একটা পরিপূর্ণ সরলতা ও বাস্তবতাকে লইয়া, বঙ্গের শোভন যৌবনের প্রতীক-স্বরূপে। তৎকালে উহা দেশের ও দশের পক্ষে যত সুন্দর ও কল্যাণপ্রদ ছিল বর্ত্তমানেও ঠিক তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক। তাঁহারা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, রসসাহিত্যের হিসাবে তাঁহারা ভাষার মধ্যে যে সুমহান ভাব ও অনিন্দ্য রসপ্রবাহ চালিয়া দিয়াছেন, তাহা কত মধুর কল্যাণকর তাহা প্রকাশের ভাষা বর্ত্তমানে আর নাই।

তাঁহাদের পরবর্ত্তী সাহিত্যিকগণও ভারতের ভাবাবলীর রসাস্বাদ করিয়াও ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের গণ্ডি হইতে এক চুল অতিক্রান্ত হন নাই, কিন্তু বর্ত্তমানের সাহিত্যিক মণ্ডলীর সাহিত্যে সে বৈশিষ্ট্য আর লক্ষিত হইতেছে না। প্রবল মানসিকতার অভাব—বঙ্গসাহিত্যে ভাবের বৈষম্য-বিধানের হেতু কিনা, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, বি-এ, বি-টি

কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ

শিব, পার্ব্বতী এবং প্রমথগণসহ স্বর্গপুরী কৈলাসে বাস করেন। মানস-সরোবর সেখানকার এক রমণীয় সরোবর। সেই সরোবরে অসংখ্য রাজহংস এবং অন্যান্য নানাবর্ণের জলচর পক্ষী স্বচ্ছন্দে বিহার করে। নানাবর্ণের পদ্ম সেই সরোবরের জল আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। মর্ত্ত্যের কোন কিছুর সঙ্গে কৈলাসের তুলনা হয়

না। কারণ, কৈলাস অপার্থিব। সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা অবর্ণনীয়। একমাত্র ভাবুক কবির সুনিপুণ তুলিকা তাহার কতকটা আভাষ দিতে সক্ষম। সেখানকার আইন-কানুন সম্পূর্ণ আলাদা। পৃথিবীর নিয়ম সেখানে খাটে না। না আছে সেখানে দুঃখ কষ্ট, না আছে জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু। আছে কেবল অনাবিল শান্তি আর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। ছেলেবেলায় কৈলাস এবং মানস-সরোবর সম্বন্ধে এই রকম নানা মজার গল্প শুনিতাম। সুকুমার বয়সে মানুষ সাধারণতঃ অনেক কথাই বিশ্বাস করিয়া লয়, তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে না। আমাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। স্বভাবসুলভ সরলতাবশতঃ আমিও যাহা কিছু শুনিতাম, নির্ব্বিবাদে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া যাইতাম। সেইজন্য এমনও হইয়াছে যে, কখনও কখনও শিবপার্ব্বতীর লীলানিকেতন কৈলাস, মর্ত্ত্যে দর্শন সম্ভবপর নয় ভাবিয়া আক্ষেপ করিয়াছি। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা এবং গল্প ও রূপকথার মোহ কতকটা কাটাইয়া যখন স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম, তখন কত নূতন তথ্য শিখিলাম, কত পুরাতন ভুল ভাঙ্গিল। ভূগোলে পড়িলাম—কৈলাস এবং মানস-সরোবর পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ অধিত্যকা তিব্বতের অন্তর্গত পর্ব্বত এবং হ্রদ বিশেষ।

অবশ্য সেজন্য এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কৈলাস এবং মানস-সরোবর অতি রমণীয় এবং তীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট তীর্থ। কৈলাস এবং মানস-সরোবর তিব্বতবাসী বৌদ্ধদের নিকট যেমন পরম পবিত্র, ভারতবাসী হিন্দুদের নিকটও ঠিক সেইরূপ। প্রতিবৎসর বর্ষাকালে ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপিপাসু ভক্তিমান যাত্রীর দল দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ের উন্নত প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কৈলাস দর্শন এবং মানস-সরোবরে স্নান করিতে যান। ধর্ম্মের জন্য পাহাড়ী রাস্তার ভীষণ চড়াই উৎরাই, দুর্জ্জয় শীত এবং শ্বাস-কষ্ট, দস্যুভীতির দরুণ দুর্দ্দমনীয় মানসিক অশান্তি, সময় সময় অনশন এবং অর্দ্ধাশন ইত্যাদি তাঁহারা অম্লান বদনে সহ্য করেন। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

ধর্ম্মের জন্য হিন্দু সব করিতে পারে। ধর্ম্মই তাহার প্রাণ। যুগের পর যুগ বহু ভাগ্য-বিপর্য্যয়েও ধর্ম্মকে আঁকড়াইয়া আছে বলিয়া হিন্দু বাঁচিয়া আছে। যতদিন হিন্দু তাহার অতিথি-সৎকার, দেবদেবী-অর্চ্চনা এবং তীর্থ-মহিমা না ভুলিবে ততদিন তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

তাহার পর বহুবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জীবনে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমি সাধু জীবন গ্রহণ করিয়া মায়াবতী—অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া আশ্রমস্থ কাহারও কাহারও নিকট কৈলাস এবং মানস-সরোবরের কথা শুনিয়া আমার পূর্ব্ব স্মৃতি এবং বাসনা আবার জাগিয়া উঠে। ইচ্ছা ক্রমেই বলবতী হইতে থাকে। মনে হয়, যে রকম করিয়াই হউক একবার দেখিয়া আসিতে হইবে। মায়াবতী-আশ্রম নিকটতম রেলওয়ে (রোহিলখন্দ এণ্ড কুমায়ন রেলওয়ে) ষ্টেশন টনকপুর হইতে ৩৭ মাইল দূরে—আলমোড়া জেলার অন্তর্গত। আশ্রমের ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে লোহাঘাট মহকুমা সহর। টনকপুর হইতে একটি রাস্তা লোহাঘাটের মধ্য দিয়া পিথরাগড়, ধারচুলা, গার্ব্বিয়াং এবং লিপুলেক পাশ হইয়া তিব্বতে গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া ভুটিয়া সওদাগরগণ প্রতিবৎসর তিব্বতে যাইয়া ব্যবসা করে। তীর্থযাত্রীরাও এই রাস্তা দিয়া কৈলাস এবং মানস-সরোবর দর্শন করিতে যায়। এতদ্ব্যতীত নেপাল রাজ্যের মধ্য দিয়া আর একটি রাস্তা তিব্বত গিয়াছে। অনেকে সেই রাস্তায়ও গিয়া থাকে। এই রাস্তা দিয়া যাইলে মায়াবতী হইতে কৈলাস এবং মানস-সরোবরের ব্যবধান ২৫০ মাইল হইবে। সুতরাং মায়াবতী হইতে কৈলাস যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ এবং অল্প-ব্যয়সাধ্য।

ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করার ফলে আমার কৈলাস যাত্রার উপযুক্ত সুযোগ এবং সঙ্গী মিলিয়া গেল। বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল। মাদ্রাজবাসী দুইজন উৎসাহী ভদ্রলোক—দুইজনই আমার মত যুবক—ঘটনাক্রমে মায়াবতী বেড়াইতে আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ

আলাপ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হইয়া যায়। তাঁহারা আমার সঙ্গে কৈলাস-দর্শনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বন্দোবস্ত সব ঠিক হইয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে মায়াবতী হইতে কেহ কেহ কৈলাস এবং মানস-সরোবর দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে যাত্রার উপযোগী বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিয়া নোটবুকে লিখিয়া লই। সাজসরঞ্জাম এবং পোষাক-পরিচ্ছদের যথোচিত বন্দোবস্ত করার ত্রুটি হয় নাই। তবুও আমরা অনেক সময়ে অনেক জিনিষ ঠেকিয়া শিখিয়াছি। আর একবার যাইলে আরও পাকাপাকী বন্দোবস্ত করিয়া বাহির হইতে পারিব—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, কৈলাস এবং মানস-সরোবর দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসা সহজ নয়। রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম। স্থানে স্থানে অনেক রকম অভাবনীয় অসুবিধা আছে। সুতরাং যাত্রিগণ ভাল বন্দোবস্ত না করিয়া যেন কিছুতেই বাহির না হন। যাঁহারা মোটামুটি আরামে যাইতে চান তাঁহাদের প্রথমতঃ যথেষ্ট গরম কাপড়, যথা—পশমী কম্বল, জামা, ওভার-কোট, সোয়েটার, মোজা, গ্লাভস্, ড্রয়ারস্, কম্‌ফর্টার্, টুপি ইত্যাদি সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। গরম কাপড়ের লম্বা তালিকা দেখিয়া ভয় পাইবার কিছু নাই। কারণ, সকলেরই মনে থাকা কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদিগকে স্থানে স্থানে ১৬০০০ হইতে ১৮৫০০ ফিট উচ্চে বরফের উপর দিয়া দুরন্ত হাওয়ার মধ্যে চলিতে হইবে। কখনও কখনও তুষারপাতের দরুণ শরীরের অবস্থা এমন হইতে পারে যে, মনে হইবে শরীরের রক্ত যেন জমিয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ—যাত্রীদের সঙ্গে পকেট-ঘড়ী, লণ্ঠন, মোম্‌বাতী, দেশলাই, চা, লিখিবার কাগজ, পেনসিল, ছুরি, কাঁচি, কয়েক শিশি অত্যাবশ্যকীয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ (গ্লবিউল), টিন্‌চার আয়োডিন, জ্যাম্‌বাক্, ভেসেলিন্, চশমা (গগ্‌ল্‌স্) ইত্যাদি ছোট-খাট জিনিষ থাকিলে বড় ভাল হয়। তৃতীয়তঃ—রান্নার বাসন—থালা, গ্লাস, ঘটি, বাটি ইত্যাদি থাকা চাই। এই সব বাসন

এলুউমিনিয়মের প্রস্তুত হইলেই ভাল হয়। সম্ভব হইলে একটি গ্যাস ষ্টোভ এবং থারমস্ নেওয়া মন্দ নয়। তিব্বতের অনেক স্থানে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় না। সুতরাং ষ্টোভ এবং থার্মস্ থাকিলে যে খুব সুবিধা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রত্যেকেরই একটি করিয়া পাহাড়ে চলার উপযোগী মজবুত লাঠি থাকা আবশ্যক। লাঠি ছাড়া চড়াই উৎরাই করা কি কষ্টকর, যাঁহাদের পাহাড়ে চলার অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই জানেন। তিব্বতে যাইবার রাস্তা বিশেষতঃ লিপুলেক পাশ বর্ষাকালেই খোলা থাকে। সুতরাং ছাতা অথবা ওয়াটার-প্রুফ্, ওভার-কোট সঙ্গে লওয়া প্রয়োজন। বিছানাপত্র বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করার জন্যও ওয়াটার-প্রুফ্ চাই। সর্ব্বাগ্রে খাওয়া-দাওয়া, কুলী-ভাড়া ইত্যাদির পথ-খরচের জন্য সঙ্গে যথেষ্ট টাকা থাকা চাই। চারি জন একসঙ্গে টনকপুর হইতে পদব্রজে গেলে যাতায়াতের জন্য মোট অন্ততঃ ২৫০ টাকা অবশ্য চাই। ভবিষ্যৎ-যাত্রীদের সুবিধা হইবে মনে করিয়া এত সব কথা লিখিলাম।

৮ই জুলাই (১৯২৫ খ্রীঃ) শনিবার আমাদের যাত্রার দিন ধার্য্য হয়। ঐ দিন আহারাদির পর আশ্রমস্থ সকলের শুভেচ্ছা মাথায় লইয়া ১১টা ১৫ মিনিটের সময় আমরা তিন জন কৈলাসপতির নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বাহির হইলাম। স্বামী কমলানন্দ আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তিনি আমাদিগকে ছিরা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। যতদূর সম্ভব ঘোড়ায় চড়িব না ঠিক করিয়া আমরা পদব্রজেই যাত্রা করি। একে তো হাতে টাকা পয়সা বেশী নাই, তারপর এই বয়সে রাস্তা দুর্গম হইলেও পায়ে হাঁটিয়া চলার একটা গৌরব আছে। আমাদের মালপত্র সব একটা ঘোড়ার পিঠে চাপান হইল। ঘোড়াওয়ালা আমাদিগকে পিথরা-গড়ের নিকটবর্ত্তী গুরখাপল্লী জামর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে—এই চুক্তি হয়। অনুমান ১২টা ৩০ মিনিটের সময় আমরা লোহাঘাট পৌঁছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোহাঘাট আলমোড়া জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা সহর। ইহার সহিত বাঙ্গলা অথবা নীচের কোন প্রদেশের মহকুমা সহরের সঙ্গে তুলনা করিলে অত্যন্ত ভুল হইবে। সহরটি অত্যন্ত নগণ্য। লোকসংখ্যাও খুব কম। মহকুমার প্রধান শাসন কর্ত্তার হেড কোয়াটার্স এইখানে। যদিও এখান হইতে বরফের পাহাড় দৃষ্টি গোচর হয় না, তথাপি লোহাঘাট স্থানটি দেখিতে অতি মনোরম। ইহা অনেকটা সমতল ভূমিতে অবস্থিত। চারিদিকে দেওদারের জঙ্গল থাকায় সহরের শোভা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী গিয়াছে। বর্ষাকালে নদীতে জল মোটামুটি বেশ থাকে। গ্রীষ্মকালে তেমন থাকে না। সহরের উপকণ্ঠে নদীর তীরে একটি ছোটখাট শিবালয় এবং ধর্ম্মশালা আছে। তাহারই ঠিক উপরে ময়দানের মত একটা স্থানে বৎসরে বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে মেলা বসে। মেলায় বহু লোকের সমাগম হয়—নানাবর্ণের চাকচিক্যপূর্ণ পোষাক-পরা স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হয়। বেচাকেনা, নাচগান ইত্যাদিও হয়,—"দেবতা" আসে। আমরা বহুবার এই মেলা দেখিয়াছি। এই মেলা পাহাড়ীদের একটা আমোদ উপভোগের স্থান। "দেবতা" আসা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা না করিলে পাঠক হয় তো বুঝিতে পারিবেন না। বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ লোকের উপর "দেবতার ভর" হয়। গ্রামবাসীরা শোভাযাত্রা করিয়া, ঢাক-ঢোল পিটাইয়া "দেবতাগ্রস্ত" লোকটিকে কোন দেবস্থানে লইয়া যায়। বিগ্রহের সম্মুখে তাহাকে দুধ এবং জল দিয়া স্নান করান হয়। তারপর ভাবের আবেশে সে উদ্দাম নাচিতে থাকে এবং উপস্থিত জনমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করে। ইহা ছাড়া লোহাঘাটে নবরাত্রি উপলক্ষে সহরবাসী ভদ্রলোকদের চেষ্টায় ষ্টেজ করিয়া রামলীলার অভিনয় হয়। বহু-লোক দেখিতে আসে। আমরাও কয়েকবার দেখিয়াছি। লোহাঘাটে একটি পোষ্ট-টেলিগ্রাফ-আফিস, একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং একটি ডাক-বাঙ্গলা আছে। এখানে একটি ছোটখাট বাজারও আছে। বাজারটিকে সহরের জনাকীর্ণ অংশ বলা যাইতে পারে। বাজারের মধ্য দিয়া পাথরের

বাঁধান রাস্তা গিয়াছে। বাড়ীগুলি প্রায় সব দোতলা। নীচের তলায় দোকান, উপরে দোকানদারেরা থাকে। মিঠাইয়ের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া, দর্জ্জির দোকান, মণিহারী দোকান, মুদির দোকান, পানের দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান, মদের দোকান ইত্যাদি সব আছে। শুনিলে অবাক হইবেন যে, লোহাঘাটের বাজারে ওভেলটিন, জ্যাম্, জেলী, বিস্কুট ইত্যাদিও পাওয়া যায়। তাই বলিয়া মনে করিবেন না যে, এখানকার পাহাড়ীরা এই সব বিলাসিতার সামগ্রী কিনিয়া থাকে। এখানে কয়েক ঘর ইউরোপীয়ান এবং ইউরেশিয়ান বাস করেন; তাঁহারাই সাধারণতঃ এই সব জিনিষ কিনিয়া থাকেন। এখান হইতে তিন মাইল দূরে ইউরেশিয়ানদের ছোটখাট একটি উপনিবেশ আছে। তাহাকে এবট্-মাউন্ট বলে। লোহাঘাটে সরকারী কুলীএজেন্সির একটি মস্ত আড্ডা আছে। সম্প্রতি কুলীএজেন্সি যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি বড় দোতলা বাড়ী করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে যাত্রারা অল্প পয়সায় এখানে থাকিতে পারেন। সময়মত খবর দিলে কুলীএজেন্সি কুলী মজুত রাখেন। সাধারণতঃ একজন কুলী মাইল প্রতি /১০ পয়সা হিসাবে ২৫ সের মাল নেয়। এই কুলীএজেন্সি হওয়ায় এখন পাহাড়ে চলার পক্ষে খুব সুবিধা হইয়াছে। বোধ হয় টনকপুর হইতে পিথরাগড় পর্য্যন্ত প্রতি ১০।১২ মাইল অন্তর কুলীএজেন্সির লোক থাকে। সব জায়গায়ই কুলী পাওয়া যায়। লোহাঘাটে কয়েকঘর মুচি বাস করে। তাহারা নিজেদের ট্যান্‌করা চামড়া দিয়া জুতা প্রস্তুত করে। সেই সব জুতা অনেক জায়গায় চালান হয়। লোহাঘাটের উচ্চতা সমুদ্র হইতে ৫৭২৫ ফিট। লোহাঘাট আলমোড়া সহর হইতে ৬০ মাইল পূর্ব্বে। আলমোড়া হইতে একটি রাস্তা এখানে আসিয়া মিলিয়াছে। এখানকার জল-বায়ু ভাল।

লোহাঘাটে ঘণ্টাখানেক অথবা ততোধিক বিশ্রাম করিয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করি। বেলা ৫টার সময় আমরা ছিরায় পৌছি। লোহাঘাট হইতে ছিরা ৯ মাইল। চড়াই উৎরাই বেশী নাই। মাঝে একটা ছোট নদীর উপর একটা পুল আছে। সেই পুল পার হইয়া যাইতে হয়।

ছিরার প্রায় সম্মুখে আসিয়া এক পাসলা বৃষ্টি হইল, ছিরার ডাকবাঙ্গলায় আমরা আশ্রয় লইলাম এবং রাত্রিযাপন করিলাম। ডাকবাঙ্গলার যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন তিনি আমাদের বিশেষ পরিচিত। সুতরাং আমাদের খাওয়া-দাওয়া এবং আদর-যত্নের ত্রুটি হয় নাই। এখানে একটি ছোট-খাট সরকারী মুদির দোকান আছে। দোকানে চাল, ডাল, মশলা, ঘী ইত্যাদি পাওয়া যায়। ছিরা লোহাঘাট অপেক্ষা কিছু নীচু। তারপর সেখানে গাছপালা বেশী না থাকায় গ্রীষ্ম এবং শরতে বেশ গরম পড়ে এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে না। ডাকবাঙ্গলার আশেপাশে বেশ বড় বড় চিড় গাছ (Pine tree) আছে

পরদিন সকালবেলা সামান্য জলযোগের পর আবার আমরা চলিতে আরম্ভ করি। স্বামী কমলানন্দের সঙ্গে এখানে ছাড়াছাড়ি হইল। ছিরা হইতে আমাদের পরের ষ্টেজ গোরণা ১০ মাইল। রাস্তা প্রথম খুব উৎরাই—বাংগ্রীনদীর পুল পর্য্যন্ত। এই নদীটি আমরা ইতিপূর্ব্বে লোহাঘাট এবং ছিরার রাস্তায় পাইয়াছি। এই স্থানে বাংগ্রীনদী সরযুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সরযূ বেশ বড় নদী। উঁচু নীচু বড় বড় পাথরের উপর দিয়া চলিয়াছে বলিয়া ইহার স্রোতে বেশ জোর আছে। ৫ মাইল যাইয়া সরযূ কালীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সরযুর তীর দিয়া, খাড়া এক পাহাড় পাশে রাখিয়া মাইলখানেক সমান রাস্তা চলার পর আমরা সরযুর সাস্‌পেন্‌শন ব্রীজ এর নিকট উপস্থিত হই। ব্রীজটি বেশ বড়, অনুমান ১৫০ফিট লম্বা হইবে। মজবুতও বেশ, বর্ষাকালে সময় সময় জলের এত বেগ হয় যে ইতিপূর্ব্বে ২।১ বার পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে পুল পার হইয়া সরযুর অপর তীরে যাইতে হইল। তারপর গোরণা পর্য্যন্ত আগাগোড়া চড়াই। এই চড়াই শেষ করিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। গরম, ক্ষুধা এবং পিপাসায় আমরা সকলেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। খানিকটা চলি, আবার ছায়া পাইলেই বসিয়া বিশ্রাম করি, এই ভাবে ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ীর মত আস্তে আস্তে আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম। * * * এখানেই এই অবস্থা, পরে কি হইবে—আমরা ভাবিয়াই বিহ্বল।



কালী-নদীর দৃশ্য

এই রাস্তায় বার তের বৎসর বয়সের এক পাহাড়ী ছেলের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। সে কতকগুলি নাশপাতী লইয়া পিথরাগড় হইতে নিজের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে যাইতেছিল। ছেলেটির চেহারা দেখিয়া বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হইল। সে আমাদিগকে "নমো নারায়ণ" বলিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "স্বামিজী, আপনারা কোথায় যাইবেন? আপনাদিগকে বড় পরিশ্রান্ত বলিয়া মনে হইতেছে। আমার কাছে নাশপাতী আছে। যদি দয়া করিয়া গ্রহণ করেন।" আমরা সানন্দে তাহার শ্রদ্ধার উপহার গ্রহণ করিলাম।

এই দারুণ গরমে নাশপাতী খাওয়ায় পিপাসা এবং শ্রান্তি কতকটা নিবৃত্ত হইল। ছেলেটি শুধু বুদ্ধিমান নয়, সৎপ্রকৃতিরও বটে। আলাপ করিয়া জানা গেল সে পিথরাগড়ে খ্রীষ্টান মিশনারীদের স্কুলে পড়ে। ছেলেটিকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। বেলা ৩টার সময় আমরা গোরণায় পৌছি।

গোরণা স্থানটি দেখিতে মন্দ নয়। এখানকার উচ্চতা ৪৮৭৫ ফিট। এখানে একটি ডাকবাঙ্গলা আছে। ডাকবাঙ্গলাটি সমতল ভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দাঁড়াইয়া চতুষ্পার্শ্বের পাহাড়গুলির দৃশ্য বেশ দেখা যায়। কাছেই গোরণা গ্রাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমি এবং নাথজী (আমাদের সহযাত্রী চিদম্বরনাথ) গ্রামের মধ্য দিয়া মাইল খানেক দূরে যাইয়া একটি ধারায় বেশ ভাল করিয়া স্নান করিলাম। আয়ার (আমাদের অপর সহযাত্রী কৃষ্ণানন্দ আয়ার) হাত মুখ ধুইয়া কাজ সারিলেন। এদিকে কুলী মাধোয়া চাল, কলাইয়ের ডাল, ঘী ইত্যাদি জিনিস স্থানীয় মুদির দোকান হইতে কিনিয়া লইয়া উপাদেয় খিচুড়ী রান্না করিল। তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া আমরা বেলা ৬টার সময় পথ চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গোরণা হইতে পিথরাগড় অনুমান সাড়ে সাত মাইল। রাস্তা চমৎকার। স্থানে স্থানে রাস্তা এত সমান যে সাইকেল পর্য্যন্ত চালান যাইতে পারে। চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা অতি সুন্দর। বড় গাছপালা বেশী নাই। পাহাড়ের গায়ে সবুজ ফসলের ক্ষেতের সারি চলিয়াছে। আশপাশের গ্রামগুলি দেখিলে মনে হয় যে, এদিককার লোকদের অবস্থা স্বচ্ছল, অন্নাভাব নাই। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মিপাতে পাহাড়গুলি সোনালী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। শীঘ্রই সন্ধ্যার কাল ছায়া চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। আমাদিগকে আরও কয়েক মাইল চলিতে হইবে। সুতরাং আমরা বেশ তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম—যাহাতে সময় মত জায়গায় পৌছিতে পারি। ইতিমধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অন্ধকারে এবং বৃষ্টিতে পথচলা মুস্কিল হইবে মনে করিয়া আমরা লণ্ঠন জ্বালাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাত্রি সাড়ে

নয়টার সময় আমরা ভিজা কাপড়ে পিথরাগড় বাজারে পৌঁছি। আজ আর জামর যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত নয় বিবেচনায় এখানেই রাত্রিবাস করা স্থির হইল। কোথায় আশ্রয় পাওয়া যায়? সবই অপরিচিত। এদিকে জোর বৃষ্টি এবং ঘন অন্ধকার। খানিকটা যাইয়া সম্মুখে একটা বাড়ী দেখিয়া সেখানে রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা গেল। বাড়ীর লোক গুলি আমাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া হয়ত কোন রকম সন্দেহ করিল এবং "এখানে হইবে না" বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। পরে শুনা গেল উহা একটি দেশী মদের ভাটি। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। অতঃপর আরও কিছু দূর যাইয়া, এক গুর্খা হাবিলদারের বাড়ীতে আশ্রয় লওয়া গেল।

পিথরাগড় স্থানটি ভাল করিয়া ঘুরিয়া দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। কারণ, পরদিন অতি সকালে আমরা জামরের দিকে যাত্রা করি। ফিরিবার রাস্তায়ও পিথরাগড়ে শুধু একরাত্রি বাস। তবে যতখানি দেখিয়াছি এবং অপরের কাছে শুনিয়াছি, তাহা লিখিতেছি। পিথরাগড় আলমোড়া জেলার একটি মহকুমা। এখানকার উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৫৩৩৪ ফিট। স্থানটি দেখিতে মন্দ নয়। তবে ভাল পানীয় জল না থাকায় এখানকার স্বাস্থ্য তত ভাল নয়। এখানে একটি পুরাতন ধর্ম্মশালা এবং তাহার নিকটে কতকগুলি ভগ্ন বাড়ী আছে। এই সব বাড়ীতে পূর্ব্বে একদল গুর্খাসৈন্য বাস করিত। অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বাড়ীগুলি বর্ত্তমানে একরকম পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। পিথরাগড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক উঁচু পাহাড়ের মাথায় একটি পুরাতন দুর্গ। দুর্গে সৈন্যদের থাকিবার ব্যারাক এবং কেন্দ্রস্থলে জল রাখিবার একটি বড় চৌবাচ্চা আছে। দুর্গে ইদানীং আরও নূতন নূতন সব বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে—যথা তহশীল, সবডিভিশনেল অফিসারের বাসস্থান ইত্যাদি। সহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অপেক্ষাকৃত একটি উঁচু জায়গায় উইল্কিগড় বলিয়া এক চতুষ্কোণ টাওয়ারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সামান্য দূরে বঙ্কাদেবীর মন্দির। পিথরাগড়ে খ্রীষ্টান মিশনারীদের (মেথডিষ্ট এপিস্কোপেল মিশন) একটি মস্ত আড্ডা আছে। প্রচার এবং

লোকহিতকর সেবাকার্য্যের দ্বারা ইঁহারা বহু পাহাড়ী হিন্দুকে খ্রীষ্টান করিয়াছেন এবং করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমানে জনসাধারণের উপকারের জন্য একটি স্কুল এবং হাঁসপাতাল চালাইতেছেন, ইঁহাদের নিজেদের উপাসনার জন্য গির্জ্জাঘরও আছে। ফিরিবার রাস্তায় ঘটনাচক্রে মিশনারী স্কুলের হেড মাষ্টার এবং স্কুল হষ্টেলের ম্যানেজারের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হইবার সুযোগ হয়। সেই দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমাদের অনেক আলাপ হইল। কথায় কথায় আমরা বলিলাম, "আমরা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যাদি অবতারের ন্যায় মেরী-তনয় যিশুকেও ভক্তি করি। আমাদের অনেক মঠ এবং আশ্রমে যিশুর জন্মোৎসব হইয়া থাকে।" তাঁহারা শুনিয়া কতকটা অবাক হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা হিন্দু সন্ন্যাসী হইয়া কি করিয়া এইরূপ ভাবাপন্ন হইতে পারি? আমরা তখন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলি এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত সকল ধর্ম্মই সত্য, "যত মত তত পথ" ইত্যাদি ধর্ম্মের উদার এবং সার্ব্বজনীন ভাব প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করি। যদিও ইঁহারা আমাদের ভাব গ্রহণ করিতে বিশেষ প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি আমাদের মতের উদারতা দেখিয়া আমাদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ফিরিবার সময় ঐখানেই আমরা রাত্রি বাস এবং আহারাদি করিয়াছিলাম। পিথরাগড়ে একটি ছোটখাট বাজার এবং পোষ্ট-টেলিগ্রাফ আফিস আছে। বাজারে প্রায় সবরকম জিনিষই পাওয়া যায়। পিথরাগড়ে খুব চমৎকার ধান হয়। এদিক ওদিক তাকাইলে পাহাড়ের গায়ে সবুজ ধানের বিস্তর ক্ষেত দেখিতে পাওয়া যায়।

২০শে জুলাই সোমবার খুব সকালে আশ্রয়দাতা হাবিলদারজীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা জামরের দিকে যাত্রা করি। রাস্তা মিশন-কম্পাউণ্ডের পাশ দিয়া গিয়াছে। এখান হইতে জামর অনুমান ৩ মাইল। রাস্তা সমান। রাস্তার দুই ধারে সবুজ ঘাস অথবা ফসলের ক্ষেত। দেখিতে অনেকটা বাঙ্গালা দেশের মত। সাড়ে সাতটার সময় আমরা জামরে পৌঁছি। সেখানে আমাদের পরিচিত এবং ভক্ত এক গুর্খা

পরিবার বাস করেন। আমরা তাঁহাদের বাড়ীতেই উঠি। তাঁহারা আমাদিগকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন এবং বেশ আদর যত্ন করিলেন। একদিন একরাত্রি আমরে কাটাইয়া পরদিন অতি ভোরে আমরা কানালিচ্ছনার দিকে রয়োনা হইলাম। আমাদের পূর্ব্বনিযুক্ত ঘোড়াওয়ালা মাধোয়াই আমাদিগকে ধারচুলা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবে ঠিক হয়। রাস্তা প্রথম সামান্য চড়াই। কতকটা যাইয়া পিথরাগড়ে বড় রাস্তায় পড়া যায়। এই রাস্তায় জায়গায় জায়গায় পাহাড় ধসিয়া পড়িয়াছে। তবে সেই সব স্থান অতিক্রম করা খুব কষ্টকর হয় নাই। সঙ্গে আটা, চিনি এবং ঘী দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার মিঠাই ছিল। তাহা দিয়া মাঝে একবার জলযোগ করা হইল। পাহাড়ে চলার সময় এই মিঠাই সঙ্গে থাকিলে বেশ জলযোগ হয়। কৈলাসের রাস্তায় আমরা এই মিঠাই খুব ব্যবহার করিয়াছি। ইহা অনেকদিন ভাল থাকে, সহজে নষ্ট হয় না। রাস্তা তারপর কোথাও চড়াই কোথাও উৎরাই। ১১ মাইল যাইয়া আমরা সাতগড় গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামটি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। এখানে বহু পরিবারের বাস। সাতগড় হইতে কানালিচ্ছনা চার মাইল। একটার সময় আমরা কানালিচ্ছনায় পৌছি।

কানালিচ্ছনায় একটি স্কুল আছে। স্কুলগৃহের বারান্দায় আমরা আশ্রয় লইলাম। সেদিন স্কুল বন্ধ ছিল। সুতরাং আমাদের সুবিধাই হইয়াছিল। স্কুল গৃহটি সমতল স্থানে অবস্থিত, বেশ বড় এবং রাস্তার পাশেই। সেখান হইতে চারিদিকের দৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কাছেই পুরাতন স্কুল গৃহ। উহা এখন অনেকটা ধর্ম্মশালারূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের রান্নার ব্যবস্থা ঐখানেই করা হয়। একটু নীচে রাস্তার ধারেই চারিটি দোকান আছে। দোকানে চাল, ডাল, মসলা ইত্যাদি সব পাওয়া যায়। কানালিচ্ছনায় পিথরাগড়ের ডিপুটিম্যাজিষ্ট্রেট কুমার খড়্গসিং পালের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আস্কোট হইতে পিথরাগড় যাইতেছিলেন। লোকটি বেশ ভদ্র এবং সাধু-সন্ন্যাসীর উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আমাদের পরণে গেরুয়া কাপড় দেখিয়া তিনি অভিবাদন করিয়া বলেন, "আপনারা খুব

সম্ভব কৈলাস দর্শনে যাইতেছেন। আপনাদের একটু দেরী হইয়া গিয়াছে। আরও আগে আসিলে ভাল হইত। যাক্, তিন জনেই যুবক। সহজেই ঘুরিয়া আসিতে পারিবেন।" কুমার সাহেব বহুবার কৈলাস দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সামান্য আলাপ করিয়া তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া তাড়াতাড়ি কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার কথায় একটু নিরুৎসাহ হইয়াছিলাম। তবে কি আমাদের কৈলাস-দর্শন হইবে না? কেন আরও কিছুদিন পূর্ব্বে আসিলাম না? সব কি পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে? কৈলাসপতির ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। স্কুলের নীচেই একটি বড় ধারা আছে। আমি এবং নাথজী সেখানে যাইয়া বেশ ভাল করিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। আহার শেষ করিতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়। রাত্রি বেশ সুনিদ্রায় কাটে। কানালিচ্ছনার উচ্চতা খুব সম্ভব পিথরাগড় অপেক্ষা বেশী। এখানে নাকি শীতকালে বরফ পড়ে।

২২শে জুলাই ৫টার মধ্যে মালপত্র গুছাইয়া লইয়া আমরা আস্কোট যাত্রা করি। কানালিচ্ছনা হইতে আস্কোট অনুমান ১২।১৩ মাইল। রাস্তার আগাগোড়া চড়াই এবং উৎরাই। প্রায় ৩ মাইল পথ যাইয়া একটি সুদৃশ্য ছোট নদীর ধারে বসিয়া বিশ্রাম এবং জলযোগ করিলাম। এই নদীর উপর একটি পুল আছে। পুল পার হইয়া আমাদিগকে যাইতে হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া চলিতে আমাদের তত কষ্ট হয় নাই। প্রায় ১২টার সময় আমরা আস্কোটে পৌঁছি। এখানে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট-আফিস আছে। টেলিগ্রাফের তার পিথরাগড় পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। আমরা পোষ্টমাষ্টারের ঘরে আশ্রয় লইলাম। লোকটি বেশ ভদ্র। লেখাপড়া জানেন এবং অনেক খবর রাখেন। বাঙ্গলাভাষা অল্পবিস্তর শিখিয়াছেন; মাইকেল, রবিবাবু ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের বই কিছু কিছু পড়িয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মায়াবতী হইতে যাঁহারা কৈলাস গিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল—বলিলেন। আস্কোটে ৪।৫টি

দোকান আছে। একটি উচু পাহাড়ে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের একটি ডাকবাঙ্গালা আছে। আস্কোটের স্থান-বিশেষ হইতে বরফের পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী দিবালাকোটের জঙ্গলে এক অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। পূর্ব্বে ইহারা লোকালয়ে আসিতে ভয় করিত। এখন সে ভয় কতকটা কাটিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা অনেকটা নিঃসঙ্কোচে সকলের সঙ্গে মিশে। আস্কোটের রাজ-



গৌরীনদীর দৃশ্য এবং তদুপরি লৌহসেতু

ওয়াড়াদের বাড়ী এখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য। রাজওয়াড়গণ বাঙ্গলা দেশের ছোটখাট জমিদারদের মত। তবে অনেক বিষয়ে নাকি

ইঁহাদের স্বাধীনতা রহিয়াছে। এখানে রাজওয়াড়াদের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবালয় এবং যাত্রীদের থাকার জন্য ধর্ম্মশালা আছে। ছেলেদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুলও আছে। ফিরিবার সময় এই স্কুলের বারান্দায় আমরা রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। দুপুর বেলার আহার, এখান হইতে ৫ মাইল দূরে জলজীবী যাইয়া হইবে ঠিক করিয়া, সামান্য জলযোগের পর চাল ডাল ইত্যাদি কিনিয়া লইয়া বেলা ৩টার সময় আবার চলিতে আমরা আরম্ভ করি।

৩ মাইল থাড়া উৎরাই করিয়া আমরা গৌরীনদীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কাছেই রাস্তার ডান ধারে একটি সুদৃশ্য জল-প্রপাত দৃষ্টিগোচর হইল। গৌরীনদী বৃহৎ-কায়া এবং বেগবতী। গৌরীর উপরে একটি সাস্‌পেন্‌শন ব্রীজ আছে। সেই ব্রীজ পার হইয়া আরও দুই মাইল চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা জলজীবীতে পৌছিলাম। জলজীবীর একধারে গৌরী, অপর ধারে সুপ্রসিদ্ধা কালী নদী। স্থানটির দৃশ্য অতি মনোরম। এদিকের পাহাড় নিবিড় অরণ্যে শোভিত। জলজীবীতে আমরা আস্কোটের রাজওয়াড়াদের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবালয়ের বারান্দায় আশ্রয় লইলাম। মন্দিরের নীচে গৌরীনদীর চরে কয়েক ঘর মুসলমান বাস করে। জলজীবী পৌছিতেই খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কুলী মাধোয়া বৃষ্টিতে বহু কষ্ট করিয়া কাঠ এবং নদী হইতে জলসংগ্রহ করিয়া আনিয়া খিচুড়ী এবং তরকারী প্রস্তুত করিল। আহার শেষ করিয়া নিদ্রা যাইতে আমাদের অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)   বিবিদিষানন্দ

বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শনে

হে রাজ-সন্ন্যাসী!

এই পুণ্য প্রভাতের স্বর্ণপ্রভ আলোকের রাশি
যে আনন্দ বার্ত্তা বহি আনিয়াছে মোর গৃহদ্বারে,
তাহারে বরিয়া লই জীবনের অন্ধ কারাগারে।
শত শত বর্ষ পূর্ব্বে যে আলোক ললাটে তোমার
উদ্ভাসিল বোধিমূলে যে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ সাধনার,
মনে হয় সে আলোর ক্ষুদ্র এক অগ্নিময় কণা,
আমার জীবন-যজ্ঞে জ্বালিয়াছে জ্বলন্ত সাধনা!

আজ মনে হয়,

স্বর্ণ সরোজের সম প্রস্ফুটিবে আমার হৃদয়!
আবর্জ্জনা-গ্লানি যত চরিত্রের কলুষ সম্ভার
কামনার পঙ্কমাখি করেছিনু যেই অহঙ্কার,
আজ তাহা চূর্ণ হবে তব ধ্যানমূর্ত্তি দরশনে
এ জীবন ধন্য হবে তব পদযুগ পরশনে!
উচ্ছ্বসিত হয়েছে কি করুণার মহাপারাবার
প্রেমের প্লাবন এলো যৌবনের পদ্মায় আমার?

ওগো তথাগত!

বল, বল আজি মোর এসেছে কি সেই অনাহত
আনন্দের মহাদিন, যেদিন এ জীবন আমার
লঙ্ঘিয়া সংসারসীমা হিংসাদুষ্ট বিষের আগার
অপার্থিব ধ্যানরসে হৃদয়ের গুপ্ত নিকেতনে
প্রেমের সাধনা লাগি মগ্ন রবে গভীর গহনে!
যেথায় মানব-আত্মা জগতের সর্ব্ব সত্তা ভুলি
প্রবুদ্ধ চৈতন্য সাথে চিরদিন করে কোলাকুলি,—

সে নির্জ্জন বনে—
আমারে সন্ন্যাস দাও জগতের কল্যাণ সাধনে !
না জানি সে, কি আনন্দে হিমাদ্রির নিভৃত কন্দরে
বসি শান্ত ধ্যানাসনে বর্ষ বর্ষ যুগ যুগ ধরে
অবহেলি গ্রীষ্মতাপ ঝড়ঝঞ্ঝা শীত কুজ্ঝটিকা
আপনার মর্ম্মমাঝে নিশিদিন সাধনার শিখা
জ্বালাইয়া সযতনে, একদিন অকস্মাৎ শেষে
আপনারে পূর্ণ হেরি মানবের মুক্তির উদ্দেশে !
ওগো কারুণিক !
কি মন্ত্র শিখিয়াছিলে ? এশিয়ার যাহে দশদিক্
দশবাহু বাড়াইয়া চেয়েছিল করিতে গ্রহণ,
তোমার অহিংসাবাণী করুণার ব্যগ্র নিবেদন !
কঠিন পাষাণ শৈল কারুণ্যের ঝরণায় গলি,
প্রশান্ত সমুদ্র মাঝে দেখা দিল অশ্রুর লহরি !
মরুর বুকেতে এলো কুসুমের সৌন্দর্য্য উদ্যান
সম্রাটের কণ্ঠে এলো দানব্রত বৈরাগ্যের গান।
হে মহাভিক্ষুক !
দাও, দাও, মোরে সেই তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যের দুখ,—
যেই দুখে মাগে নর পীড়িতের ব্যথা অবসান,
ভিক্ষা মাগে কীট হতে মানবের পরম কল্যাণ।
হৃদয়ের ভিক্ষাপাত্র মানবের দ্বারে দ্বারে রাখি
হে ভিক্ষু-সম্রাট, ইচ্ছা হয় সকলেরে ডাকি
বলি আজ উচ্চৈঃস্বরে, "শুন, শুন, দাতা আছ কেবা
ভিক্ষা দাও ভালবাসা, ভিক্ষা দাও জগতের সেবা !
ভেদাভেদ নাই,
এই মহাধর্ম্মসংঘে হবে হবে সকলের ঠাঁই !
আমি বুদ্ধ-অনুচর—যেই বুদ্ধ প্রেমের সাধনে
বিসর্জ্জিল সুখ-ভোগ ঐশ্বর্য্য ও রাজসিংহাসনে !

মানবের দুঃখ যারে পরাইল ত্যাগের মুকুট
ভিখারী করিল যারে বিভবের বিষ কালকূট ;—
আমি তার দীন শিষ্য, আমি সেই প্রেম-উপাসক
জগতের নরনারী, আমি যে গো তোদের সেবক !"
মন্ত্র করি পাঠ,
তব সিংহাসন-তলে দাঁড়াব হে তাপস সম্রাট !
কর, কর আশীর্ব্বাদ দাও মোরে উত্থানের বল,
তব সংঘ, তব ধর্ম্ম হোক্ মোর জীবন সম্বল !
ওই ঊর্দ্ধে নীলাকাশ, ওই দূরে প্রভাত তপন
সকলেরে সাক্ষী মানি এ জীবন সেই বিসর্জ্জন।
ব্যর্থ যদি হয় ব্রত জন্ম যেন লই বার বার,
মানবের প্রেমমাঝে লভি যেন নির্ব্বাণ আমার !

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সমালোচনা

বিচিত্রা—মাসিক পত্র, শ্রাবণ, ১৩৩৪, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বার্ষিক মূল্য সাড়ে ছয় টাকা, সম্পাদক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কার্য্যালয় ৫১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সংখ্যায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হাসির পাথেয়' 'মধুমঞ্জরী' 'নীলমণি লতা' 'কুরচি' এই চারিটি কবিতা, 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' নামক তাঁহার প্রবন্ধ, 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য-ছন্দের 'পাহাড়িয়া,' শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'ভাব্‌বার কথা,' শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সতী' (গল্প), শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্তরাগ' (ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস), শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচীর 'ইন্দোচীন ভ্রমণ-কাহিনী,' শ্রীশিশির কুমার মিত্রের 'বেতার গ্রাহক-যন্ত্র' (প্রবন্ধ) 'সহযোগী সাহিত্য' প্রভৃতি

অনেক পড়িবার, শিখিবার ও উপভোগ করিবার জিনিষ আছে। তাহা ছাড়া শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ত্রিবর্ণ চিত্র 'মায়ের কোল' 'বিচিত্রার' সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

আশা করি, এই নবীন মাসিকপত্র বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে।

প্রণব—ত্রৈমাসিক পত্র, প্রথম বর্ষ, বৈশাখ, দ্বিতীয় সংখ্যা। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ, প্রাপ্তিস্থান ১৬২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পত্রিকাখানি "ভারত সেবাশ্রম সংঘের" মুখপত্র। স্বামী প্রণবানন্দের পরিচালনায় এই সন্ন্যাসি-সংঘ বাংলার বহুস্থানে এবং বাংলার বাহিরেও 'লোকহিতায়' কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন।

'প্রণব' পত্রিকাও এইরূপ লোক-কল্যাণ-মানসে প্রকাশিত। আলোচ্য সংখ্যায় অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবং সুখপাঠ্য কবিতার সমাবেশ হইয়াছে।

যে উদ্দেশ্যে ইহার জন্ম, সেই শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক।

রসাল—শ্রীতারাকান্ত কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত, ৩৮।১নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে পি, এম বাক্‌চি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য বার আনা। এই পুস্তকে ছেলে-মেয়েদের উপযোগী শিক্ষাপ্রদ পঁইত্রিশটি ছোট গল্প আছে। ভাষা মার্জ্জিত অথচ সহজবোধ্য। কাগজ, বাঁধাই ও ছাপা ভাল।

বামাক্ষেপা—'আলোচনা' সম্পাদক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। প্রকাশক পি, এম বাক্‌চী এণ্ড কোং।

সুপ্রসিদ্ধ সাধু বামাক্ষেপার নাম বাংলাদেশে সকলেই জানেন। গ্রন্থকার বহু কষ্টে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে উপায়ান্তর না থাকায় এই কার্য্যে তাঁহাকে অনেক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তথাপি তিনি সিদ্ধপুরুষের জীবনের অলৌকিক ঘটনাসমূহ যথাসম্ভব পরিবর্জ্জন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশ শক্তি-সাধনার স্থান। তাই বাঙ্গালী নরনারীকে এই শক্তি-সাধকের অপূর্ব্ব জীবনেতিহাসের সহিত পরিচিত হইতে অনুরোধ করি।

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম—শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ এম্, বি প্রণীত। পুস্তকখানি নবযুগের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের জন্য নবপুরাণস্বরূপ। বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি নানা শাস্ত্র নিঙড়াইয়া উহাদের সার মর্ম্ম লইয়া জীবন, প্রকৃতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাকথা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত আলোচিত হইয়াছে। নানা স্থলে ইহার নূতন ভাব এবং নানা পৌরাণিক উপাখ্যানের নূতন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া, অনেকে চিন্তা করিবার সুযোগ পাইবেন।

নিবেদন

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী স্বর্গীয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের নিকট 'লক্ষ্মী দিদি' নামে সুপরিচিত। মহাপ্রয়াণের দুই বৎসর আগে পুরীধামে বাস করিবার জন্য তিনি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার ভক্তগণ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত স্বর্গদ্বারস্থ 'লক্ষ্মী নিকেতনে' প্রায় দুই বৎসরকাল পরম শান্তিতে বাস করিয়া গত ১২ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৩২ সাল, ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ সালে ঐ স্থানেই অমরধামে যাত্রা করেন। তাই আমরা উক্তস্থানে তাঁহার স্মৃতি-মন্দির আরম্ভ করিয়াছি এবং এই কার্য্যে ভক্তবৃন্দের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী পাল, লক্ষ্মী-নিকেতন, স্বর্গদ্বার, পুরী; অথবা—সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শিষ্যবৃন্দ



স্বামী সারদানন্দ

বন্দনা

স্থাপকঃ সর্ব্বধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্ম-স্বরূপকঃ।
আচার্য্যানাং মহাচার্য্যো রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥
যথাগ্নের্দাহিকাশক্তী রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্ ॥
পরতত্ত্বে সদা লীনো রামকৃষ্ণ-সমাজ্ঞয়া।
যো ধর্ম্মস্থাপনায়াতো বীরেশং তং নমাম্যহম্ ॥
কালিন্দী-ফুল্ল-কমলে মাধবেন ক্রীড়ারত।
ব্রহ্মানন্দ নমস্তুভ্যং সদ্গুরো লোকনায়ক ॥
যোগানন্দঃ প্রেমানন্দশ্চান্যে বৈ যে চ পার্ষদাঃ।
রামকৃষ্ণগতপ্রাণাঃ সর্ব্বান্ তান্ প্রণমাম্যহম্ ॥

স্বামী সারদানন্দ

স্বামী শিবানন্দের পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণম্ বেলুড় মঠ

২৭।৮।২৭

শ্রীমান—

তোমার পত্র পাইলাম। শরৎ মহারাজ চলিয়া গেলেন, আমরাও যাইব। ঠাকুর যখন যাহাকে ডাকিবেন—যাইতে হইবে; আমরা যে তৈয়ার হইয়া আছি। কিন্তু ঠাকুরের সহিত, কি আমাদের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ কি স্থূল দেহ লইয়া? তাহা যদি হইত তাহা হইলে ত ঠাকুরের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইত। কিন্তু যত দিন যাইতেছে, দেখিতে পাইতেছনা ভক্ত এবং অভক্তের হৃদয়ে তাঁহার অস্তিত্ব বিরাট এবং বিরাটতর ভাবে বোধ হইতেছে এবং সম্বন্ধ দৃঢ় এবং দৃঢ়তর হইতেছে। তেমনি, শরৎ মহারাজ গেছেন কোথায়? তিনি এতদিন একটি শরীরে আবদ্ধ ছিলেন এখন হইতে তাঁহার পূত পবিত্র চরিত্র, তাঁহার প্রেম ভালবাসা, বিশ্বাস ভক্তি, ধীর স্থির বুদ্ধি, অচল অটল সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য্য তোমাদের সকলের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবে—তাঁহার কৃপায়। তোমরা তাঁহাকে চোখে দেখিয়া যে-আনন্দ পাইতে এখন হইতে তাঁহার চরিত্র ধ্যানে আরও শতগুণ আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশীর্ব্বাদ এখন সদাসর্ব্বদা অনুভব করিবে। যখনই ইচ্ছা করিবে আর কলিকাতায় নয়, অতি নিকটে—হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁহার দর্শন পাইবে। কোন ভয় নাই; তাঁহার শরীর-ত্যাগে ঠাকুরের কৃপায় তিনি তোমাদের আরও আপনার জন হইয়াছেন। অধিক আর কি লিখিব; তাঁহার কৃপায় তোমরা ধীরে ধীরে সব বুঝিতে পারিবে। ইতি—

তোমাদের চিরশুভানুধ্যায়ী—

শ্রীশিবানন্দ

অদর্শনে

জ্ঞান-সিন্ধু আলোড়িয়া
উদিলা যে জ্যোতির্ম্ময় রুদ্র সুবিশাল
ঘূর্ণ্যমান নৃত্যে তার
ছন্দে ছন্দে সৃষ্টি চক্র উঠিল চপল
হে সত্ত্ব স্থির! তুমি তার নাভি।
যুগ-চক্র ঘুরে অনিবার
মুহুর্মুহু ধ্বংস আঁকে জীর্ণতার বুকে
প্রতীচ্য প্রাচীর কোলে
নব শিশু জেগে উঠে সুখে
কৈশোর হিল্লোলে দোলে
মাতৃ-কণ্ঠ ধরি, উজল নয়ন,
পুরাতন দুঃখ মরে শোকে।
সে আনন্দে তোমারি স্ফুরণ
হে আনন্দ সাথি!

জ্ঞান ভক্তি মূর্ত্ত দেহ ধরি
পলে পলে দধীচির মত
স্থূল দেহ দানিলে লোকেরে
আমিত্বেরে রাখিলে আবরি,
মানবের হে মহা-সেবক!
অভিমান-হীন।
নারায়ণ আপনি যাচিয়া
দিয়াছেন বর তোমা

কাম ক্রোধ যাইবে দূরিয়া।
তাই তব স্বভাব মধুর
মধুর হইতে মধুময়
স্পর্শে তব
গরল অমৃত হয়
স্বভাব ত্যজিয়া।

* *

—"থাকিতে নারিব কভু তোমারে ছাড়িয়া"
মিথ্যা কথা, কহেছ প্রলাপ
প্রবঞ্চক মন!
মিথ্যারে ঢাকিয়া আবরণে
সত্যের করেছ অপলাপ
"থাকিতে নারিব কভু"—
হাসি পায়—
ঠিক যেন অন্ধ নর-নারীর আলাপ।
রে বাতুল মন!
স্বার্থের নিগড়
বাঁধিতে পারে কি কভু
নিঃস্বার্থ হৃদয়?
অসম্ভব সম্ভব কি হয়?
অসীম সসীমে পড়ে ধরা
সে যে কাব্য কথা!
যথার্থতা কোথা তার?
সত্য কভু অসত্যেতে রয়?
"স্তিমিত চিৎ সিন্ধু ভেদি
"উঠিল যে জ্যোতিঃ ঘন
মুরতি উদার

সে রাজার মন্ত্রী তুমি
অসত্যের মাঝে বল
রবে কত কাল,
আশ্রিত-দয়াল !
অশনা-পিপাসা-ক্লিষ্ট
হে মর্ত্ত্য মানব !
রে অশিষ্ট !
তাহারে রাখিবে তুমি ধরে !
আবাহন আসিয়াছে যার
লীলাধাম হতে
যার নিমন্ত্রন প্রতি লোকে লোকে
যার জয় গান ঝরিতেছে
প্রতি তারকার কিরণ-সম্পাতে ;
মহাশক্তি বক্ষঃস্থল উঠিতেছে দুলি
উচ্ছ্বসিত স্নেহাধারে ফুলি
তাহারে রাখিবে তুমি
মাটির পিঞ্জর মাঝে
অন্ধকূপে ঝাঁপি ?

*　　*

সব জানি—
সব মানি—
তবু কেন আঁখি হয় স্থির !
মূক ভাষা স্তব্ধ হয়ে
ভেসে ওঠে স্বপ্ন সম
মৌন সিন্ধু নীর !
অচঞ্চল সুখদুখহীন
কিন্তু—
ঐ ধীরে ধীরে বয়ে আসে

স্মৃতির হিল্লোল
নীরবে কম্পন হানি
তুলিতেছে সুরের কল্লোল
উদ্বেলিত অন্তর-সাগর
ফুলিয়া দুলিয়া উঠে বুকে
কার দুখে
তরঙ্গেতে ছুটে অশ্রু নীর ?

*　　　*

অনন্তের মোরা যাত্রিদল
কেমনে চলিব পথে বল ?
কণ্টক চুম্বন
পাই সুধু প্রতিদান,
গুপ্ত কীট দংশে অনিবার,
আঁধারে ঢাকিয়া আঁধিয়ার
বহ্নি-ফণী ঢালে তার জ্বালা
অশ্রু ঢালে শ্রাবণের ধারা
যাত্রিচক্ষু হয় দিশে হারা।

*　　　*

হে তিতিক্ষিত বীর !
ধ্রুব সম সত্যে স্থির
ধৈর্য্য তব নত করে শির সহ্যাদ্রির।
কহি তাই আজ মহারাজ !
বঞ্চিত করনি কারে কভু
বঞ্চিত হবনা কভু আজি
এখনও দ্যুলোক হতে ধীরে
ঝরুক করুণা ধারা প্রভু !

বাসুদেবানন্দ

স্বামী সারদানন্দ

(যেমন দেখিয়াছি)

ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে দুর্ব্বল ব্যক্তিও মহৎ কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন ছোটখাট কাজগুলিতে যিনি উদারতা, সহনশীলতা, পর-মত-সহিষ্ণুতা, হৃদয়বত্তা ও পবিত্রতা দেখাইতে পারেন তিনিই প্রকৃত মহৎ—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে স্বামী সারদানন্দ মহত্তম ছিলেন।

বিংশতি বৎসর ধরিয়া দেখিতেছিলাম, এই সবল স্থূলকায় পুরুষসিংহ কিছুমাত্র ভাবপ্রবণতা না দেখাইয়া, অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অন্তঃপ্রেম প্রবাহে যত বড় বুকের পাটা ততোধিক হৃদয় লইয়া স্বামিজীর নির্দ্দিষ্ট পথে ধীর গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। স্বামী সারদানন্দের দৃঢ়-তার সহিত অগ্রগমন-নীতি দেখিয়া স্বতঃই মনে হইত, অবনত ভারতে কর্ম্মযোগ প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর এমন একনিষ্ঠ চিরবিশ্বস্ত সহকর্ম্মী স্বামিজীর অপর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রমুখ স্বামিজীর গুরুভ্রাতাগণ সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ বিশেষ ভাব আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া-ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন,—কর্ম্মবিমুখ তমসাচ্ছন্ন ভারতে শক্তিপূজার প্রেরণা প্রদান করিতে, সেবা ও সহানু-ভূতি সহায়ে দরিদ্র নর-নারায়ণকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিতে।

প্রকৃত কর্ম্মীর যে সকল গুণ থাকা একান্তই প্রয়োজন সেই সকল গুণ তাঁহাতে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত ছিল। এমন হৃদয়বত্তা, পবিত্রতার সহিত একাধারে এমন প্রাণভরা সহানুভূতি, কর্ম্মে অদম্য উৎসাহ, কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে অচল অটল স্বামী সারদানন্দ ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিয়াছি এমন মূর্ত্তি—কৈ মনে ত পড়ে না!

সংহতি গঠন করিবার পক্ষে যে সকল গুণ অতি আবশ্যক

তাহা তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে ছিল। তিনি পরনিন্দা-বিমুখতা, পর-মত-সহিষ্ণুতা, অসীম সহনশীলতা, আশ্রিত-বাৎসল্য—এই সকল সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দের যে সকল দোষে সংহতি-বিচ্ছেদ ঘটে তাহার সামান্য মাত্রও স্বামী সারদানন্দে ছিল না। তিনি কাহারও কথা শুনিয়া অপরের প্রতি ভিন্ন-ধারণা পোষণ করিতেন না, 'এক তরফা' কথা শুনিয়া নিজমত ত্যাগ করিয়া কখন কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধ হইতেন না।

সে খুব বেশী দিনের কথা নহে, তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) কাশীধামে আছেন, কলিকাতা হইতে স্বামী সারদানন্দও কাশী গিয়াছেন। উভয় গুরুভ্রাতা কথা বলিতেছেন, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি অপর একজনের নামে দোষ উদ্‌ঘোষণে তৎপর হইলে একজন সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "প্রমাণ?"

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমার কিন্তু একথা বিশ্বাস হয়।"

যিনি 'প্রমাণ' বলিয়াছিলেন তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল যাইতে না যাইতেই চিরমধুর স্বরে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "হরি মহারাজ, আমি কিন্তু একথা বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।"

তখন হরি মহারাজ বলিলেন, "আমাদের কেমন স্বভাব—কারু দোষের কথা শুন্‌লেই বিশ্বাস করে থাকি, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌ছি—তুমি তা করনা।"

আত্মপ্রশংসা শুনিলে স্বামী সারদানন্দ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতেন। বেগতিক দেখিয়া তিনি বলিলেন, "স্বামিজী আমাকে 'এক কাণে কথা শুনবে, অপর কাণ দিয়ে তা বের করে দেবে'—এই আদেশ করেছিলেন। আমি তাঁর আদেশ পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি।"

তখন সে প্রসঙ্গ থামিয়া অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। আত্মপ্রশংসা শুনিবার দায় হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এই সময় কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমের নূতন ব্যবস্থাদি হইবার

কথা চলিয়াছে। স্বামী সারদানন্দ সকলকে তাঁহার নিকট নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। একদিন হরি মহারাজের ঘরে চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ) তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিতেছিলেন। চারুবাবুর কথা বলিবার সময় একটি 'মুদ্রাদোষ' ছিল। তিনি কথায় কথায় "কি বলেন মশাই" বলিতেন। কখন কখন "কি বলেন দুর্লভবাবু"ও বলিয়া ফেলিতেন। স্বামী সারদানন্দ সকলের কথা চিরদিন শুনিয়া যাইতেন। সে কথার মধ্যে কোন প্রশ্ন ভিন্ন কখন "হুঁ" "না" বলিতেন না, যাহাতে কেহ মনে করিতে পাবে তিনি commit (স্বীকার) করিতেছেন। সুতরাং যখন চারুবাবু অভ্যাস বশতঃ "কি বলেন মশাই" বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন স্বামী সারদানন্দ বেশ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শেষে আর "কি বলেন মশাই" বরদস্ত করিতে না পারিয়া, বলিয়া ফেলিলেন, "যা বলবার তুমিই ত বলছো—মশাই আবার কি বলবেন ?"

স্বামী সারদানন্দ জানিতেন না, চারুবাবুর এইরূপ মুদ্রাদোষ ছিল। কিন্তু চারুবাবুও ঐ কথা শুনিয়া কেমন nervous হইয়া পড়িলেন এবং একান্ত নিরুপায় হইয়া ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

হরি মহারাজ বালকের ন্যায় হাসিয়া উঠিলেন। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) সেই হাসির কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন জনৈক সন্ন্যাসী শরৎ মহারাজকে চারুবাবুর 'মুদ্রাদোষের' কথা বলিলেন। তিনি "কে জানে বাপু"—বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

এই ঘটনার পরে একদিন চারুবাবুর সহিত শরৎ মহারাজের কথা হইয়াছিল। সেদিনও অভ্যাসবশতঃ "কি বলেন মশাই" চারুবাবু বলিলেও তিনি পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া চারুবাবুকে সস্নেহে এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে চারুবাবুর মনে কোন ক্ষোভই রহিল না। শরৎ মহারাজ কিন্তু গত দিনের কথা একটি বারের জন্যও উল্লেখ করিলেন না।

সে বৎসর স্বামী সারদানন্দ কাশীধামে যাইয়া সেবাশ্রমের কর্ম্মীদের বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বের তুলনায় কাজ শত গুণ বাড়িয়াছে—এখন এক-জনের উপরে নির্ভর করিয়া এত বড় কাজ চালাইতে সাহস করা উচিত নহে—সুতরাং আমি তোমাদের নিকট নূতন কর্ম্মপদ্ধতির (plan of re-organisation) জন্য মতামত জানিতে চাই।"

এই কথার পরে অনেকে আসিয়া শরৎ মহারাজের নিকট মৌখিক মতামত দিয়াছিলেন। মাত্র তিনজন স্বেচ্ছায় ও একজন শরৎ মহা-রাজের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া লিখিত কর্ম্মপদ্ধতি দাখিল করিয়াছিলেন। এপ্রসঙ্গে যত কথা হইত তিনি তাহা নিঃশব্দে শুনিয়া যাইতেন। কোন কথার দরুণ তাঁহার অপরের প্রতি বিশ্বাস বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইতে দেখি নাই। কিংবা যেদিন সংস্কার-পন্থীদেরই একজন শরৎ মহারাজের নূতন ব্যবস্থা সমর্থন না করিয়া প্রচলিত ব্যবস্থাই সমর্থন করিয়াছিলেন—তখনও মুহূর্ত্তের জন্য কেহ তাঁহাকে বিন্দু মাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দেখেন নাই।

শরৎ মহারাজ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিলেন। মাসিক দুইশত টাকা বেতনে একজন Resident Doctor (হাসপাতালের ডাক্তার) নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করাতে তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা এতদিন পরে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। সেবাশ্রম হইতে শরৎ মহারাজকে জানান হয়—"যে ভাবে কাজ চলিতেছে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে একবার শ্রীশ্রীমহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) জানান প্রয়োজন ; তাঁহার মত হইলে আমাদের আর কোন অমত নাই।" যে কেহ সংস্কার-কামী হইয়া সামান্য বাধা প্রাপ্তে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু, ইহাতে স্বামী সারদানন্দ আন্তরিক আনন্দের সহিত বলিয়াছেন, "তোমরা ঠিক বলেছো, মহারাজ আমাদের সকলের ওপরে—তিনি যা বলবেন তাই বলবৎ থাকবে।"

যথা সময়ে সেবাশ্রম হইতে ভুবনেশ্বরে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সকল কথা নিবেদন করা হইল। উত্তর আসিল—"শরৎ মহারাজ যাহা করবেন

তাহা আমারই ব্যবস্থা বলে জানবে।" কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি পরিবর্ত্তনের (reform) একটা ধারা নির্দ্দেশ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার পূর্ব্বের ন্যায় চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ) প্রভৃতির হস্তেই ন্যস্ত করিলেন।

সেবাশ্রমের প্রথম পত্তনের সময় 'রামাপুরা'তে ভাঙ্গা ভাড়া বাড়ীতে যে পরিমাণ কাজ ছিল, আলোচ্য সময়ে আশ্রমের কার্য্য তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বহু নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হওয়ায়, মেডিকেল কলেজে পড়িবার কালীন যে সকল ভাল ব্যবস্থা শরৎ মহারাজ দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম ভাবে কাজের বিভাগ—পুরুষ রোগী একদিকে, মেয়ে রোগী সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে—রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; আর এই ব্যবস্থা কর্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটি Working Committee (কার্য্যকরী সভা) গঠন করিলেন। ইহার সভ্যগণ কর্ম্মীদের মধ্য হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন কর্ত্তৃক মনোনীত হয়। তদবধি কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমের সকল ব্যবস্থাদি, কর্ম্মীদের কার্য্যকরী সভা দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

এই ঘটনার কয়েক বৎসব পূর্ব্বে যখন পূজনীয় হরি মহারাজ পুরী হইতে অসুখ লইয়া 'উদ্বোধনে' চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন শ্রীশ্রীমহারাজও 'উদ্বোধনে' থাকিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট শরৎ মহারাজ বলিতেছিলেন, "মহারাজ এইবার আমাকে অব্যাহতি দাও।" শ্রীশ্রীমহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, শরৎ?" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "সেদিন উ—কে গালাগালি করেছিলুম—কেন সে আমাকে না বলে বৃন্দাবন ছেড়ে এলো? উ—কিন্তু বলেছিল, চিঠি দিয়েছি। আমি সে কথা মানতে পারি নি। আজ দেখলুম কেমন করে সেই চিঠিখানা পুরাণ চিঠির মধ্যে মিশে গেছে। সে সত্যি কথাই বলেছিল —আমিই অযথা তাকে গাল দিয়েছি। উ—কে একদিন আনিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।" মহারাজ বলিলেন, "অতটা না করলেও চল্‌বে।" কিন্তু সে কথা শরৎ মহারাজ রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী সময়ে উ—র নিকট নিজের ভুলের জন্য সত্যই তিনি ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

আমরা জানিতাম, কর্তৃপক্ষের কখনও ভুল স্বীকার করিতে নাই; এক্ষেত্রে কিন্তু দেখিলাম, স্বামী সারদানন্দ ভুল স্বীকার করিলেন ও ক্ষমাও চাহিলেন। চিরদিন তিনি মানুষের সহিত মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। পদগৌরবে কদাচ অপরকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। কদাচ এমন কথা কাহাকেও বলেন নাই যাহাতে তাহার আশা ভঙ্গ কিংবা তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

যাহারা কর্ম্ম ভালবাসিত শরৎ মহারাজ তাহাদের কাজ লক্ষ্য করিতেন এবং উত্তোরত্তর অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া সেবকের আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করিতে সহায়তা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনে ইঁহার কৃপায় অনেক 'মূক' 'বাচাল' হইয়াছে, অনেক 'পঙ্গু' 'গিরি লঙ্ঘন' করিয়াছে। যে ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই অন্তরের সহিত ইঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত শিষ্য-স্থানীয় ও শিষ্যদের সহিত ব্যবহার করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

খড়দহ—বিশ্বাসদের পরিবারে যোগীন্দ্র মোহিনীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি স্ত্রী-ভক্তগণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতমা কৃপাপাত্রী ছিলেন। উত্তর কালে ভক্তগণের নিকট যোগীন্দ্র মোহিনী—'যোগীন মা' নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন এবং যতদিন শ্রীশ্রীমা জীবিতা ছিলেন, যোগীন মা ও গোলাপ মা মায়ের সেবিকারূপে 'উদ্বোধনে' মায়ের নিকট থাকিতেন।

যোগীন মার মেয়েব চারিটি পুত্র। বড় নাতিটির মাথা খারাপ হাওয়ার ফলে কনিষ্ঠ তিনটির লেখা পড়া কেমন করিয়া চলিবে ভাবিয়া যখন তিনি কূল কিনারা কিছু করিতে পারিলেন না তখন শরৎ মহারাজ কনিষ্ঠ তিনটিকে 'উদ্বোধনে' আপনার নিকট রাখিলেন। 'রাখিলেন' বলিলেই সকল কথা ঠিক বলা হয় না। তিনি নিজের শয়নঘরে পৃথক বিছানায় ছেলে তিনটিকে নিত্য শোয়াইতেন এবং পাছে তাহাদের ঠাণ্ডা লাগে এই আশঙ্কায় গরমের দিনেও ঘরের জানালা খুলিতেন না। নিজে তিনি স্থূলকায় ছিলেন, গরম সহ্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ঐ ছেলে তিনটির জন্য গ্রীষ্মের রাত্রে তিনি যে-অসহ্য গরম সহ্য করিয়াছেন—একথা বাহিরের লোক ত দূরের কথা আমাদের মধ্যে কয়জনই বা সে সংবাদ রাখেন ?

এমন পলে পলে নিজেকে পরের জন্য বিলাইয়া দিতে স্বামী সারদানন্দ অতুলনীয় ছিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজের দেহরক্ষার পরে মঠের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ এতদূর পর্য্যন্ত ভাবিতেন, স্বামী সারদানন্দ অর্থে—মঠ ও মিশন। শ্রীশ্রীমহারাজ জীবনব্যাপী মঠ-মিশনের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, আর স্বামী সারদানন্দ জীবনব্যাপী উহার সম্পাদক ছিলেন।

আমরা শ্রীশ্রীমহারাজকে একাধিকবার বলিতে শুনিয়াছি, "সকলেই চায় আমি কাজ করি, এক শরৎ চায় কিসে আমি শান্তিতে থাকি। শরৎ চিরদিন আমার হাতের কাজ টেনে নিয়ে করেছে।" পূজনীয় মহাপুরুষের (শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী) নিকট আমরা শুনিয়াছি, শরৎ মহারাজ সকলের কাজ একা করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহী ছিলেন ; এবং একলার পক্ষে যতখানি বেশী কাজ করা সম্ভব তিনি তাহা করিতেন।" পূজনীয় কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) বলেন, "আমার পায়ে যখন পোকা হয়েছিল তখন শরৎ তিন মাস অক্লান্ত সেবা করে আমার প্রাণ দান করেছিল।" আজও পূজনীয়া গৌর মা জীবিতা ; যে কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন, তাঁহার যখন ভীষণ বসন্ত রোগ হইয়াছিল তখন কি ভাবে স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের অগ্রজ শ্রীযুক্ত তুলসীরাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা জানিতে পারিব, দারুণ যক্ষ্মারোগে দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর তাঁহাদের গুরুপুত্র 'ফকিরের' শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া স্বামী সারদানন্দ কি রকম প্রাণ দিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। চিরহৃদয়বান স্বামী সারদানন্দ তখন বলিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু এত স্থূল-কায় ছিলেন না।

কি নিজ গুরু-ভ্রাতাগণের রোগ-শয্যায়, কি শিষ্য-স্থানীয় সন্ন্যাসীদের রোগে, স্বামী সারদানন্দ এক অদ্ভুত অলৌকিক পুরুষ

ছিলেন। কেমন করিয়া যে তিনি রোগীকে নিজ বশে আনিয়া ফেলিতেন তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয় ছিল।

শ্রীশ্রীমহারাজের একবার 'টাইফয়েড' জ্বর হয়। আরোগ্য লাভ করিয়া মহারাজ স্নানের নামও করেন না, বলরাম বাবুর বাড়ী হইতে গঙ্গার ধার—এই সামান্য পথটুকু বেড়াইতে যাইবার উৎসাহও দেখান না। মহারাজের এ অবস্থা দেখিয়া সকলেই প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ প্রমাদও গণিলেন না, ধৈর্য্যও হারাইলেন না। শেষে শরৎ মহারাজের ধৈর্য্যই জয়যুক্ত হইল। মহারাজ স্নানও করিলেন, গাড়ীতে গঙ্গার ধারে যাইয়া বেড়াইতেও আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে যে কাণ্ড নিত্য ঘটিত—মহারাজও যাইবেন না, শরৎ মহারাজও ছাড়িবেন না,—তাহা বলিয়া আর কি হইবে?

সে বেশী দিনের কথা নহে, জনৈক সন্ন্যাসী কালাজ্বরে ভুগিতেছিল। 'উদ্বোধনে' থাকিয়া তাহার চিকিৎসা চলিতেছিল। যেদিন তাহার অসুখ খুব বাড়িয়া গেল, সকলেই উহার জীবনে হতাশ হইল। সে বায়না ধরিল—"হরিনাম করবো আর ডাব খাবো;" কিছুতেই সে ইন্‌জেকশন্ লইবে না। তখন শরৎ মহারাজ আসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। যেমন করিয়া ওঝা সাপের বিষ ঝাড়িয়া থাকে তেমনি করিয়া তিনি তাহাকে পোষ মানাইয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হরিনাম করা আর ডাবের জল পান করার—বহু প্রশংসা করিয়া তবে তাহাকে তিনি ইন্‌জেকশনে রাজী করিতে পারিয়াছিলেন। সে যাত্রা সে বাঁচিয়া গেল।

সম্প্রতি জনৈক সাধুর 'বেয়াড়া' ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ক্রমাগত কাসি, দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে। একান্ত অস্থির হইয়া শরৎ মহারাজকে ডাকিয়া আনিতে বলিল। শরৎ মহারাজ ঐ স্থূল দেহ লইয়া, একটি হাঁটু বিছানার উপর রাখিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর রয়েছেন, মা

আছেন, ভয় কিরে ?” তাহার অবস্থা খুব খারাপই হইয়াছিল, কিন্তু ঐ স্পর্শে ও “ঠাকুর, মা আছেন”—এই কথা শুনিয়া সে কিন্তু শান্ত হইয়া গেল। তাহার স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল, অসুখ নাই বলিলেও চলিত। এহেন লোকের ‘বেয়াড়া’ ম্যালেরিয়া জ্বর ও কাসিতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম, সুতরাং সময়ে সময়ে সে এত অধৈর্য্য হইয়া উঠিত যে, কেহ তাহার সেবা করিতে ভরসা করিতেছে না শুনিয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, “যা, তোদের সেবা করতে হবে না, আমি অথর্ব্ব মানুষ যা পারি সেবা করবো।” পরে সেবকগণ তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিল। কয়েক দিনের ভিতর সে ভাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই ঘটনার মাস কয়েক পূর্ব্বে গোবিন্দর (স্বামী তত্ত্বানন্দ) বসন্ত হইয়াছিল। ঐ রোগ ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিতে লাগিল। উদ্বোধন ‘আফিসে’ শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবাও রহিয়াছে, সুতরাং পুস্তক-ক্রেতা ও ভক্তের সমাগম বন্ধ করিবার উপায় ছিল না। যাহার অসুখ হইয়াছিল, সে কিন্তু অসুখ হইতেই হাসপাতালে যাইতে চাহিয়াছিল—একথা শরৎ মহারাজও শুনিয়াছিলেন। নানা দিক লক্ষ্য করিয়া শরৎ মহারাজ একজনকে বলিলেন, “কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে হাসপাতালে যাইতে তাহার বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা আছে কিনা, যদি থাকে তবে যেন তাহাকে পাঠান না হয়।”

যাঁহার উপরে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিবার ভার দিয়াছিলেন তিনি অন্য একজনকে উহা জিজ্ঞাসা করিতে বলেন। তিনি আবার, রোগীর যে সেবা করিতেছিল তাহাকে বলিলেন, “উহাকে জানাইবে—তাহাকে কাল হাসপাতালে যাইতে হইবে।” প্রথম হইতেই হাসপাতালে যাইবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল, সুতরাং হাসপাতালে যাইবার কথা শুনিয়া সে অম্লান বদনে সম্মতি দিল। সে কি কথার উপরে সম্মতি দিয়াছিল, শরৎ মহারাজ তাহা জানিতেন না। গোবিন্দ, হাসপাতালে দেহরক্ষা করিল। তখন তাহাকে হাসপাতালে পাঠান লইয়া কতিপয় বাহিরের লোক “সেবাধর্ম্ম” সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ

করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কিন্তু একদিনও রোগীকে দেখিতে আসেন নাই, কিংবা কি করিলে হাসপাতালে না পাঠাইয়া তাহার সেবা চলিতে পারে তাহাও বলিয়া দেন নাই। কিন্তু তবুও অযাচিত মন্তব্যগুলি যথা সময়ে শরৎ মহারাজ শুনিলেন। একদিন জনৈক সাধুর কাছে তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি কথা মত কাজ না কর, আমি অপদার্থ মানুষ—কি করতে পারি বল ?"

জগতে দলপতিদের জয় ততদিন অব্যাহত থাকে যতদিন অধীনস্থ সকল লোক ব্যক্তিগত বুদ্ধি খরচ না করিয়া অধ্যক্ষের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে। যেখানে অধ্যক্ষের আদেশের সহিত অধীনস্থ লোকের ব্যক্তিগত বুদ্ধি যোগ হয় সেখানেই বিভ্রাটের উপর বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হইবে। সাধুটিকে হাস-পাতালে পাঠান দোষের হইয়াছিল, কিংবা গুণের হইয়াছিল, সে-বিচার করিতে কেহ এ সময় পুঁথি খুলিয়া বসিবে না। আমরা শুধু দেখাইতে চাই, অধ্যক্ষের আজ্ঞা অব্যাহত না থাকিলে যে-বিভ্রাট উপস্থিত হয় তাহার জন্য অধ্যক্ষকেই মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীমহারাজ ও শরৎ মহারাজকে স্বামিজী কথায় কথায় বলিতেন, "তোদের ঐ ছুটাকে বুদ্ধি রেখে দে, সুদে আসলে বাড়ুক, পরে কাজে লাগাবি। এখন যা বলি করে যা।" মহারাজ, শরৎ মহারাজ—স্বামিজীর আদেশ মত ঠিক ঠিক কথা বলা, কাজ করা গৌরবেরই জানিতেন। অতএব যাহারা অধীনস্থ তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত—"Soldiers do not choose, they obey."

আমি কখনও শরৎ মহারাজকে তাঁহার গুরু-ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে নিন্দা বা অমর্য্যাদা-সূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। গ্রাম্য-ভাষা তিনি কখন প্রয়োগ করিতেন না। গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পরে ঈর্ষ্যা—ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথা হইলেও, সে পাপে কেহ কখন স্বামী সারদানন্দকে লিপ্ত হইতে দেখেন নাই।

মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র সহরে ছিল আমার পূর্ব্বাশ্রম। ১৩১৪ সালের চৈত্র মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য-

নিমন্ত্রিত হইয়া বেলুড় মঠ হইতে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ (শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী), তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্ম্মলানন্দ) এবং নীরদ মহারাজ (স্বামী অম্বিকানন্দ) সেই ক্ষুদ্র সহরে শুভাগমন করেন। আমার পূর্ব্বাশ্রমেই পূজ্যপাদ মহারাজগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উৎসবানন্দে সাত দিন গত হইল। মঠে ফিরিবার সময় বাবুরাম মহারাজ আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধীনেই আছি।

বাগবাজার—বলরাম বাবুর বাড়ীতে শরৎ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি। সেই স্বল্পভাষী গম্ভীরমূর্ত্তি দেখিয়া প্রীতি হইলেও স্বস্তি অনুভব করিতে পারি নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল অন্য ঘরে গিয়া বসিলে মন্দ হয় না।

গৃহে থাকিতে যে সকল সন্ন্যাসী দেখিয়াছি তাহারা সকলেই হিন্দুস্থানী। প্রজ্জলিত ধুনীর পার্শ্বে বৃক্ষতলশায়ী, গঞ্জিকাসেবী, কৌপীন ও কম্বল-মাত্র-সম্বল ;—রোগে যা'তা' ঔষধ প্রদান, অর্থের বিনিময়ে হাত দেখিয়া ভাগ্য-গণনা, যাতায়াতের ভাড়ার অর্থের জন্য গৃহীর দ্বারে শুভাগমন—ইহাই সাধুর লক্ষণ বলিয়া জানিতাম। ইহা ছাড়া স্থানীয় লোকের মধ্যে যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া অভিহিত, দেখিয়াছি—তাহারা প্রায় সকলেই প্রলাপের ন্যায় অসম্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতেন, কচিৎ কেহ মৌন থাকিতেন। ধার্ম্মিকের মধ্যে প্রায় অনেকেই ভাবের আতিশয্যে কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখন নৃত্য করিতেন আবার কখন বা কুৎসিত ভাষাতে গালমন্দ করিতেন। সে সকল ধার্ম্মিকেরা কথা বলিতে যাইয়া "ভুলিয়া গেছি" বলিয়া জানাইতেন—এ জগতে তাঁহাদের মন বেশীক্ষণ থাকিতেছে না। তখন বুঝিয়াছিলাম, 'ভুল হওয়া' ধার্ম্মিকের একটা বড় গুণ।

বেলুড় মঠে আসিয়া পূর্ব্ব ধারণা নিতান্তই অসার বলিয়া প্রতীত হইল। সেখানে দর্শক ছিলাম, এখানে শিষ্য ; শিখিতে আরম্ভ করিলাম, —"'ভাব' খুবই ভাল কিন্তু তাহার সহিত 'প্রবণতা' যুক্ত হওয়া ভাল নহে," যেমন 'শুচি' ভাল কিন্তু তাহার সহিত 'বাই' যুক্ত হওয়া

সমীচীন নহে। জানিলাম, 'ভুল হওয়া' ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, উহা নিছক ব্রহ্মচর্য্যের অভাবের ফল মাত্র। শুনিলাম, সাধুর হইবে——muscles of iron, nerves of steel, gigantic will which nothing can resist। কারণ, সাধুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করিতে হইবে, ভাবের বেগ, রিপুর বেগ ধারণ করিতে হইবে, কর্ম্মের মধ্যে ধীর স্থির থাকিয়া কাজ করিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে শুনিলাম, "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"

প্রাচীনগণের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দ আমাদের ভাগ্যগুণে এক অপূর্ব্ব উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি কখন স্বামিজীর কথা বলিতেছেন, কখন বা উপনিষদ, গীতা—শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া যাইতেছেন—আর আমরা মুগ্ধ হইয়া সেই বাক্যলহরী শুনিয়া রাত্রির অধিক অংশ কাটাইয়াছি। কিন্তু আজ আমাদের ভাগ্যদোষে স্বামী শুদ্ধানন্দ বৃদ্ধ, রোগে শক্তিহীন। তিনিও প্রথম প্রথম শরৎ-মহারাজের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া একটু একটু ভয় পাইতেন। যথাসময়ে স্বামিজীর বিরচিত মঠের নিয়মাবলী খানা পড়িয়া দেখিলাম, নিয়মগুলি সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার্থে এবং বিজয়-অভিযানে (defensive and offensve) স্বামিজীর একান্ত দূরদর্শিতাই সূচিত করিতেছে। এখনও আমার মনে বিশেষ ভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে—

"বিদ্যার অভাবে ধর্ম্মসম্প্রদায় নীচ দশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চ্চা থাকিবে।"

"ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে, অতএব ত্যাগ ও তপস্যার ভাব সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।"

"প্রচার-কার্য্য দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচার-কার্য্য হইতে কখন বিরত থাকিবে না।"

"আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয় চরিত্র গঠনের একমাত্র উপায়। অতএব এই মঠের প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক শিক্ষায় ইহার উপর যেন লক্ষ্য থাকে।"

"আজ্ঞাবহতাই কার্য্যকারিতার প্রধান সহায়, অতএব প্রাণভয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।"

"অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব-বিচ্ছেদের প্রধান কারণ, অতএব কেহ তাহা করিবে না। যদি কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে তবে একান্তে তাহাকেই বলা হইবে।"

"এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গেরই ভাবা উচিত যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি যেখানেই যান বা যে অবস্থায়ই থাকুন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এবং লোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে।"

পরবর্ত্তী সময়ে যতই শরৎ মহারাজকে দেখিয়াছি ততই মনে হইত, স্বামিজীর এই সকল নিয়মাবলী যেন তাহাতে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে।

তখন শ্রীশ্রীমহারাজ গরমের সময়ে পুরীতে থাকিতেন। পূজনীয় মহাপুরুষ (শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী) ও বাবুরাম মহারাজ মঠের কাজ দেখিতেন। গোপালদা (শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ স্বামী), নিত্যানন্দ স্বামী, গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) মঠে থাকিতেন।

সে সময় শরৎ মহারাজ কলিকাতা হইতে মঠে আসিতেন। কখনও দুএক দিন থাকিতেন, প্রায়ই যেদিন আসিতেন সেদিনই কলিকাতায় ফিরিতেন।

সম্মুখে ঝুলন-যাত্রা। একদিন শরৎ মহারাজ মঠে আসিয়াছেন। তখন বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর পূজা করিতেন। প্রায় ১১টার সময় তিনি পূজা শেষ করিয়া শরৎ মহারাজের পাশে চায়ের টেবিলের নিকটে বেঞ্চিতে গিয়া বসিলেন। তারপর আমার ডাক পড়িল। স্থির হইল, তিন মাসের জন্য আমাকে বৃন্দাবন সেবাশ্রমে যাইতে হইবে। এই সময় আমাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া শরৎ মহারাজের সহিত কথা বলিতে হইয়াছিল। সেখানে লোক গিয়া কি করিবে তাহা তিনি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। এই কথাবার্ত্তার মধ্যে আমার ধারণা হইয়াছিল,—ইঁহাকে দেখিলে যতটা ভয় আসে ইনি ঠিক ততটা ভয়ের বস্তু নহেন।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-পূজার তিন চারি দিন পূর্ব্বে শিব-চতুর্দ্দশী রাত্রে হোমের ঘরে বসিয়া শরৎ মহারাজকে চার প্রহর একাসনে

বসিয়া পূজা করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তখন চার পাঁচ জনের বেশী ব্রহ্মচারী মঠে ছিলেন না। পূজা অন্তে গান, গান অন্তে পূজা। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি গত হইল। গান গাহিয়াছিলেন শরৎ মহারাজ তানপুরা সহযোগে, সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাইয়াছিলেন প্রবোধ বাবু। এই পূজার প্রথম প্রহরে ব্রহ্মচারী—কলিকাতা হইতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরৎ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "পূজো করবি আয়।" ব্রহ্মচারী—বলিলেন, সমস্ত দিনে তাহার কাপড় বদলাইবার অবসর হয় নাই, তা ছাড়া সে আহার করিয়াছে। "তা হোক, ব্যাধ যেমন পূজো করেছিল তেমনি পূজো করবি"—বলিয়া একটু গঙ্গা জল তাঁহার মাথায় দিয়া, পাশে বসাইয়া পূজা করাইলেন।

ব্যাধের সহিত উপমা আর সস্নেহে পাশে বসাইয়া পূজা করানর মধ্যে—বোধ হয় আরও কিছু ছিল যাহার জন্য ব্রহ্মচারী—'না' বলিয়া পাশ কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহাকেও সেই অবস্থায় পূজা করিতে হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি-পূজার রাত্রিতে শরৎ মহারাজকে প্রতি বৎসর "দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে" গানটি ঠাকুর-ঘরে বসিয়া গাহিতে শুনিয়াছি। আর শুনিয়াছি, স্বামিজীর তিথি-পূজাতে "একরূপ অরূপ-নাম-বরণ অতীত-আগামি-কাল-হীন, দেশ-হীন সর্ব্ব-হীন নেতি নেতি বিরাম যথায়।" ইহা ছাড়াও তাঁহাকে অনেক গান গাহিতে শুনিয়াছি।

সে বৎসর 'উদ্বোধনের' বাড়ী নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইল। শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে শরৎ মহারাজের কাছে চিঠি আসিল—মামারা পৃথক হইবেন—শরৎ মহারাজকে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া দিতে হইবে। মঠে আসিয়া শরৎ মহারাজ সে সংবাদ জানাইলেন। আমি বাবুরাম মহারাজকে ধরিয়া বসিলাম, মাকে কখন দেখি নাই—আমি শরৎ মহারাজের সঙ্গে যাইব। বাবুরাম মহারাজ অনুমতি দিলেন।

একদিন 'গুমো প্যাসেঞ্জারে' শরৎ মহারাজের সঙ্গে রওনা হইলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিবার কিছুক্ষণ পরে তিনি একটি চুরুট ধরাইয়া আমাকে একটি চুরুট লইতে বলিলেন। আমি বলিলাম, "না।"

তিনি বলিলেন, "লজ্জা করে আর কি কোরবে ? অনেক রাস্তা যে এক সঙ্গে যেতে হবে।" তখন—আমি ধূম পান করি না—নিবেদন করিলাম।

তিনি বলিলেন, "তবে আর নিয়ে কাজ নেই।"

তিনি যে উদারতা-বশতঃ আমাকে চুরুট নিতে বলিয়াছিলেন—জন্মগত সংস্কার প্রবল থাকার জন্য, তাহা ভাবিবার মত সামর্থ্য আমার তখন ছিল না।

বৈকালে বিষ্ণুপুরে নামিয়া চটিতে রান্না করিয়া ভাত খাওয়া গেল। তার পরে ঠিক হইল, গরুর গাড়ীতে কোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিবে। ইতিপূর্ব্বে কখন B. N. R এর গাড়ীতে উঠি নাই। সুতরাং এদিকের হাল চাল কিছুই জানিতাম না।

যথাসময়ে গরুর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎ মহারাজ গাড়ীতে উঠিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "উঠে পড়্।" সর্ব্বনাশ—'উঠে পড়্' কি! এক গাড়ীতে উভয়কে শয়ন করিতে হইবে নাকি ? এযে একেবারেই অসম্ভব! একে তিনি স্থূলদেহী, আর আমি স্থূল না হইলেও কম যাই না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার সাহস তখন ছিল না। তারপর সমস্ত রাত শরৎ মহারাজের পার্শ্বে একপাশ হইয়া কাটাইয়া রাত যখন তিনটা তখন গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁটিতে লাগিলাম। তখন কিন্তু মনে হইতেছিল—এমন বিপদে যেন আর না পড়িতে হয়।

পরদিন গাড়ী সকাল নয়টার সময় কোয়ালপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও কোয়ালপাড়া-মঠ হয় নাই, তবে বয়ন-বিদ্যালয় ছিল। কেদার বাবু (পরে—স্বামী কেশবানন্দ) বাক্স ও বিছানা বহন করিবার লোক ঠিক করিয়া দিলেন। আমরা পদব্রজে জয়রামবাটি চলিলাম। বেলা ১১টার সময় আমোদর নদী পার হইয়া শরৎ মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া পড়িলেন। আমাদের পশ্চাতে একজন ঐদেশী বর্ষিয়সী মহিলাও আসিতেছিলেন। শরৎ মহারাজকে ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া, তাঁহার সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। মহিলা বলিয়া ফেলিলেন, "আহা ভোঁদা (মোটা) মানুষ, বড্ড কষ্ট হয়েছে, না ?"

পরবর্ত্তী সময়ে শরৎ মহারাজ কিন্তু একথা বলিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিতেন।

পরে মহিলাটিও চলিয়া গেলেন। শরৎ মহারাজের সঙ্গে আমোদরে স্নান করিয়া ক্ষুদ্র মাঠখানা অতিক্রম করিয়া জয়রামবাটি গ্রামে প্রবেশ করিলাম। তারপর একেবারে ধূলোপায়ে শরৎ মহারাজ অগ্রে আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রথমে তিনি প্রণাম করিলেন, মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ ও চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন। পরে আমি প্রণাম করিলাম। মা আমারও মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ এবং চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন।

ইহাই আমার ভাগ্যে সর্ব্ব প্রথম মাতৃ-দর্শন। যাঁহার কৃপায় আমার ভাগ্যে মাতৃ-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ, আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন জীবনে কিংবা মরণে তাঁহার সেই অহৈতুকী কৃপা আমার উপর সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। সংঘের শুভ ইচ্ছা—শ্রীশ্রীঠাকুরেরই আশীর্ব্বাদ, —ইহা আমার দৃঢ় ধারণা।

স্বামী ভূমানন্দ

What I want to say is that a man should always be like a rough-rider to the wild horse which men call by the name of Fate. So be up and doing and have the thing under your feet once for all. You do not know what an easy task it will be, once you have set your mind to it.

Saradananda

আমার বক্তব্য,—প্রত্যেক ব্যক্তি সুদক্ষ অশ্বারোহীর মত নিয়তির দুষ্টাশ্বকে সতত সংযত রাখুক্। অতএব, চিরদিনের মত তাহাকে পদানত রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগ। তুমি জান না, একবার মনঃ-সংযোগ করিলে কার্য্যসিদ্ধি কত সহজ-সাধ্য ব্যাপার!

স্বামী সারদানন্দ

সংঘ-নায়ক

বিগত ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী তাঁহার ইহ-জগতের কার্য্য সমাধা করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। নিত্য আনন্দ নিত্য উৎসবময় উদ্বোধন কার্য্যালয় আজ যেন শূন্যপ্রায়। তাঁহার নিত্যসঙ্গিগণের কথা দূরে থাকুক—দিনেকের জন্যও যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ-সৌভাগ্য-লাভের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাদেরও অন্তর আজ বিয়োগ-বেদনায় বেদনাতুর। তিনি যে ভারতবর্ষের এবং জগতের পক্ষেও ভগবৎ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ছিলেন ইহা আজ যেমন সকলে মনে প্রাণে অনুভব করিতেছেন, হয়তো ইতিপূর্ব্বে কেহ এমন ভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই।

মহাপুরুষগণের জীবন পৃথিবীর আনন্দ-দীপ-স্বরূপ। তাঁহাদেরই জীবনের জ্যোতিতে সাধারণ মানব কিছু কিছু ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। যদি পৃথিবীতে তাঁহাদের আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে জগৎ কেবল অন্ধ তামস-মগ্ন দুঃখের আগার হইয়াই রহিত। ভগবান যে আছেন, এবং তিনি যে প্রেমস্বরূপ, মহাপুরুষগণের জীবনের মধ্য দিয়াই এই সত্য আমাদের জীবনেও সত্যরূপে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাত হয়, আর তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া থাকি। নতুবা এই মৃত্যুময় জগতে কে বা বাঁচিয়া থাকিত আর কেই বা বাঁচিতে চাহিত! তাঁহাদের সংস্পর্শে মুহূর্ত্তের অবকাশেও যে সত্যের কিরণ আমাদের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করে তাহাই সময়ে জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া জীবনের নূতন ভাবে বিকাশের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এইরূপে জগতে একেকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য জীবন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, সেই প্রস্ফুটনের কার্য্যভার লইয়া মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

বেদান্ত-সূর্য্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাকার্য্যের ভার লইয়া পৃথিবীতে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার "অভীঃ, অভীঃ" মহা হুঙ্কারে মানব-সমাজের চিত্তগত ক্লৈব্য যেন পলায়নের পথ খুঁজিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দও এই মহাকার্য্যের ভার লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নার প্লাবনে জগতের অবসাদ-অন্ধকার যেন আপনার লয় আপনিই প্রার্থনা করিয়াছিল। এই দুই মহাপুরুষের ভাব ভিন্ন প্রণালীতে প্রকাশ হইলেও মূলতঃ এক। তাঁহাদের উভয়েরই জীবনব্যাপী কর্ম্মসাধনার মূলে মানব-দুঃখে করুণা-বিগলিত হৃদয়ের নিঃশেষে আত্মদানরূপ মহাপ্রবাহের অক্ষয় উৎস বর্ত্তমান। আপনার সম্বন্ধে কিছু চাহিবার বা পাইবার প্রশ্ন মাত্রও তথায় উঠে না। উঠিবার প্রয়োজনও হয় না। সেতু যেমন গর্জ্জনশীলা তরঙ্গবন্ধুরা নদীর উপর আপনাকে বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়া জনগণের পরপারে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন সাধনরূপেই অবস্থান করে, তাঁহারাও সেইরূপ সংসার-দুঃখ-তাপিত জনের ভগবানের আনন্দরাজ্যে উত্তীর্ণ হইবার সেতুস্বরূপেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের একবাহু অপরিমেয় স্নেহ, কল্যাণ-কামনা ও আত্মীয়তার স্পর্শ লইয়া জনমাত্রকেই হৃদয়ে আকর্ষণ করিতে ও অপর বাহু ভগবানের অনন্ত আনন্দ রাজ্যের পথ নির্দ্দেশ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। জগতের সকল কর্ম্ম-সাধনার মূলে তাঁহাদের এইটি কেবল মূলমন্ত্র-স্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এক একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। থিওজফিষ্ট, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান বা জগতের অপর যার কাছে থেকেই হোক্ লোকে কিছুই সাহায্য পাচ্ছে জান্‌লে আমার এত আনন্দ হয় তা কি বল্‌ব!"

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দেরও জীবনের ইহাই মূলমন্ত্র ছিল। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-সংঘে দিনে দিনে কত তরুণ ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব হইয়াছে, স্বামী সারদানন্দ প্রতিনিয়ত জননীর স্নেহে অসীম ধৈর্য্যে প্রত্যেকেরই প্রকৃতির প্রকৃতিগত বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ ভাবে নিজ চরিত্র বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন সে বিষয়ে সহায়তা দান ও

সুযোগবিধান করিয়া আসিয়াছেন। আবার সংসারী যাঁহারা তাঁহার নিকটে সঙ্গলাভের জন্য আসিয়াছেন, তাঁহাদের মনেও কথোপকথনের অবসরে—যাহাতে তাঁহারা সংসারে থাকিয়াই সংসারকে অতিক্রম করিবার মত শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন—সেইরূপ ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই অধ্যাত্মসম্পদ-দান, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের পক্ষেই অতি সহজ হইত। কেননা তথায় আচার্য্য বা শিষ্যের বর্ত্তমানতা রহিত না। তাঁহাকে কেহ আচার্য্যরূপে কথনই অনুভব করেন নাই, কেবল তিনি যেন অতি স্নেহশীল পরমাত্মীয়, আত্মীয় হইতেও আত্মীয়, নিঃসঙ্কোচে সকল সুখদুঃখের কথাই তাঁহাকে নিবেদন করা যায়, আর বিপদে সান্ত্বনা, সমস্যায় সমাধান এবং সৎ-সংকল্পে সাহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ তাঁহারই নিকট পাওয়া যায়। গৃহীরাও, তিনি যে সন্ন্যাসী এবং আপনারা গৃহী—এ ভেদ ভুলিয়া যাইতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সম্পাদন-ভার তিনি কী নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিচয় অনেকেই জানেন। এই নৈপুণ্য ও কর্ম্ম-তৎপরতা কথনই জগতে সম্ভব হইত না, যদি না একাধারে ত্যাগ, নিষ্ঠা ও স্বার্থহীন প্রেমের ভিত্তিতে তাহার প্রতিষ্ঠা হইত! আলমবাজারের একটি পুরাণো বাড়ী, ও তাহাতে কয়েকটি নিঃসম্বল গৃহত্যাগী তরুণ ও বালক। তাঁহারা একই কদলীপত্রে সকলে মিলিয়া কেবল লবণমাত্র উপকরণ সংযোগে ভিক্ষান্ন ভোজন করেন, আবার কথনও বা অযাচক বৃত্তিতে উপবাস করিয়া দিন কাটান। একখানি মাত্র কাপড়, যথন যাহার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয়, তিনি পরিধান করেন। শীতাতপে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, উপবাসেও কষ্ট নাই, ধ্যান, ধারণা, গ্রন্থপাঠ, তর্ক ও আলোচনা লইয়া সকলেই মনের আনন্দে কাল কাটাইতেছেন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠি-তেছে, তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ। সংঘের ভ্রাতাগণ সকলেই একান্ত উদাসীন, আসক্তির সম্পর্ক মাত্র সহ্য করিতে পারেন না, আবার সকলেই সকলের ভালবাসার বন্ধনে যেন একপ্রাণ। সহপাঠী বালকের ন্যায় সকলেই যেন প্রতিযোগিতা করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর

হইবার জন্য অন্যের অজ্ঞাতে প্রাণপন সাধনে লাগিয়া রহিয়াছেন, আবার সকলেই সকলের উন্নতিতে পরমানন্দিত। শ্রীগুরু মহারাজের স্মৃতি, তাঁহাতে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সকলেরই প্রাণ যেন ভরা ভাদ্রের নদীর ন্যায় কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া টলমল করিতেছে।

কঠোর সন্ন্যাস-জীবনে, সন্ন্যাসের ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের জীবন সেই অপূর্ব্বতার পূর্ণ অভিব্যক্তি। অতি গভীর, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর স্থির আবার অতি স্নিগ্ধ স্নেহমধুর সেই যে হৃদয়, জগতের এক অতুলনীয় সম্পত্তি;—একদিন—একদিন মাত্রও যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সে আর তাহা ভুলিতে পারিত না। সাধনার প্রথম অবস্থায় যে অতি তীব্র বৈরাগ্য তাঁহাকে কঠোর সাধন, প্রব্রজ্যা ও নির্জ্জনবাসে নিয়োজিত করিয়াছিল তাহার তীব্র দহনে তাঁহার প্রকৃতির স্নিগ্ধতা বিন্দুমাত্র নষ্ট না হইয়া বরং আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। সন্তান-কুশলা-কাঙ্ক্ষিণী জননীর ন্যায় তিনি তাঁহার অগণিত স্নেহপাত্রের সুখ দুঃখ তাঁহাদের অনুভবের মধ্য দিয়া সম অনুভূতিতে অংশ লইয়াছেন; জননী বরং তাঁহার দুচারটি সন্তানের উৎপাতও সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু তিনি কখনও বিরক্ত হন নাই। আবার আপনাকেও তিনি জননী মহামায়ার স্নেহ-ক্রোড়ে শিশুর মত নির্ভরেই একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অধিষ্ঠান-গৃহ উদ্বোধন মঠে তিনি যে থাকিতেন, সে সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "মায়ের দারোয়ান হয়ে আমি এখানে আছি।" আবার সেই মহাদেবী জননীর পীড়ার সময় ক্রোড়স্থ বালিকার ন্যায় তাঁহাকে যেন পিতৃস্নেহে শুশ্রূষা করিয়াছেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, স্নানান্তে একবার আসিয়া মায়ের গৃহদ্বারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা,—ইহাতেই তাঁহার অপরিসীম তৃপ্তি, ততোধিক আর কিছু প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার শান্ত ধৈর্য্যের মধ্য দিয়াও যেন ভালবাসা ক্ষরিয়া পড়িত। একবার মঠের এক তরুণ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার অবিশ্রান্ত বমন ও সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা হইতেছিল, জীবনের কোন আশাই ছিল

না। শ্রীমৎ সারদানন্দ মহারাজ সর্ব্বদা তাঁহার পাশে থাকিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া যন্ত্রণা দূর করিতেছিলেন, কিন্তু শেষে যেন আর সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সন্তানের পীড়ার সংবাদে তাঁহার জননী আসিয়া কয়েকদিন মঠে পীড়িত সন্তানের নিকটে ছিলেন। তিনি পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল-ভাবে বারবার সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "মহারাজকে একবার ডাকুন। তিনি গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই ও ভাল হয়ে যাবে।" মহারাজ শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন অতি গভীর দুঃখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিয়া উঠিলেন, "থাক্, থাক্, ওকথা আর আমাকে শোনাস্‌নে। যেতে দে, ওকে শান্তি পেতে দে। স্বার্থপরের মত ছেলেটাকে এখনো কি তোরা আরও ভোগাতে চাস্?"

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবন বিশেষভাবে জড়িত, এবং তাঁহার সংঘ-পরিচালনী শক্তির ভিতর দিয়া তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। যে ভাবে এই সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা জগতের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহার নিজের জীবনব্যাপী শ্রম যেমন তাঁহার নিকট কষ্টসাধ্য না হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক ও ভগবৎ-নির্দ্দেশিত প্রিয়কার্য্য-সাধনস্বরূপ ছিল, সংঘের সকল সেবকের জীবনও তিনি তাঁহার নিজের সেই প্রেরণা দিয়া অনুপ্রাণিত করিতেন। ভগবৎ-সাধনা সম্বন্ধে তিনি নিজে সাধন করিয়া তাহাদের পথ দেখাইতেন ও উৎসাহিত করিতেন, কখনও বা সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত একাসনে উদয়াস্ত জপ করিতেন, কখনও সমস্ত রাত্রি ধ্যান ধারণায় কাটাইবার একটি আগ্রহের ভাব নিজের ভাব দিয়া সকলের মনে জাগ্রত করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ-সংঘের মহাসম্মেলন যখন হয়, তখন তাঁহার শরীর খুবই অসুস্থ ছিল, কিন্তু তথাপি পনর ষোল দিন ধরিয়া এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যটি সমাধা করিয়া তাঁহার সংঘ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। আর এই মহাসম্মেলনই তাঁহার সংঘ-নায়কত্বের শেষ নিদর্শন। দেশে দেশে প্রসারিত বহু বিস্তৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-

সংঘের একবার সকল কর্ম্মীর একত্র মিলন—ভাববিনিময় ও ভবিষ্যৎকর্ম্মপদ্ধতি-নিরূপণ বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি সেই কার্য্যটি শেষ করিয়া গেলেন। তাঁহার "নিবেদিতা বিদ্যালয়" সম্বন্ধে একান্ত যত্ন, এই বিদ্যালয়টিকে সহায়-হীন অবস্থা হইতে স্থায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নারী-জাতির সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ অতিশয় উচ্চ ছিল, এবং ভারত-রমণী সেই আদর্শ নিজ জীবনে যেন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন ইহা তাঁহার বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। যদিও রাজনৈতিক ব্যাপার প্রভৃতি তিনি পছন্দ করিতেন না, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁহারও মাতৃভূমির প্রতি একান্ত অনুরাগ ছিল।

'ভারতে শক্তিপূজা' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' কয়েক ভাগ তিনি বঙ্গভাষাকে দান করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, ইহাতে বঙ্গ ভাষার কিরূপ সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে।

তাঁহার সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অধিক কিছু লেখা অসম্ভব। আজ তাঁহাকে স্মরণ করিতে স্বভাবতঃই মন গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক শান্ত অধ্যাত্মনিকেতন দেবালয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে। তথায় ভালবাসার অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজিত এবং তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া তাঁহার তরুণ স্নেহপাত্রদল। ভারতবর্ষের যে পরম কল্যাণ তথায় নব ভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, যেন তাহার মহিমা আমাদের জীবনে ব্যর্থ না হইয়া যায়, আজ আমরা নত মস্তকে কেবল এই প্রার্থনাই করি।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী

যে শক্তিরই উপাসনা কর, অতি পবিত্রভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। স্বার্থানুসন্ধানের নাম-গন্ধ-পর্য্যন্ত মন হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

স্বামী সারদানন্দ

আচার্য্য

He that hath ears to hear, let him hear ; he that hath eyes to see, let him see.—Jesus Christ.

শ্রীভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর, অন্তরঙ্গ শিষ্য, জগজ্জননীর প্রিয় পুত্র ও সেবক, রামকৃষ্ণ-গত-প্রাণ, অনাথ-আর্ত্তের অনন্যশরণ, দয়াল দেবতা পূজ্যপাদ্ আচার্য্য স্বামী সারদানন্দজী আর স্থূল শরীরে নাই। বিগত ১লা ভাদ্র রাত্রি ২টা ৩০ মিনিটের সময় তিনি মহাসমাধিযোগে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া লীলাধাম শ্রীরামকৃষ্ণ-লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার পুণ্য চরিতের অনুধ্যানই এক্ষণে আমাদের অবলম্বন। তাঁহার দেবজীবনের মর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারিলে জীবন সার্থক হইয়া যাইত, কিন্তু কর্ম্মচক্র তাহা করিতে দেয় নাই—তথাপি তাঁহার শ্রীপাদুকাধ্যানে মনোমল দূরীভূত হইবে—ভরসাতেই এ দুঃসাধ্য প্রয়াস।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) দ্বিষষ্টি বর্ষমাত্র নরকলেবরে মনুষ্যলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য জীবন কি ভাবে অতীত হইয়াছিল, যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গলাভে কি ভাবে তাঁহার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের ফল্গু-প্রবাহ উচ্ছ্বসিতাকার ধারণ করিয়াছিল, শ্রীগুরুর সঙ্গলাভে সংসারের সর্ব্ববিধ বাসনা বিস্মৃত হইয়া অতঃপর তাঁহার অন্তর্দ্ধানে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণপূর্ব্বক কঠোর ত্যাগ তপস্যা আচরণে তিনি যে ভাবে চিরশান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, উত্তরকালে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ স্বামী বিবেকানন্দের পদানুগ হইয়া শ্রীগুরুর ভাব-প্রচারে, মাতৃদেবীর ঐকান্তিক সেবায়, অনাথ আর্ত্তের শরণদানে যে ভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যে দুর্ব্বোধ্য তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। জীবনের শেষ তিন চারি বৎসর কাল বিশেষ

সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহার সঙ্গে একটু মিশিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলাম এবং এই কালে অপরাপর ভক্তদের নিকট হইতেও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছি। এখানে তাহাই বিবৃত করিতেছি।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে পরম পূজনীয় শরৎ মহারাজকে ধীর গম্ভীর সাধক শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইত। তাঁহাব অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে অনেকেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হইত। কিন্তু দুই একদিন তাঁহার সঙ্গে মিশিলেই বুঝা যাইত তাহার ভিতরটা বড়ই মধুর। যাঁহারা এই ধীর গম্ভীর পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই কথা বলিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে জনৈক সাধু তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "দেখ্, বড় জিনিষ মনে করে কাছে আস্‌লে প্রথম অমনি একটা ভয় হয়েই থাকে, কিন্তু একটু মিশ্‌তে পারলেই বোঝা যায় ভিতরটায় তার কি আছে।" স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দিবসে বেলুড়মঠ লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নাই। কিছুদিন পূর্ব্বেই পূজনীয় শরৎ মহারাজ রক্তপ্রস্রাব করিয়াছেন—কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিয়াই সেদিন তিনি ভিঁড় ঠেলিয়া উৎসবে আসিয়াছেন। বেলা চারিটার সময় তিনি পূজনীয় তুলসী মহারাজের সঙ্গে মঠের সাম্‌নের দালানের উপরকার বারাণ্ডায় বিশ্রাম করিতেছেন—ইতিপূর্ব্বে লোকের ভিঁড় ঠেলিয়া সমগ্র উৎসবের স্থান দর্শনে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময়ে কোথা হইতে এক ভদ্রলোক উচ্চরোলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই উৎসবের দিনে সন্তান-বিয়োগ-বিধুরা জননীর ন্যায় শোকসূচক ক্রন্দন উপস্থিত সকলের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। কেহ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "কি অশান্ত কচ্চে বাপু, মহারাজ আজ ভিড়ের চোট্ সহ্য কর্‌তে পাচ্ছেন না, অন্য দিন এঁর কাছে এসে সব দুঃখের কথা বোলো।" কিন্তু শরৎ মহারাজ সে কথা না শুনিয়া কত প্রবোধ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষজী আসিবামাত্র তাঁহাকে প্রণাম

করিবার সময় ঐ ব্যক্তি কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন, "সংসারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমাদের কাছে এসেছে।" তখন উভয়ে তাহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা-বাক্যে পরিতুষ্ট করিলেন। বস্তুতঃ স্বামী সারদানন্দের প্রশান্ত ভাবের পশ্চাতে যে এমন অচিন্তিত করুণ ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সহসা বুঝা যাইত না।

অনাথ আর্ত্ত—যাহাদিগকে সকলে একবাক্যে পরিত্যাগ করিয়াছে শরৎ মহারাজ তাহাদের মা-বাপ ছিলেন। বিকৃত-মস্তিষ্ক, বাক্‌শক্তি-বিহীন, মূর্খ, এমন কত লোককে তিনি নির্ব্বিচারে কোল দিয়াছেন—শ্রীশ্রীমায়ের দেহান্তে তিনি যতদিন নরদেহে অবস্থান করিয়াছিলেন তত দিন মাতৃভাবের প্রবল প্রেরণাই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। মায়ের ভক্তগণ তাঁহার দর্শনে মাতৃবিরহ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কথায় কখন তিনি কাহারও প্রতি ভালবাসার ভাব প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু অজ্ঞাতসারে তাঁহার ভালবাসার সুদৃঢ় বর্ম্মে রক্ষিত হইয়া বহুলোক স্বল্প কালের মধ্যে যথার্থই আধ্যাত্মিক জীবনের আস্বাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা যত অগ্রসর হন ততই তাঁহাদের হৃদয় ক্রমশঃ উদারভাব-সম্পন্ন হইয়া থাকে ইহাই শাস্ত্র-বর্ণিত সত্য। ঐ উদারতা কল্পনাতীত ভাবে স্বামী সারদানন্দে বিদ্যমান ছিল। উদ্বোধন-মঠে ঝি-চাকর না থাকিলে আশ্রম-কার্য্যের যখন অসুবিধা হইত তখন মঠের অন্যান্য সকলের মত তিনিও সকলের সহিত একত্রে আশ্রমকার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলানায়ক, আধ্যাত্মিক ভাবের ঘনীভূত প্রতিমা, পবিত্রতার মূর্ত্তবিগ্রহ ব্রহ্মবিৎ স্বামী সারদানন্দজীর বিকৃত-মস্তিষ্ককে আশ্রয় দান, তাঁহার চিকিৎসা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত, পাপীতাপী-নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত প্রেম ও ক্ষমা-মণ্ডিত আচরণ প্রভৃতি দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, এ মহাপুরুষ মানব ছিলেন না, নরশরীরে দেব-বিশেষ। জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহার শরীরাবলম্বনে আরও কিছু কাল মরধামে দিব্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের চরিত্রের অপূর্ব্ব ভূষণ ছিল—তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি
ন কামকামী॥"

তাঁহার জীবনে ইহার চরম পরিণতি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণ-মিশনরূপ সমুদ্রের সকল তরঙ্গই তাঁহাকে আঘাত করিত, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের সম্পাদক-রূপে স্বামী সারদানন্দ কর্ম্মজীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বিরাট সংঘের সকল কার্য্যের ব্যবস্থায় অনলস ও উৎসাহী ছিলেন। অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি, এই দীর্ঘ অক্লান্ত কর্ম্মজীবনের মধ্যে কেহ তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চল হইতে দেখেন নাই। দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে গেলেই মানুষের স্বভাব একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের বিবিধ কর্ম্মকেন্দ্রের কর্ম্মিগণ কাজ কর্ম্ম করিতে গিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যদি কখনও তাঁহার কাছে অভিযোগ আনয়ন করিতেন, বা নিজেদের সুবিধা অসুবিধার কথা তাঁহার কাছে বর্ণনা করিতেন—সকল কথা শুনিয়া অসুবিধা অপনয়নের জন্য সারদানন্দ স্বামী সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একের মুখে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ করিয়াও তিনি কাহারও সম্বন্ধে কোনও অভিমত পোষণ করিতেন না। কল্পনায় ইহার ধারণা, প্রবন্ধে ইহার উপযুক্ত বর্ণনা, সকলের পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ও লোকমতের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম করিয়াও অর্থাভাব, কর্ম্মীর অভাব ইত্যাদি কত দুর্য্যোগ সহিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ বর্ত্তমানাকার কি ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সামান্য ইতিহাসও যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, স্বামী ত্রিগুণাতীতের আমেরিকা গমনে 'উদ্বোধন' পত্রিকার উন্নতির মূলে যে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার অপনোদন, কলিকাতার স্থানে স্থানে গীতাপাঠ, ভগিনী নিবেদিতাকে পরামর্শ-প্রদান, বলরাম-মন্দিরে রামকৃষ্ণ-মিশনের আলোচনা, কেন্দ্রে শাস্ত্রালোচনা, সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ-মিশনের

সম্পাদকরূপে সমস্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা স্বামী সারদানন্দ এককালেই করিয়াছেন। ব্যবস্থা বলিতে যেন কেহ মনে না করেন, শুধু আদেশ প্রদান,—সেকালে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে মুষ্টিমেয়মাত্র কর্ম্মী ছিলেন,—অর্থবল একেবারেই ছিলনা—সুতরাং ব্যবস্থা বলিতে কর্ম্মক্ষেত্রে আগমন অর্থ বুঝিলেই ধারণা স্পষ্টতর হইবে। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণসংঘের সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন বলিলে কিছুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে গমনের পর তাঁহার আহ্বানান্তর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে, আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর বেলুড়মঠের কার্য্য-পরিচালনে, তদনন্তর রামকৃষ্ণসংঘের সম্পাদকতায়, একনিষ্ঠ মাতৃ-সেবায় তিনি যে দেবজীবন যাপন করিয়াছেন তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধির জন্য আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের জন্ম জন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে। পূজনীয় হরি মহারাজ একবার এই কারণেই বলিয়াছিলেন, "স্বামিজীর পর শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের জন্য যদি কেহ খাটিয়া থাকেন তবে সে শরৎ মহারাজ," স্বামী সারদানন্দের ধৈর্য্যের উপরই রামকৃষ্ণসংঘ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুনিয়াছি—স্বামিজী, পূজনীয় শরৎ মহারাজের ধৈর্য্যের পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে একবার বহু গালিগালাজ করিয়া ভাবান্তর আনয়নে অক্ষম হইয়া বলিয়াছিলেন, "এর বেলে মাছের রক্ত।"

পূজনীয় শরৎ মহারাজের চরিত্রে নিরভিমানতা আর এক অপূর্ব্ব সম্পদ, তিনি নিজে অতি সামান্য লোক এই ধারণাই সকলের কাছে প্রকাশ করিতেন, এত লোক সম্মান দিয়াও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত হৃদগত ভাব পরিবর্ত্তনে সক্ষম হইত না, সাধারণের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার দেখিলে মনে হইত তিনি যেন তাঁহাদের সকলেরই সমান বরং তাঁহাদের চেয়ে ন্যূন, সকল ভদ্রলোকের ভিতর তিনিও একজন ভদ্রলোক, এত বড় পণ্ডিত, এত বড় সাধু—কিন্তু আচরণে তাহার মোটেই অভিব্যক্তি নাই,—কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে, চালচলনে কোথাও আচার্য্যের ভাবের প্রকাশ নাই, তাঁহাকে প্রশ্নাদি করিয়া আমরা দেখিয়াছি "আমি এই-রূপ বলিতেছি, অতএব ইহা করিবে", তিনি কখনও এইরূপ বলেন নাই। স্থির ধীরভাবে আমাদের প্রশ্ন শ্রবণ পূর্ব্বক তদন্তর বিষয়টি

আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিতেন। আমরা তাঁহাকে মনঃস্থির কিরূপে হয়—তাহার কথা প্রশ্ন করিয়াছি ; চিত্তস্থৈর্য্যের পন্থা নিরূপণ-পূর্ব্বক তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন,—"আমরাই সব সময়ে মনঃস্থির করিতে পারি না—" বার বার বলিতে শুনিয়াছি—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে"। সামান্য বালক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়াছে, তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন,—"অল্পবয়সে দীক্ষা নিয়ে কি হবে বাপু, আমাদের চেয়ে অনেক ভাল ভাল লোক পরে পাবে।" কোথায় আমরা ক্ষুদ্র বালক, আর কোথায় স্বামী সারদানন্দ—এই অতুলনীয় ব্যবহারের ধারণা আমরা করিতে অক্ষম, রামকৃষ্ণসংঘের মহাসম্মেলনে তাঁহার প্রদত্ত এক বক্তৃতার উপসংহারে আমরা তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম—তাহা এখনও আমাদের নানা চিন্তা-সমাকুল মনে জলন্তভাবে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকা-প্রত্যাগত পরমানন্দ স্বামীর পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া সমাগত জনমণ্ডলীকে বলিতেছেন, "আমার আর কিছু বক্তব্য নাই, অপরাপর ভাল বক্তা সব রহিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই আমার চেয়ে পণ্ডিত, বড়—ইঁহারা এখন আপনাদিগকে সব বলিবেন, ইঁহারা যে আমার চেয়ে বড় তাহাতে আমি খুসী, কারণ ইঁহারা সকলেই আমার পুত্র, আর আমি পুত্রের কাছে পরাজয়ই স্বীকার করিতেছি।" এই বলিয়াই পরমানন্দ স্বামীকে সকলের সমক্ষে উপ-স্থাপিত করেন, ইহাই ছিল স্বামী সারদানন্দের অন্তরের ভাব। শ্রীরাম-কৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি যে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধাপন্ন ছিলেন—তাঁহার ভিতরের দিক বুঝিবার মোটেই ক্ষমতা না থাকিলেও বাহির দেখিয়াও আমাদের ন্যায় মদগর্ব্বিত মানুষের মনেও ক্ষণেকের তরে দেবভাবের উদ্রেক হয়। তিন বৎসর পূর্ব্বে জ্বর-রোগে বিষম ভুগিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ যখন বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত পুরীতে 'শশী-নিকেতনে' অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে পরম ভক্তিমতী শ্রীমতী লক্ষ্মীদিদিও সেখানে ছিলেন। তাঁহার তখন বিশেষ অসুস্থ অবস্থা—ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইত, পরম পূজনীয় শরৎ মহারাজ সেই অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাকে কাছে

বসাইয়া স্বহস্তে আহার করাইতেন। একদিন লক্ষ্মীদিদি শরৎ মহারাজের কোলে অনেকক্ষণ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। অনেকেই মনে করিতেছেন এইবার লক্ষ্মীদিদির শরীর বুঝি গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্য চৈতন্যের লক্ষণ দেখা গেল—ক্রমে তিনি পূর্ণ বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিলেন, তখন শরৎ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।" উত্তরে লক্ষ্মীদিদি বলিলেন, "শরীরের কষ্ট, প্রাণ কিন্তু আনন্দে ভরপুর।" লক্ষ্মীদিদিকে পূজনীয় শরৎ মহারাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার পদধূলিও গ্রহণ করিতেন। তাঁহার জন্মতিথি-দিনে পরম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে তাঁহার এবংবিধ ব্যবহার দর্শনে আমরা বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, সে অপূর্ব্ব কথা এখানে আমরা যথাসাধ্য বর্ণনা করিতেছি। সে দিন পূজনীয় শরৎ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে উদ্বোধন গৃহ উৎসবানন্দে ভরপুর—বাড়ী লোকে লোকারণ্য। সকালবেলা হইতে ভক্তগণ পরম পূজনীয় শরৎ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের নিমিত্ত ফল-পুষ্পাহরণ-পূর্ব্বক বাগবাজারের স্বল্পপরিসর বাটীতে সমবেত হইয়াছেন, শরৎ মহারাজ প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই নিজের বাসগৃহে মাটিতে পাতা বিছানার উপর বসিয়া আছেন, একে একে সকলে তাঁহার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতে উপস্থিত হইলেন। এখানেও তাঁহার নিরভিমানতার দৃষ্টান্তে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, প্রথমেই ঠাকুরকে পুষ্পমাল্যাদি দেওয়া হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি ভক্তদের প্রদত্ত পুষ্প পদতলে গ্রহণ না করিয়া করজোড়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকের মস্তক তাঁহার সুকোমল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দিলেন, সে দিনে যে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন তিনি তাঁহারই মস্তকে মঙ্গল হস্ত অর্পণ-পূর্ব্বক নীরবে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আবার বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভক্তদের প্রদত্ত মাল্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সেবককে উহার কোনওটি ঠাকুরকে, কোনওটি মাকে, কোনওটি স্বামিজীকে পরাইয়া দিতে আদেশ করিতে লাগিলেন। ঐ দিন বিকালবেলা পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার জন্মোৎসব সন্দর্শনার্থ—

উদ্বোধন বাটীতে আগমন করেন এবং তাঁহার ঘরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরমস্নেহ সহকারে আলিঙ্গন করেন ;—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। স্বামী সারদানন্দজী শ্রীমন্মহাপুরুষের চরণে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন—"আশীর্ব্বাদ করুন, শ্রীশ্রীঠাকুরে ভক্তি-বিশ্বাস হোক্"—আর মহাপুরুষজী তাঁহাকে বক্ষদেশে গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে উচ্চরবে বলিতেছেন—"আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে ঠাকুরের কাজ কর।" পূজ্যপাদ স্বামিজী যখন তাঁহাকে আমেরিকা গমনের আদেশ দিয়াছিলেন তখন তিনি নিজেকে এই কার্য্যের অনুপযুক্ত বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন—বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ যে দেশে প্রচার কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার ন্যায় মূর্খলোক সেখানে গিয়া করিবে কি? পরিশেষে তিনি স্বামিজীর আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে গেলে পর স্বামিজী যখন তাঁহাকে বক্তৃতাদি করিতে আদেশ করেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার সেবা করিতেই আসিয়াছি, বক্তৃতা দিতে ত আসি নাই।" স্বামিজীও তখন বলিয়াছিলেন, "প্রচার-কার্য্যই আমার সেবা।" অতঃপর তিনি প্রচার-কার্য্যদ্বারা আমেরিকার বহু নরনারীর দৃষ্টি ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন—বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দের পর আমেরিকার জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারে অন্যান্য গুরুভ্রাতার ন্যায় ইনিও সবিশেষ সক্ষম হইয়াছিলেন। স্তুতিনিন্দা সকলকেই সমজ্ঞান করিয়া ইনি অবস্থান করিতেন—অহঙ্কারের সংস্পর্শ তাঁহার জীবনে ছিল না।

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননীর প্রাণপাতসেবায় সারদানন্দ নাম সার্থক করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের সম্পাদকতা-রূপ গুরুভার স্কন্ধে গ্রহণ ও দিবারাত্র নানা কর্ম্ম সমাপন করিয়াও তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অদ্ভুত সেবা করিয়াছেন। লাটু মহারাজ তাঁহার মাতৃসেবায় সন্তুষ্ট হইয়া লিখিয়াছিলেন—"তুমি মা ঠাকুরাণীর সেবা কোরছো। তোমার জীবন ধন্য, তোমার শরীর পবিত্র।" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শরৎ মহারাজের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমার ভার

হইতে এক শরৎই পারে।" শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ, তাঁহাদের শত আব্দার পরিপূরণ, মায়ের সমীপে সমাগত ভক্তদের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা, সেই সেবার অঙ্গীভূত ছিল। শেষবারে মায়ের অসুখের সময় তাঁহার রক্তপ্রস্রাব আরম্ভ হইয়াছিল; মায়ের সেবার অসুবিধা হইবে বলিয়া তিনি উহা সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিয়াছিলেন। বহুপরে ডাক্তার তাঁহার মুখে এই অসুখের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—এই অসুখ অপরের হইলে মরিতে হইত। কিন্তু মৃত্যুর ভাবনা ত স্বামী সারদানন্দের ছিল না। উদ্বোধন মঠের কখনও কাহারও অসুখ হইলে তিনি চাহিতেন, তাঁহার মত সকলেরই যেন সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা হয়। একজন নবাগত ব্রহ্মচারীর অসুখ হইলেও তিনি তাহার অপেক্ষা অধিক সেবার প্রত্যাশা কখনও করিতেন না। শ্রীশ্রীমায়ের দেহাবসানে মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশ তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইয়াছে—মাতৃভাবের প্রবল প্রেরণায় আত্মহারা হইয়া জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির স্থাপন-কালে তিনি কিরূপে দিনের পর দিন নির্ব্বিচারে সকলকে তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বিলাইয়া দিয়া জগজ্জননীর অপার করুণার নিদর্শনরূপে বিরাজ করিয়া-ছিলেন ভক্তগণ তদ্দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন। মাতৃমন্দিরে যে কেহ আসিয়া তাঁহার কৃপার প্রার্থী হইয়াছে তিনি তাহাদের কাহাকেও বিমুখ করেন নাই, সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ না সমবেত সকল দীক্ষার্থীর মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে ততক্ষণ তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাসনে বসিয়া তাহাদের সংসার-সমুদ্র তরণের উপায় করিয়াছেন। সেদিনও তাঁহার শেষ জন্মোৎসব দিবসে, বেলুড়মঠে যখন ভক্তগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার পুষ্পমাল্যাদিতে সজ্জিত করিয়া চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন-পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিতেছিলেন এমন সময়ে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সান্ন্যাল মহাশয় যখন তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখ-চুম্বন-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "বা, তোমাকে ত বেশ সাজিয়েছে" সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁহার অন্তর্নিহিত মাতৃগত-প্রাণতা কথায় অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "দশচক্রে ভগবান ভূত। কোথায় মায়ের বাড়ীর দারো-য়ান—তাকে কিনা ফুল দিয়ে সাজিয়ে ভগবান্ করে তুলেছে।" মাতৃ-

জাতি বিশেষ-ভাবে তাঁহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীমায়ের ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। দিনের পর দিন বিকালবেলা উদ্বোধনের বাড়ীতে স্ত্রী-ভক্তদের সমাগম ও পূজনীয় শরৎ মহারাজের তাঁহাদের সঙ্গে করুণ ব্যবহার ও আলাপ পরিচয় তাহার নিদর্শন।

শেষ জীবনে তিনি পুনরায় কঠোর সাধন-ভজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি নিষ্ঠা-সহকারে নিত্য সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত চারিঘণ্টাকাল ধ্যানাদিতে তন্ময় থাকিতেন। কোনও কোনও দিন আবার তাহারও চেয়ে অধিককাল এই কার্য্যে ব্যয়িত হইত। ইহার পর আবার তিনি দীক্ষা-দানে সময়ক্ষেপ করিতেন। বহুবর্ষ যাবৎ বহুমূত্র-রোগে তিনি ভুগিতেছিলেন, দীর্ঘকাল ধ্যান ও জপ করা তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হইবে বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে প্রবল ধ্যান-ধারণাদি হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। যৌবনের অশেষ সাধনায় তৃপ্ত না হইয়াও তিনি বৃদ্ধ বয়সে বলিতেন, "আর কতকাল কাজকর্ম্ম করা যায়! এখন একটু ভগবানকে ডাকা যাক্।" আজন্ম তিনি কল্পনাতীত ভাবে নিষ্ঠাপর ছিলেন। এই সময়ে জনৈক সাধু দীক্ষাদি দান তাঁহার শরীরের পক্ষে হানিকর হইবে বলিয়া তাঁহাকে উহা হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি উহাতে বলিয়াছিলেন, "তুমি অমন কথা বলিও না, শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনিবার জন্য যে আমার কাছে লোক আসে, তাতে আমিই কৃতার্থ। আমি তাদের কৃতার্থ কোরছি না। আমি যে এই অধিকার পেয়েছি—এই আমার সৌভাগ্য।" তাঁহার নিষ্ঠার অবধি ছিল না। নিষ্ঠা-সম্পন্না বিধবাগণ যে ভাবে বিশ্বনাথকে প্রণামাদি করিয়া থাকে, তিনি একান্ত অক্ষম হইলেও বৃদ্ধবয়সেও তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। ইতিপূর্ব্বে ৺কাশীধামে অবস্থান কালে তিনি স্বহস্তে বস্ত্র-কমণ্ডলু গ্রহণ-পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিয়া নিত্য বিশ্বনাথ দর্শন করিতেন। সেবা-গ্রহণ তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি নিজের কাপড় নিজেই কাচিয়া লইতেন। গঙ্গার ঘাটে অপর সাধুগণ তাঁহার কাপড়খানা ধুইতে চাহিলে

তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "তোরা আমাকে অথর্ব্ব কর্ত্তে চাস্ নাকি ?" জনৈক সাধু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—বিশ্বনাথের গৃহের শিকল ধরিয়া টানা, তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী পদ্মের নিম্নদেশ দিয়া গমন ইত্যাদি বিধবাদিগের অনুষ্ঠিত আচার-ব্যবহার যাহাকে আমরা এতকাল কুসংস্কার বলিয়া নিঃসন্দেহ ধারণা করিয়া আসিয়াছি, পূজনীয় শরৎ মহারাজকে তাহার অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাকে এই সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিম্নোক্ত উত্তর পাইয়াছিলাম, "কি করিলে যে ভগবানে ভালবাসা দেখান যায় তাহা তো আমি বুঝিনা। গীতায় অর্জ্জুন বলেছেন, 'নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে'—আমিও তাঁর সর্ব্বাঙ্গে প্রণাম করিয়া থাকি। ভগবানে ভক্তি লাভের জন্য যাহা সকলে কুসংস্কার বলিয়া থাকে তাহার অনুষ্ঠান করিলেও হানি নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।" তাঁহার নিষ্ঠার উদাহরণ-স্বরূপে ইহা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, স্বামিজী তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশনের যে সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সকলে চেষ্টা করিয়াও সেই পদ হইতে তাঁহাকে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।

শেষ কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি অসুখে ভুগিতেছিলেন। অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলেন, তিনি আর বেশী দিন নরদেহে অবস্থান করিবেন না। তিনি নিজেও এই সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেন নাই, তাহা নহে। স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলেন,—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গের অবশিষ্ট অংশ এই কালে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেও, তিনি তাঁহাকে তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার আর এখন লিখ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমার এখন (সাধন-ভজনে) ডুব্‌তে ইচ্ছা।" শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনের কাজ শেষ হইল।" আবার যোগেন মা ও গোলাপ মার দেহান্তেও নাকি বলিয়াছেন, "মা ইহাদের ভার আমার উপরে দিয়াছিলেন—ইহারা চলিয়া গিয়াছে, আমারও কাজ শেষ হইয়াছে।" যাহা হউক ক্রমে ক্রমে তিনি ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে ডুব দেওয়ার জন্য বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিয়া

দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন তাঁহার এই পন্থা প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছিল। দিন পনর ধরিয়া শরীরের অসুস্থতা গ্রাহ্য না করিয়া তিনি উহার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই সময়েই তাঁহার বিশেষ প্রচেষ্টায় রামকৃষ্ণ-মিশনের কার্য্যকরী সভা (Working Committee) গঠিত হয়। মহাসম্মেলনের অবসানে সমবেত সাধুগণকে তিনি একদিন রাত্রিতে মিশনের আদর্শ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দেহাবসানের কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বেও তিনি অযাচিত ভাবে Working Committeeর অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সমূহ গুরুতর সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন।

বিগত ২০শে শ্রাবণ শনিবার রাত্রি ৮—৩০ মিনিটের সময় তিনি নীচে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞার বিলোপ হয়। শীঘ্রই ডাক্তার কবিরাজ ডাকা হইল। চিকিৎসকগণ বলিলেন—তাঁহার Apoplexy (সন্ন্যাস রোগ) হইয়াছে। অকস্মাৎ বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় এই নিদারুণ সংবাদ কলিকাতা ও পরিশেষে দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ত্রয়োদশ দিবস যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি জন্মের মত আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেবদেহের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক ভক্তগণ উহা অনলে আহুতি প্রদান করতঃ পবিত্র হইলেন। দেখিতে দেখিতে স্বামী সারদানন্দ অতীতের বস্তুতে—ঐতিহাসিকের উপকরণে পরিণত হইলেন।

প্রাণ-নির্গমনের পর তাঁহার মুখমণ্ডলে যে সৌম্যশান্ত ভাবের প্রকাশ ভক্তগণ দেখিয়াছেন তাহা তাঁহারা এ জীবনে বিস্মৃত হইবেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা। অন্তরের ভাবধারা গোপন করিয়া রাখা স্বামী সারদানন্দের আজীবন স্বভাব ছিল। পাছে চরমকালে তাঁহার সেই নীরবতা ভঙ্গ হইয়া যায় ভাবিয়াই বুঝি শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বাক্‌শক্তি-শূন্য করিয়া ত্রয়োদশ দিবস রোগ-শয্যায় রাখিয়াছিলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণের নামে উৎসৃষ্ট-প্রাণ সন্ন্যাসিগণ—আজীবন যাঁহাদের তাঁহার সেবা করিবার বাসনা ব্যর্থ হইয়াছে, জগদ্‌গুরু তাঁহাদের সেই ঐকান্তিক প্রার্থনা পূরণের

জন্যই যেন সর্ব্বপ্রকারে অন্তঃকালে তাঁহাকে তাঁহাদের সেবামাত্র-সম্বল করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শুনিবার জন্য বিশেষ আশা অনেক ভক্তের অন্তরে বিদ্যমান ছিল। স্বামী সারদানন্দ জীবনব্যাপী নীরবেই তা প্রকাশ করিয়াছেন—পরিনির্ব্বাণকালে আমরা তাহার ব্যত্যয় আকাঙ্ক্ষা করি কেন? তিনি নীরবে আব্রহ্মস্তম্ব প্রাণি-জাতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া লীলাময় বিগ্রহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিত্যধামে শ্রীগুরুর নিত্যসাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন। দেশকাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁহার উচ্চারিত শুভাশীর্ব্বাণী যে এখনও তাঁহার 'লীলা-প্রসঙ্গ' প্রভৃতি, গ্রন্থের পত্রে পত্রে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের লীলাসহচর পার্ষদগণ দেবলীলা সম্পন্ন করিয়া প্রায় সকলেই অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যবশে এখনও তাঁহাদের কেহ কেহ সশরীরে বিদ্যমান থাকিয়া মানবকল্যাণ সাধন করিতেছেন। যুগনায়ক মহাপুরুষগণ শ্রীভগবানের লীলার পুষ্টির জন্য তাঁহার সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, "বাউলের দল এল গেল নাচ্‌লে গাইলে, কেউ চিন্‌লে না"—তাঁহাদের প্রেমের হাট প্রায় ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার লীলাসহচরবর্গের পূতজীবনের মহিমা উপলব্ধির অকপট অভিলাষ অন্তরে যদি সামান্য পরিমাণেও বিদ্যমান থাকে তবে এস হে পাঠক, বেলুড়ের মঠমন্দিরে—শ্রীরামকৃষ্ণ সহচরদিগের লীলাক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যদের শ্রীপদপ্রান্তে অভিমান বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসুরূপে উপনীত হই, নতুবা এ তত্ত্ব চিরদিনের তরে দুর্ব্বোধ্যই থাকিয়া যাইবে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব

লোক-গুরু

পারমার্থিকতাভ্রষ্ট একটা পতিত জাতির মৃত ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা সভ্যতার শবের উপর বসিয়া সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল নিরলস নিষ্ঠার সাধনা করিয়াছেন যে মহাভৈরব, অল্পদিন হইল তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। এই পুণ্যকর্ম্ম-ভূয়িষ্ঠ দ্বিষষ্টিবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আজ আমাদের সশ্রদ্ধদৃষ্টি শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া মনুষ্যত্বের সুমহৎ গৌরব দর্শন করিয়া ধন্য হউক।

এই শক্তিশালী জীবন নবযৌবনে তৃষ্ণার্ত্তচিত্ত লইয়া পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশে কি ভাবে দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছিলেন সে কাহিনী অনেকেই জানেন। দশজন কলেজের ছাত্র যে পথে চলিয়া যে অভীষ্ট লাভ করে, সে পথ তাহার চলিবার পথ নয়—ইহা যেদিন তিনি অনুভব করিলেন, সেইদিনই অবলীলাক্রমে জন্মগত জাতিগত সংস্কারের বাধা ছিন্ন করিয়া একেবারেই মুক্ত আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তেজোময় ঋজু-স্বভাব এই বলিষ্ঠ পুরুষ দক্ষিণে ও বামে চাহিলেন না,—একাগ্র লক্ষ্যে ভারতবর্ষের পরম সাধনায় ডুবিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধি ও সাধনা তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছিল; কাজেই বাঙ্গালী সমাজের অভ্যস্ত গতানুগতিকতা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে তাঁহাকে অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয় নাই।

তরুণ বয়সেই সত্যলাভের জন্য তাঁহার চিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া সত্যদীক্ষা লাভ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়াছিলেন,—এই বালকের মধ্যে ত্যাগের জ্বলন্ত শক্তি রহিয়াছে। একদিন শরচ্চন্দ্রকে ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি কি ভাবে ঈশ্বর প্রণিধান করিতে চাহ? ধ্যানে কোন্ রূপ দেখিতে তোমার ইচ্ছা?

শরচ্চন্দ্র উত্তর করিলেন,—আমি ধ্যানে ঈশ্বরের কোন বিশেষ মূর্ত্তি দেখিতে চাহি না। আমি তাঁহাকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত দেখিতে চাহি। অলৌকিক দর্শন আমার অভিপ্রায় নহে।

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—এযে আধ্যাত্মিক অনুভূতির শেষ কথা। এতো একদিনের কাজ নহে।

যুবক ধীরস্বরে উত্তর দিলেন,—ইহার কমে আমার শান্তি হইবে না। যতদিন ঈপ্সিত লাভ না হয়,—ততদিন আমি সাধনায় বিরত হইব না।

শরচ্চন্দ্রের মানসিক অপরিমেয় বলের চিত্রটি এই কথোপকথনের মধ্য দিয়া কি পরিপূর্ণরূপেই না প্রকাশিত হইয়াছে! সর্ব্বসাধনায় সিদ্ধ জগদ্‌গুরুর নিকট তিনি কিছু চাহিলেন না, প্রাকৃতজনের ন্যায় অলৌকিক দৃশ্য দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন না,—তিনি ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম-সাধনার চরম লক্ষ্যের উপর ধ্রুবদৃষ্টি রাখিয়া অনায়াসে বলিলেন,—গুরুদেব, আমি সাধনাদ্বারাই সত্যলাভ করিব এবং নিরুদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিব। এইখানেই বল, এইখানেই তেজ, এই-খানেই শক্তি, এইখানেই মনুষ্যত্বের গৌরব। যাহা দুঃখের ধন, তাহা ভিক্ষা করিয়া লইব না, দুঃখ করিয়া পাইব—এই তো মানুষের তীব্র আত্মমর্য্যাদাবোধ।

যে সমস্ত মুমুক্ষু যুবক এই কালে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সমবেত হইতেন, শরচ্চন্দ্র অল্পদিনেই তাঁহাদের সশ্রদ্ধ ভালবাসা লাভ করিলেন,—ধীর গম্ভীর উদার স্বল্পভাষী অথচ কোমল-হৃদয় যুবক স্বীয় চরিত্রমাহাত্ম্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে স্বীয় বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যখন ভক্তগণের আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল,—তখন মুষ্টিমেয় ত্যাগী যুবক বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সংসার ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন,—জগতের কল্যাণের জন্য, স্বদেশের উদ্ধারের জন্য, ধর্ম্মের বিকৃতি, সামাজিক জীবনের অধঃপতন দূর করিবার জন্য শ্রীরাম-কৃষ্ণ যে মহান আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন—তাহার সাধন ও প্রচার করিবেন—এই ইচ্ছা। গুরুবিয়োগব্যথায় দুঃখভারনম্র মহামৌনী সাধক

শরচ্চন্দ্রকেও আমরা সেদিন বরাহনগরের ভগ্নবাটীতে গুরুভাইদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহোচ্চসাধনায় ব্রতী দেখিতে পাই। মহৎ আদর্শের জন্য গুরুগতপ্রাণ বাল-সন্ন্যাসীদের এই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন যখন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল—তখন প্রতিপদে তাঁহারা বাধা পাইতে লাগিলেন। তৎ-কালীন সমাজের প্রতিকূলতা, আত্মীয় স্বজনের বাধা, দারিদ্র্যের পেষণ এ সকলই পর্য্যায়-ক্রমে তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল। তাঁহারা দক্ষিণ কি বামে হেলিলেন না—শরবৎ ঋজু একাগ্রতা লইয়া মানব-সাধ্য সকল কৃচ্ছ্রব্রতই স্বীকার করিলেন—ভাবী রামকৃষ্ণ সংঘের ভিত্তি বরানগরের জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনের নিভৃত কক্ষে স্থাপিত হইল।

তারপর দেখিতে পাই,—তাপস শরচ্চন্দ্র পরিব্রাজক সন্ন্যাসিরূপে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন, কখনো বা হিমালয়ের শান্ত গম্ভীর ক্রোড়ে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন—বিশ্বমানবের সেবাব্রতে নিজেকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। অমৃতের সাধনায় দিব্যভাবে বিভোর সাধক কি ব্যাকুলতা লইয়া ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন, কে বলিবে? যে জাতির সামাজিক জীবনের উপর জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিবে তাহাকে অতীত মহত্ত্ব-সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার সত্য পরিচয় লাভের জন্যই বোধ হয় এই পরিব্রাজক ব্রত, এই তপশ্চর্য্যা!

এই কালের পূর্ণতায় একদিন সুদূর আমেরিকায় বিশ্ব-ধর্ম্ম-সভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন,—প্রচারশীল হিন্দুধর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তখন গুরু-ভ্রাতা বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বামী সারদানন্দ বেদান্তের পতাকা হস্তে পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করিলেন,—শাস্ত্রজ্ঞ-সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামী সারদানন্দ গুরু-ভ্রাতাগণের আগ্রহাতিশয্যে এই নবীন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকত্বের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-জীবনাদর্শে এই যে নূতন ধর্ম্মসংঘ প্রতিষ্ঠ হইল— ইহা কোন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিল না,—অথচ বর্ত্তমান ধর্ম্ম-সাধনার বিকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহাতে লোকাচারপন্থী প্রাচীনের দল চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাঙ্গালী-সমাজের কুশজীর্ণ দৌর্ব্বল্য, নবযুগের নূতন সন্ন্যাসের মহাবার্ত্তাকে আপন শক্তিরই প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিল না। মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে নূতন আদর্শ, নূতন ভাব কোনদিনই সমাজে বিনা বাধায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, অতএব এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। কিন্তু সত্যের জন্য সকল বাধা-বিপত্তি, সকল অসম্মান যাঁহারা হাস্য মুখে বরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নিজের বলিতে কিছুই রাখেন নাই—আরাম না, বিশ্রাম না, ভয় না, সঙ্কোচ না—তাঁহাদের কেবল এই পণ ছিল, দেশের সম্মুখে খাঁটী জাতীয় আদর্শ স্থাপন করিবেন। দেখিতে দেখিতে রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসিবৃন্দের ভাবের গভীরতা এবং উদ্দেশ্যের একতা, সমস্ত বৃহৎ বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিল,—এমন কি স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রত্যাশিত তিরো-ভাবেও সংঘের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার কোন বাধা ঘটিল না। "সংঘের কল্যাণের জন্য যে উদার ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োজন" তাহা স্বামী সারদা-নন্দের ছিল, এবং তাহা ছিল বলিয়াই কোন দিন তাঁহার নৈরাশ্য আসে নাই।

বাহিরে লোকসমাজে যশঃ প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে, যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার প্রচুর ছিল,—কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাবের পর তিনি নিজেকে বাহিরের সকল কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্ত ভাবে সংঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। আত্মগোপনকারী এমন নিরলসকর্ম্মী কদাচিৎ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

গত সতের বৎসর কাল তাঁহাকে দেখিয়াছি। যেকর্ম্ম প্রচুর উদ্যমের সহিত নিজেকে বিস্তীর্ণ ভাবে প্রকাশ করে, তাহা তাঁহাতে ছিল না—কেননা কর্ম্মকে অনর্থক বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যে অতিরিক্ত আড়ম্বরের আবশ্যক, তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ক্ষুদ্র

বলিয়া কোন কর্ম্মই তাঁহার নিকট তুচ্ছ ছিল না,—কেননা, ছোট বড় সকল কাজের মধ্যেই তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি সহজ-নৈপুণ্যে প্রয়োগ করিতেন।

রামকৃষ্ণ-সংঘ অতি ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক বিস্তৃতির মুখেই তিনি অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিয়াছেন। বিস্তারের ফলে ত্যাগের ভাব ও আদর্শানুরাগ পাছে হ্রাস পায়, এই আশঙ্কা তাঁহার সর্ব্বদাই ছিল। যেখানে বিশ্বাস কম, সেইখানেই প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ আয়তনের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিবার স্পৃহা জাগে—সত্যবস্তুকে ফেনায়িত করিয়া আকারে বৃহৎ করিয়া দেখাইবার লেশমাত্র চেষ্টা তাঁহার মধ্যে কোন দিন দেখি নাই—সত্যকে তিনি খাঁটী ভাবেই বিনা আবরণে প্রকাশ করিতেন। রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির মূল রহস্য ইহাই।

বাগবাজারের ক্ষুদ্র বাটীতে শ্রীশ্রীমার পদপ্রান্তে বসিয়া এই আত্মসমাহিত জ্ঞানযোগী তাঁহার জীবন দেশের সকল মঙ্গল চেষ্টায় তিলে তিলে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন,—এক তলার ছোট্ট ঘরখানিতে এই মহাপুরুষের আত্মমগ্ন 'নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' জ্ঞান-গম্ভীর-রূপ কতবার না দেখিয়াছি,—প্রকাণ্ড ধরণী প্রচণ্ড বলে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান হইয়াও যেমন স্থিরবৎ প্রতীয়মান হয়, এই মহাকর্ম্মীও ঠিক তেমনি আপনাতে আপনি অটল বলিয়া প্রতিভাত হইতেন। আমাদের স্থূল দৃষ্টির সাধ্য কি যে, সে মহৎ জীবনের যবনিকার এক প্রান্ত তুলিয়া দেখিতে পারে। তথাপি তাঁহার আত্মসম্বরণ করিবার, আত্মগোপন করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল বলিয়া, সর্ব্বদাই তাঁহাকে আমরা একান্ত আপনার ভাবে অতি নিকটে পাইতাম। ধর্ম্ম কথা, অধ্যাত্ম উপদেশ, কূট তর্ক, সাংসারিক পরামর্শে—কত লোক কত ভাবে সময়ে অসময়ে তাঁহাকে অনর্থক উত্যক্ত করিয়াছে, কিন্তু তিনি কখনো বিরক্ত হইতেন না, রুষ্ট হইতেন না, ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলকে সমান ভাবে সমাদর করিতেন, সকলের কথা সমান শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন। মানুষের আত্মার চিন্ময়রূপ যিনি দেখিয়াছেন, ইহা তাঁহার

পক্ষেই সম্ভব! তাঁহার উদার স্বার্থলেশহীন প্রেম দ্বারা তিনি সহস্রের আশ্রয় দাতা হইয়াছিলেন; তাঁহার অপর্য্যাপ্ত বল-বুদ্ধিদ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘকে সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও এমন প্রবল, এমন সমুন্নত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সন্ন্যাসি-শিষ্যদিগকে নারীমাত্রকেই মাতৃরূপে দেখিবার উপদেশ দিতেন। শ্রীগুরুর পুণ্য আদর্শের অনুসরণে সারদানন্দ মাতৃভাব সাধনার সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী সারদা-দেবী তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দয়া, মমতা লইয়া মাতৃত্বের যে অনুপম আদর্শরূপে বিরাজমানা ছিলেন তাহাই ছিল সারদানন্দের শক্তি-সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক। যে ভারতের আর্য্যগৌরব ঋষিকুল নারীমহিমা প্রথম অনুভব ও প্রচার করিয়াছিলেন, সেই ভারতে নারীজাতির প্রতি কাপুরুষগণের অবজ্ঞা ও অসম্মান দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ করুণাবিগলিত হৃদয়ে অশ্রুপাত করিতেন। "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে তিনি জগতের যাবতীয় নারী-মূর্ত্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন"—সেই ভারত-নারীকুলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা যে কত সত্য পদার্থ ছিল, তাহা যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। তাঁহার মধ্যে লেশমাত্র ভাবুকতার স্বপ্নাবরণ ছিল না। নারীর সমস্ত দৈন্য অপূর্ণতা ত্রুটির মধ্যেও তিনি জগদম্বার স্বরূপ দর্শন করিতেন। আমাদের দেশে কাপুরুষগণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত অবমানিত নারীর বেদনা-সম্পর্কে তাঁহার বোধ এত তীব্র ছিল যে,—সেই বহুকাল সঞ্চিত অপরাধ সমষ্টির প্রায়শ্চিত্ত ব্রতই যেন তাঁহার সর্ব্বোচ্চ সাধনা —অতি দীনা নারীর প্রতিও অকুণ্ঠিত করুণার মধ্যে তাহা প্রকাশিত হইত। নারীর দৈন্য তাঁহার শ্রদ্ধাই উদ্বোধিত করিত, অবজ্ঞা নহে। সমাজে নারীর প্রতি প্রতিদিনের অবজ্ঞা দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন, "অস্বাভাবিক শিক্ষাসম্পন্ন হীনবুদ্ধি বর্ব্বর! তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কি অবনতিই হইয়াছে! একবার বৈদেশিক মোহের নিবিড়াঞ্জন নয়ন হইতে অপসৃত করিয়া ভূজগতে

দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে, জগতের আদর্শস্থানীয়া দিব্য নারীকুল একমাত্র ভারতেই হিমাচলস্তরের ন্যায় অনুল্লঙ্ঘনীয় শ্রেণীতে তোমার কুললক্ষ্মীর সহায়তা করিতে দণ্ডায়মানা। তাঁহাদের পদরজে কেবল ভারত নহে কিন্তু সাব্ধিদ্বীপা সকাননা সমগ্র পৃথিবীই সর্ব্বকালের জন্য ধন্যা ও সগৌরবা হইয়াছেন। ভারতের ধূলি * * * সীতা, দ্রৌপদী, বুদ্ধৈক-প্রাণা যশোধরা, চৈতন্যঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া, ধর্ম্মপ্রাণা আহল্যাবাঈ বা চিতোরের বীররমণীকুলের দেবারাধ্য পদস্পর্শে পবিত্রিত! ভাব দেখি—ভারতের বায়ু যাহা প্রতি নিশ্বাসে তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহা ঐ সকল দেবীদিগের পবিত্র হৃদয়ে যুগে যুগে প্রবেশ লাভ ও ক্রীড়া করিয়া তাঁহাদের পবিত্রতায় ওতঃপ্রোতভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দেখিবে,—* * তোমার জগন্মাতা নারীকুলের উপর বিশেষতঃ ভারতের রমণীকুলের উপর হৃদয়ের ভক্তি প্রেম উথলিত হইয়া তোমাকে আবার যথার্থ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তোমার কুললক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমায় পরিণত করিবে।"

'ভারতে শক্তিপূজা'র তত্ত্ব কহিতে গিয়া তাঁহার এই আবেদন অদ্যকার যুবক-বাঙ্গলার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে কিনা বলিতে পারি না; তবে নারীজাতির প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার বলিষ্ঠ পৌরুষের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

কর্ম্মশালার সিংহদ্বার দিয়া যে জীবন, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সগৌরবে জগদীশ্বরের বিরামশালায় চলিয়া গেল—তাহার ইহ-জীবনের সমস্ত সমাপ্ত কর্ম্ম জাতির অক্ষয় সম্পদরূপে দেশের মধ্যে ধ্রুব হইয়া রহিল। ইহাই আমাদিগকে বল দিবে, ভরসা দিবে—শঙ্কটের দিনে অনির্ব্বাণ দীপশিখার মত পথ দেখাইবে। আজ শুধু, এই পরাধীন পতিত জাতির মধ্যে এমন শক্তিমান্ পুরুষ জন্মিয়াছিলেন বলিয়া স্বদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশান্বিত হইব,—নিশ্চয় করিয়া জানিব—ভারতবর্ষে সমষ্টিমুক্তির এই অগ্রদূতের কল্যাণময়ী সাধনা ব্যর্থ হইবার নহে। উপযুক্ত আধার সকল অবলম্বন করিয়া সেই সাধনা অধিকতর মহীয়ান হইবে,—ইহা জানিয়া আসুন সকলে করজোড়ে এই দিব্যধামগত মহাপুরুষের জয়োচ্চারণ করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

দেব-মানব

আমার উপর স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের সম্বন্ধে কিছু লিখিবার আদেশ হইয়াছে। কিন্তু লিখিতে বসিয়া দেখিতেছি যে, কাজটা বড় সহজ নহে, বস্তুতঃ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। যিনি স্বয়ং পরমহংসদেবের লীলাসহচর এবং স্বামী বিবেকানন্দের সহকর্ম্মী ছিলেন, যিনি একধাবে জ্ঞানী ও কর্ম্মী, গত বিশবৎসর ধরিয়া ভারতে ও ভারতের বহিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আমার ন্যায় সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের সাধ্য কি, তাঁহার সাগরতুল্য মহান্ গম্ভীর চরিত্রের পরিমাপ করে? আর জ্ঞানী ও কর্ম্মী হিসাবে স্বামী সারদানন্দ যত বড় ছিলেন, তাহা অপেক্ষাও বড় ছিলেন তিনি অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে। গীতায় 'স্থিতপ্রজ্ঞে'র কথা আছে। এই 'স্থিতপ্রজ্ঞে'র স্বরূপ কি স্বামিজীকে না দেখিলে, তাহা আমি ধারণা করিতেও পারিতাম না। কিন্তু এই উচ্চতর অধ্যাত্মক্ষেত্রের কথা, এই ভূমিতে উঠিয়া তিনি স্বীয় জীবনের দ্বারা নবীন ভারতের সম্মুখে যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন,—তাহার কথা বলিবার অধিকারী আমি নহি, বলিবার চেষ্টাও আমি করিব না।

আমার ন্যায় মন্দমতি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য যে, আমি তাঁহার পাদমূলে বসিবার অধিকার পাইয়াছিলাম, মাঝে মাঝে তাঁহার চরণ-দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন দিন আমি তাঁহার নিকট সাহস করিয়া কোন উপদেশ জিজ্ঞাসা করি নাই। আমার ন্যায় দুর্ব্বল মানবের জীবনে যে সমস্ত বিষময় ও জটিল সমস্যার উদয় হয়, সংসার-দাবানলে অহরহ দগ্ধ হইতে হয়, কোন দিন মুখ ফুটিয়া তাহার মীমাংসা জানিতে চাহি নাই, শান্তি লাভের উপায়ও প্রার্থনা করি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য

এই যে, না বলিলেও তিনি যেন মনের কথা বুঝিতেন। সহস্র উপদেশে যাহা না হয় তাঁহার পাদমূলে বসিয়া তাঁহার প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের স্নিগ্ধ নীরবতায় তাহা লাভ করিতাম। পাশ্চাত্য কবির কাব্যে পড়িয়াছি হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যুৎবার্ত্তা—মানসবার্ত্তা প্রচারিত হয়। ভারতের ঋষি ও কবিরা তাহার অপেক্ষাও বড় কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কথা নয়, মহারাজের সান্নিধ্যে গিয়া আমি অনুভব করিয়াছি যে, অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার—জীবনের জটিল সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য অধ্যাত্মজগতের আর এক ভাষা আছে। সে ভাষা বর্ণনা করিবার, তাহার রূপ দিবার সাধ্য আমার নাই, বোধ হয় তাহা করাও অসম্ভব। কিন্তু তবু আমি দৃঢ়ভাবে বলিব যে, মানব-হৃদয়ের এই অকথিত ভাষা,—অধ্যাত্মজগতের এই অরূপ সম্পদ, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। আর বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়া এই ভাবেই মহাপুরুষেরা ক্ষুদ্র মানবকে অধ্যাত্মজীবনের পথ প্রদর্শন করেন। এত কথা বলিয়াও তবু হয় ত কথাটা আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। পাঠকগণ, আমার এই অক্ষমতার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

মহারাজের কাছে যাইলে তিনি বড় বড় তত্ত্বকথা বলিতেন না, বা উপদেশ দিবার ধার দিয়াও যাইতেন না। সাধারণ মানুষের মত, অতি অন্তরঙ্গ আপনার জনের মত সাধারণ সুখ দুঃখের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসারই পরিচয় পাওয়া যাইত। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে, আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে জানিয়া, ঐ কাগজের কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন। কাগজ কেমন চলিতেছে, কি করিলে কাগজের উন্নতি হয়, কাগজের আদর্শ কেমন হওয়া উচিত,—এই সব বিষয় বলিতেন। আবার বলিতেন, "তোমাদের কাগজ পড়িতে আমি খুব ভালবাসি, প্রত্যহ আদ্যোপান্ত পড়ি।" বাস্তবিকই একথা তিনি বাড়াইয়া, কেবল মাত্র আমাকে খুসী করিবার জন্য বলিতেন না। আমি সন্ধান লইয়া জানিয়াছি যে, সত্যই তিনি ঐরূপ করিতেন।

কাহার কোন্ বিষয়ে অনুরাগ—বুঝিতে পারিলে, তিনি তাহার সঙ্গে সেই বিষয়েই আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। একবার একখানি সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক আমার নিকট হইতে তিনি পড়িবার জন্য লইয়াছিলেন। সকলে বোধ হয় জানেন না যে, স্বামী সারদানন্দের সংগীতবিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার বোধ হয় কিরূপে ধারণা হইয়াছিল, সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধে আমার কিছু জানা আছে। একদিন আমি যাইলে ঐ বহির প্রসঙ্গ উঠাইয়া সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সংগীতবিদ্যায় আমি একেবারে আনাড়ী। সুতরাং লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমাকে সে কথা স্বীকার করিতে হইল। তিনিও অন্য প্রসঙ্গ উঠাইলেন।

আমি এই সব সামান্য ব্যক্তিগত কথা বলিলাম এই জন্য যে, এই সব ছোটখাট ব্যক্তিগত কথা, দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়াই স্বামিজীর মহান্ চরিত্র আরও বেশী উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিত। সকল শিষ্য, সেবক, অন্তরঙ্গ, পরিচিতের সঙ্গেই তিনি ঐরূপ করিতেন, সকলকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। বাহির হইতে দেখিলে তাঁহাকে জ্ঞানগম্ভীর প্রশান্ত সমুদ্রের মত বোধ হইত। কিন্তু যে একবার তাঁহার কাছে যাইত, মিশিবার সুযোগ পাইত, সেই বুঝিত, সেই সমুদ্রে লোণাজল ছিল না, গঙ্গার পবিত্র বারিধারার মতই তাহা সুমিষ্ট, কত পাপীতাপী সংসারদাবদগ্ধ ব্যক্তি সেই বারি পান করিয়া শান্তি লাভ করিত। একদিকে তিনি যেমন কঠোর জ্ঞানতপস্বী সন্ন্যাসী কর্ম্মযোগী ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই তাঁহার প্রকৃতি শিশুর মতই সরল কোমল ছিল। ভবভূতি বলিয়াছেন, লোকোত্তর পুরুষদের চরিত্র বজ্রের চেয়েও কঠোর, আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের চরিত্র দেখিয়া বুঝিয়াছি, ভবভূতির বর্ণনা কবি-কল্পনা নয়।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

লীলা-সহচর

কালরূপী ভগবান তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ড-উদরে অতীতে কত যে ভক্ষণ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে কত যে করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে কত যে ভক্ষ্যবস্তু স্থির করিয়াছেন, এমন শক্তিশালী কে আছে যে, তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? জিজ্ঞাসিত হইলে ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইয়াছেন কতবার যে কতশত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম হুতাশন, আমার এই বিশাল গর্ভরূপ শান্তি-নিকেতনে আশ্রয় লাভ করিয়াছে তাহা আমিই স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না—অন্যে পরে কা কথা! তোমাকেও ত প্রায়শঃ কবলিত করিতেছি, তুমি তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? আর কিছু দিন পরে বুঝিতে পারিবে যখন তোমার সমস্তই আমাতে প্রবিষ্ট হইবে। তখন দেখিবে, তোমার প্রিয় বস্তু সকল রত্নাকরের গর্ভে রত্নের ন্যায় আমার উদরে অনাবরণ ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিতেছে। ওই নির্ম্মল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কত কোটি হীরকখণ্ড স্বস্বপ্রভায় বিরাজিত হইয়া গগনমণ্ডলের কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভার প্রস্ফুরণ করিতেছে; ঐ বিচিত্রিত আকাশ মণ্ডল আমার উদরের আংশিক আয়তন। ঐখানে তুমি তোমার অন্বেষণীয় প্রিয় বস্তু সকল দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে—সমস্তই তথায় বিদ্যমান আছে, কাহারও অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। ঐ স্থানেই শ্রীমৎ সারদানন্দ বিদেহমুক্ত অবস্থায় প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ ও শাস্ত্র ব্যাখ্যায় তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন। ঐ দেখ, আমার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদ প্রসাদ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ গোচর করিয়া উল্লসিত হইতেছে এবং স্বর্গীয় কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার বিশাল হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিতেছে।

অন্যদিকে চক্ষুসঞ্চালন করিয়া দেখ, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ

তুরীয়ানন্দ-প্রমুখ অগ্রগামী সাধুমণ্ডলী তাঁহাদিগের আজানুলম্বিত বাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক বহুদিনের অদর্শন-জনিত মানসিক উদ্বেগ নিবারণ করিবার মানসে শরৎ মহারাজকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আবার ঐ দেখ, তোমাদের পরমারাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে আধআধ হাস্যে ভুবন-সুন্দর মুখমণ্ডল উজ্জ্বলীকৃত করিয়া স্বীয় পার্ষদগণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিতেছেন,—তোমরা স্থূল দেহে এতদিন ধর্ম্মোপদেষ্টা-স্বরূপে এই সসাগরা, সদ্বীপা ধরামণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিয়াছ, এখন আমার সহিত কিছুদিন বিশ্রাম সুখ অনুভব কর, পরে ক্লান্তির অপগমে প্রয়োজন মত তোমাদের সহিত পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া লীলা বিস্তার করিব।

এই সন্তাপনাশিনী অশরীরী বাণীই এখন আমাদিগের করস্থিত দণ্ড হউক। এই দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া দেহপাত পর্য্যন্ত আমরা এই শোকদুঃখসমাকুল সংসারের বন্ধুর পথে পরিভ্রমণ করিব। মূঢ় মন বুঝিয়াও বুঝেনা যে, ইহ সংসারে যাহা জাত হয় তাহাই কিছুদিন স্থিতি লাভ করিয়া অবশেষে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। দেহটা জন্ম গ্রহণ করে এই কারণে তাহার অবসান হয়। দেহী কোনদিনই জাত হয় নাই, অতএব তাহার বিনাশও নাই। সে বস্তু পুরাণ ও শাশ্বত, সুতরাং অবিনাশী। কে কবে চৈতন্যের মৃত্যু দেখিয়াছে? যখন তাহার কোনও সাক্ষী নাই তখন কেন জড়দেহের বিনাশ দেখিয়া কাতর হও?

শোকেরই বা অবসর কোথায়? যিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, যৌবনের বিলাসবিভ্রম যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, সেই কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষ যে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ধামে গমন করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? শোকাভিভূত হইলে আমরা যে, তাঁহার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব মন বৃথা শোকের বশ্য হইও না। তবে তাঁহার অদর্শন-জনিত কিছু অভাব অনুভব করিতেছ সত্য, কিন্তু কেন বিশেষরূপে

অভাবগ্রস্ত হইয়াছ। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, এইরূপ বিরহই নিয়তির মর্য্যাদা—কেননা সংযোগ হইলেই বিয়োগ দুঃখানুভব করিতে হইবেই হইবে। ক্ষিতিতলে এমন নরনারী নাই যাঁহারা মিলন ও বিচ্ছেদজাত সুখ দুঃখ অনুভব না করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত ভাবে যেদিন সেই মহাপুরুষের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, সে বহুদিনের কথা। সেই অবধিই তিনি ভালবাসার চক্ষে আমাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। সেই আকর্ষণে আমি প্রতিদিনই তাঁহার সহিত সদালাপে, অধ্যাত্মকথাপ্রসঙ্গে দুই এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতাম। মনে হইত, ভাগ্যক্রমে আমার এই দুর্লভ সাধুসঙ্গ ঘটিয়াছে। তিনি যখন ধ্যান ধারণা পূজা-পাঠাদি সাঙ্গ করিয়া দিবসান্তে বাহিরের কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া আসন গ্রহণ করিতেন তখন তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিবার জন্য অপেক্ষায় বহুতর ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত থাকিতেন। আমিও সেই সময় দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া যাইতাম। একবার তাঁহার নয়নরশ্মির গোচর হইলেই সেই জনতা মধ্য হইতে দুই একজনকে অন্য গৃহে যাইতে আদেশ দিয়া সেই গৃহমধ্যে আমার উপবেশনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, তাহাতে আমি বিশেষ সঙ্কোচ অনুভব করিতাম। সঙ্কোচ প্রকাশ করিলে সুমধুর গম্ভীরবাক্যে উত্তর দিতেন, "আপনার কথা সাধারণের সহিত তুলনা হইতে পারে না।" ইহাতে আমি আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতাম এবং মনে হইত—তিনি আমাকে শুধু ভালবাসিতেন এরূপ নহে, আমাকে একটু শ্রদ্ধার চক্ষুতেও দৃষ্টি করিতেন। দুই একদিন কার্য্যবশে দেখা না করিতে পারিলে আমার বাটীতে লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লইতেন। এমন কি স্বতঃ পরতঃ আমার শুভসাধনে যত্নবান ছিলেন। বলিতে কি, সারাদিন এই মায়ামোহময় সুখদুঃখসমাকুল সংসারযাতনা ভোগ করিয়া যখনই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতাম তখনই চিত্তের বিশ্রান্তি বোধ হইত। তিনি আমাদিগের একজন পরমাত্মীয় উপদেষ্টা এবং হিতকারী বন্ধু ছিলেন। দেহত্যাগের কতিপয় দিন পূর্ব্বে আমায় বলিয়াছিলেন, "ক্ষীরোদ ত আমাদের ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গেল, দেখিবেন, আপনিও

যেন সেরূপ করিবেন না।" এখন দেখিতেছি, তিনিই আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া আপনিই পলাইয়া গেলেন।

যতদূর তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তিনি একজন মুক্ত পুরুষ ছিলেন। কুম্ভকারের চক্র-সদৃশ নিজের প্রাক্তনদেহের অবসান প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা প্রভৃতি অনন্য সাধারণ গুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন, তাঁহাতে রাগ দ্বেষ অহঙ্কার কোন দিনই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। পরের দুঃখ দেখিলে তাহা আপনাতে আরোপ করিয়া কাতর হইতেন এবং যথাসাধ্য দুঃখ প্রতিকারের জন্য যত্নবান হইতেন। তাঁহাকে স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও উদারতার প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। এখন কি রোগের তীব্র যাতনাও তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারিত না। পাছে ভক্তবর্গ কাতর হয় এই-জন্য শারীরিক ক্লেশ কাহাকেও বুঝিতে দিতেন না। সমস্ত শাস্ত্র তাঁহার অধীত ছিল এবং কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সারগর্ভ বক্তৃতা যিনি শ্রবণ-গোচর করিয়াছেন তিনি তাঁহার ভাষাদ্বয়ে কৃতিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার রচনাচাতুর্য্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' এবং অন্যান্য পুস্তকে অনেকেই দৃষ্টি গোচর করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি পরিচয় দিব, সুধীমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন।

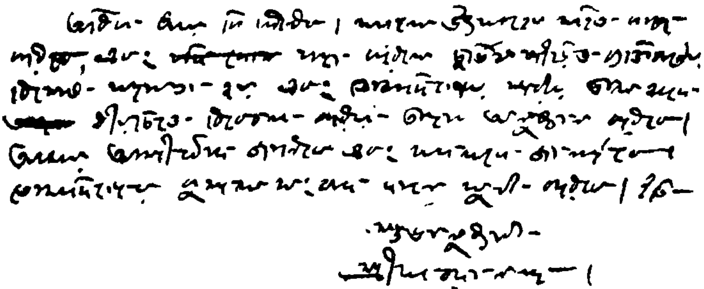
এক সময়ে সরকার বাহাদুরের ঈষৎ বক্র দৃষ্টি দ্বারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। রাজনৈতিক ও স্বদেশী আন্দোলন সময়ে কতকগুলি নিরপরাধ কৃতবিদ্য যুবকের গতি সরকার বাহাদুরের লক্ষ্য-স্থল হইয়াছিল। সেই সকল যুবক তাহাদের ভবিষ্যজীবন অন্ধকারে আবৃত হইতেছে দেখিয়া অনন্যোপায়ে মহারাজের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিলে তিনি সাদরে তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া নিজ অঙ্কে স্থান দান করিয়াছিলেন। ইহাই রাজপ্রতিনিধিগণের মিশনের উপর বোধ হয় সন্দেহের কারণ। যাহা হউক তিনি তদানীন্তন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা শ্রীমান্ লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গভীর উদার যুক্তিপূর্ণ আলাপে তাঁহার সে সন্দেহ অপসারিত করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-

সংঘকে চিরদিনের জন্য নিরাপদ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বড় একটা কম শক্তির কথা নহে—সিংহের কবল হইতে শিকার ছিনাইয়া লওয়ায় যে শক্তির প্রয়োজন, ইঁহাকে সেইরূপ শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। অধিক কি বলিব, তাঁহার উপমা তাঁহাতেই, যেমন—"গগনং গগনাকারং সাগরো সাগরোপমঃ।"

অলমতিবিস্তরেণ

শ্রীআশুতোষ বন্দোপাধ্যায়

স্বামী সারদানন্দের হস্তলিপি



স্বামী সারদানন্দের কথা

৭ই মার্চ্চ, ১৯২৭

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ জনৈক ভক্তকে বলিলেন,—কয়েকদিন পরে উৎসব হবে; উৎসবটা দেখে যাবে। ২৪,০০০।২৫,০০০ লোক বসে প্রসাদ পায়, আর কত লোক যে হাতে প্রসাদ নেয়, তার ইয়ত্তা নেই। এরকম বিরাট ব্যাপার এখন আর ভারতের কোথায় আছে? (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ, তবে এক জায়গায় আছে বটে,—শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে। ওখানেও যত লোকই যাক্, সকলেই প্রসাদ পায়। (তৎপরে ওখানকার রান্নার প্রণালী ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধে অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।)

* * * * ওখানেও বিরাট আয়োজন। ওখনকার রাঁধুনীদিগকে 'শোয়ার' বলে। 'শোয়ার' কিনা 'শবর'। প্রবাদ আছে, অতি প্রাচীনকালে এই শবরজাতির এক বিগ্রহ ছিল। তারা জঙ্গলে এই বিগ্রহের পূজাদি কোরতো;—এমন গোপনে কোরতো যে, এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতো না। পরে এক ব্রাহ্মণ একথা জানতে পারেন, তারপর রাজাকে (স্থানীয় রাজা) শবরদিগের গুপ্ত পূজার কথা জানান। রাজা (ধৃষ্টদ্যুম্ন) বিগ্রহ দেখ্‌তে ইচ্ছা করলেন। ঐ ব্রাহ্মণ শবর-কন্যাকে বে' করে শবর হলেন। তখন শবরেরা তাঁকে তাদের বিগ্রহ দেখালে। কিন্তু চোখ বেঁধে নিয়ে গেল ও নিয়ে এল। বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ সঙ্গে সরষে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তাই ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিলেন। পরে সরষে গাছ ধরে—একাই একদিন বিগ্রহ দেখে এলেন; এবং রাজাকে একদিন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখলেন,—সেই বিগ্রহের স্থানটি ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে বিগ্রহাদি কিছুই নেই। তখন তাঁরা খুব দুঃখিত হলেন

দৈব-বাণী হোল যে, তাঁদের সামনে একখণ্ড কাঠ ভেসে আসবে। তাতে অনৈক মিস্ত্রীর দ্বারা বিগ্রহ তৈরী করালে শ্রীভগবান্ তাতে আবির্ভূত হবেন।

দৈব বাণী সত্য হোল!—কাঠ ভেসে এল। অনৈক বৃদ্ধ আগন্তুক মিস্ত্রী মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে প্রস্তুত হলেন। তবে তাঁর এই একটি condition (সর্ত্ত) রৈল যে 'সে এই কাঠটি নিয়ে একটি ঘরে ঢুকবে। সেই ঘরে সে ছাড়া আর কেউই থাকতে পাবে না। ঘরের তালা বন্ধ করে দিতে হবে। সে নিজে যতদিন না ইঙ্গিত করে ততদিন কেউই তালা খুলতে পাবে না। যদি খোলে, তবে সে আর মূর্ত্তি তৈরী কোরবে না। মিস্ত্রী কাঠটি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ঘরের তালাও বন্ধ করা হোল। দুএকদিন ভেতর হতে যন্ত্রাদির শব্দ শুনা গেল; পরে আর কিছুই শুনা গেল না। তখন সন্দেহ হোল—বুঝি বৃদ্ধ মারা গেছে। দ্বার খোলা হোল। ঘরে কেউই নেই। মূর্ত্তিটি আধ-গড়া হয়ে পড়ে আছে। রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। আবার দৈব-বাণী হোল—"আমি বিশ্ব-কর্ম্মা, তোমাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে দিতে গিয়েছিলাম। তোমরা আমার কথামত কাজ কর নাই, তাই চলে এসেছি। মূর্ত্তিও সম্পূর্ণ হয় নাই। যা হোক্, চিন্তা কোরো না। ওতেই প্রতিষ্ঠা কর। ওতেই শ্রীভগবানের আবির্ভাব হবে।" সেই মূর্ত্তিটিই প্রতিষ্ঠা করা হোল। এই উপাখ্যানটি 'সুতসংহিতা' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি বোধহয় 'স্কন্দপুরাণে'র অন্তর্গত।

প্রঃ—আচ্ছা, স্কন্দপুরাণ তো ব্যাসদেব-কৃত?

উঃ—ব্যাসদেবের নামে অমন কত গ্রন্থ চলে যাচ্ছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি এখন যে সমস্ত research (অনুসন্ধান) করছেন, তাতে কিন্তু অন্য রকম বুঝা যায়। এঁরা বলেন,—শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার যে তিনটি মূর্ত্তি আছে, তা পূর্ব্বে শ্রীবুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের symbols (প্রতীক) ছিল। সেইগুলিকেই কিছু রূপান্তরিত করে আধুনিক মূর্ত্তি তিনটি তৈরী করা হয়েছে। এই মতের সমর্থনের অনুকূল অনেক facts and materials (প্রমাণ) পাওয়া গিয়েছে, যেমন—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের compound এর (আঙ্গিনার) ভিতর একটি মন্দিরে শ্রীবুদ্ধের ধ্যান-মূর্ত্তি রয়েছে। হিন্দুরা ঐ মূর্ত্তির সামনে একটি দেওয়াল নির্ম্মাণ করে তাতে হিন্দু দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছে। শুনা যায়,—পূর্ব্বে যেখানে যেখানে বৌদ্ধদের প্রধান প্রধান মঠ বা চৈত্য ছিল, সেইখানেই হিন্দুরা দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে, সেইগুলিকে eclipsed (হীনপ্রভ) করবার চেষ্টা করেছিল। আরও দেখা যায়, এই যে শ্রীক্ষেত্রে কোনরূপ জাতি-বিচার নেই, তাহাও বোধ হয় বৌদ্ধদেরই প্রভাবের ফল। শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধনমঠ, পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের compound এর মধ্যেই ছিল। তখন শুনা যায়—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মূর্ত্তি শিব-বিগ্রহরূপে উপাসিত হোত, এবং প্রত্যহ গাডী গাড়ী বিল্ব-পত্র ঐ বিগ্রহের উপর বর্ষিত হোত। পরে যখন বৈষ্ণবদের প্রাধান্য হয়, তখন পুনরায় ঐ বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণু-মূর্ত্তিরূপে উপাসিত হতে থাকে ; এবং তাহার উপর তখন রাশি রাশি তুলসী-পত্র বর্ষিত হতে থাকে। এখন যে ভাবে উপাসনাদি চলেছে তার সূত্রপাত বৈষ্ণবদের সময় হতে হয়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা মহারাজ, বুদ্ধদেব কি কোথাও জ্ঞান-কাণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন ?

উঃ—না, তিনি প্রকারান্তরে তাঁর নিজের ভাবে জ্ঞান-কাণ্ডে যা আছে তাই বলে গিয়েছেন। তাঁর উপদেশাবলী তিনি তখনকার চলিত ভাষা 'পালি'তে দিয়েছিলেন।

প্রঃ—তাহলে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যেরূপ বলে গিয়েছেন সেরূপ বোধ হয় জ্ঞান-কাণ্ডের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই ?

উঃ—না, তা বলেন নাই। তখন অনেক পশু-বধ করা হোত। এইজন্যই তিনি অহিংসার উপর এত জোর দিয়ে গিয়েছেন। বৌদ্ধদের দুইটি প্রধান শাখা আছে (হীনযান ও মহাযান)। যে শাখাটি (হীন-যান) সিংহলে দৃষ্ট হয় তারা হিন্দুদের দেবদেবীর পূজা করে না, মাত্র শ্রীবুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকে। আর যে শাখাটি (মহাযান) তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে দৃষ্ট হয়, তারা হিন্দুদের দেবদেবীতে বিশ্বাস করে, এবং নিজেরাও পূজাদি করে থাকে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭

শ্রীবুদ্ধদেবের কথা চলছিলো। তিনি নিজে কত কঠোরতা করে-ছিলেন, অথচ অপরকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন—এই সব সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

জনৈক ভক্ত—সাধারণ মানুষের শরীর-মনে অত্যন্ত কঠোরতা সহ্য হবে না বলেই, তিনি মধ্যপন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

একজন মহারাজকে প্রশ্ন করিলেন—কেউ কেউ যে কঠোরতা করে শরীর ভেঙ্গে ফেলে, তা কিরূপে করে? আনন্দে বিভোর হয়ে কি শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখতে ভুলে যায়?

মহারাজ বলিলেন—সব সময় যে আনন্দ পায়, তা নয়। কেউ কেউ আবার আনন্দ পাবে এই আশায় ওরূপ করে থাকে।

প্রঃ—মহারাজ, শরীর-মন শুদ্ধ হলে সাধক কি নিজে বুঝ্‌তে পারে?

উঃ—হাঁ, পারে বৈকি। তখন সে নিজেই বোঝে যে, পূর্ব্বের মত বাজে চিন্তা আর হচ্ছে না, তা ছাড়া শান্তি অনুভব করে।

প্রঃ—আচ্ছা, আমাদের মুক্ত করে দিলে ভগবানের ক্ষতি কি?

মহারাজ মৃদু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন—বৃদ্ধিও তো নেই।

প্রঃ—তবে তাঁকে ডেকে লাভ কি? না ডেকে থাকতে পারি না বলেই কি ডাকি?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—মনে যে দুঃখ কষ্ট হয় এর কারণ কি?

উঃ—বিশ্বাস নেই ব'লে।

প্রঃ—কখনও কখনও এমনও দেখা যায়—সাধন-ভজন না করেও বেশ বিশ্বাস লাভ করেছে; এ কেমন করে হয়?

উঃ—হয়তো পূর্ব্বজন্মে খুব করেছিল।

প্রঃ—কর্ম্মযোগ ও নিষ্কাম ভক্তিযোগ—উভয়ই কি এক?

উঃ—নিষ্কাম ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগের মধ্যে, তবে এ ছাড়াও কর্ম্মযোগ আছে।

প্রঃ—নিষ্কাম ভক্তিযোগ বল্‌লে কি বুঝায়?

উঃ—পূজা পাঠ প্রভৃতি যা কিছু করা যায় সকলই তাঁর উদ্দেশ্যে—একেই নিষ্কাম ভক্তি বলে।

প্রঃ—আচ্ছা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজকার্য্য-পরিচালন প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে কি না?

উঃ—না, ওসব নয়।

প্রঃ—কর্ম্মযোগ কাকে বলে?

উঃ—ফলাফলের দিকে নজর না দিয়ে কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কাজ করার নামই কর্ম্মযোগ। স্বর্গাদি কামনাও থাক্‌বে না।

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ কর্‌তে বল্‌লেন, আর উদ্ধবকে উত্তরাখণ্ডে তপস্যা কর্‌তে বল্‌লেন—এর কারণ কি?

উঃ—অধিকারিভেদে ভিন্ন ব্যবস্থা।

প্রঃ—নিবৃত্তি-মার্গই যখন শ্রেয়ঃ, তখন কখনও কখনও ওর মধ্যেও প্রবৃত্তি-মার্গের সংযোগ দেখা যায় কেন?

উঃ—সাধারণকে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিবৃত্তি-মার্গে যেতে হবে বলেই ওরূপ বিধান।

প্রঃ—যা ভাল তা অপরে গ্রহণ কর্‌তে না চাইলেও, force (জোর) করা তো উচিত?

উঃ—Force (জোর) কর্‌লে কিছু ফল হয় না। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া ভাল। স্বেচ্ছায় নিবৃত্তি-পরায়ণ হবে। জোর করে চাপাতে গেলে অনেক সময় উল্টো ফল হয়। বাইরে এক রকম দেখায় আর ভিতরে গোপনে গোপনে অন্য রকম আচরণ করে।

প্রঃ—বিধবা-বিবাহ ভাল কি মন্দ?

উঃ—Highest ideal (উচ্চ আদর্শ) যদি কেউ follow (অনুসরণ) কর্‌তে না পারে, তবে সে জায়গায় বিবাহ দেওয়াই ভাল।

প্রঃ—স্বামিজীত এর against এ (বিরুদ্ধে) বলে গিয়েছেন।

উঃ—তিনি বলে গিয়েছেন ওসব সামাজিক বিষয়, এত কিছু important (প্রয়োজনীয়) নয়। ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ সামনে ধর, সমাজ ঠিক হয়ে যাবে।

২৭শে জুন, ১৯২৭

মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—ভগবান্ মানুষকে তাঁর বিষয় চিন্তা কর্‌বার যে শক্তি দিয়েছেন—এ একটা মস্ত privilege (সুবিধা)।

প্র :—তা হলে তাঁর সম্বন্ধে doubtful way তে (সন্দিগ্ধ মনে) চিন্তা করা কি মানুষের পক্ষে audacity (ধৃষ্টতা) ?

উ :—audacity (ধৃষ্টতা) তো নিশ্চয়ই। দেখ না, এমন কি তাঁর origin (মূল) পর্য্যন্ত question (প্রশ্ন) কর্‌ছে।—কেউ বল্‌ছে 'আছে', কেউ বল্‌ছে 'নেই' ইত্যাদি।

প্র :—একটা কি সিদ্ধান্ত হয় না ?

উ :—কেন হবে না ? পূর্ব্বকালের ঋষিরা ত সিদ্ধান্ত করে গিয়েছেন। যাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাঁরাই নিশ্চিন্ত, অপরে ঘুরে মরে।

প্র :—তা হলে যতদিন না সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ততদিন বিচার কর্‌তে হবে ?

উ :—হাঁ, যতদিন না হয় ততদিন মাথা খুঁড়্‌তে থাক।

প্র :—আচ্ছা, মানুষ এই যে তাঁর সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা কর্‌ছে, অথচ জানতে পার্‌ছে না—এটা তাঁর পক্ষে অন্যায় নয় ? তিনি সব নিজের হাতে লুকিয়ে রেখেছেন, কাকেও কিছু জান্‌তে দিচ্ছেন না !

উ :—তিনি যদি বলেন, "আমি যে নিজেই সব হয়েছি। তুই বকছিস্ কি ?"

(ইহা শুনিয়া প্রশ্নকারী চুপ করিলেন।)

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার জনৈক ভগিনীকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন, —তিনি যত শীঘ্র পারেন যেন 'উদ্বোধনে' পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাজ এই কথা বলিয়া বলিলেন,— "কই আমাকে তো কিছুই স্বপ্ন দেন নাই !"

জনৈক সাধু—হাঁ, ঐ রকম দুজনে একই রকম স্বপ্ন দেখ্‌লে তবে স্বপ্ন সম্বন্ধে একটা theory তে (সিদ্ধান্তে) আসা যায়।

প্রঃ—শুনা যায় নাকি স্বামিজী আমেরিকা যাবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমা ও তিনি একই প্রকার স্বপ্ন দেখেছিলেন ? বইয়ে পড়েছি।

উঃ—না, তা ঠিক নয়; তবে স্বামিজী আমেরিকা যাবার পূর্ব্বে 'মা' ঐ সম্বন্ধে একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন; তা এই—শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজী গঙ্গায় নামলেন। ঠাকুর গঙ্গায় মিশে গেলেন; স্বামিজী সেই জল তুলে তুলে উপরে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন;—(অর্থাৎ জীবের উদ্ধারের জন্তে তিনি ঠাকুরের ভাব ছড়াতে লাগলেন।)

(স্বামিজীর অলৌকিক শক্তি-সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।)

মহারাজ—হাঁ, ও রকম শক্তি তাঁর ছিল। একবার আমেরিকায় একটা দুষ্ট লোক তাঁকে পরীক্ষা করতে আসে। তিনি তার হাত দেখে তার জীবনের সমস্ত ঘটনা বলে দিয়েছিলেন। লোকটা অবাক হয়ে গেল, আর তাঁর কাছে এলো না।

প্রঃ—ওরকম শক্তি কি সব সময় তাঁর থাকতো ?

উঃ—না, সব সময় থাকতো না। (ইহার প্রমাণ-স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিলেন।) তাঁর প্রথম শক্তির বিকাশ আমরা দেখি কাশীপুরের বাগানে শিবরাত্রির দিনে। তিনি অভেদানন্দ স্বামীকে তাঁর পা ছুঁয়ে থাকতে বল্লেন। তিনি যখন ধরে রইলেন তখন তাঁর হাতটা যেমন electric shock (তড়িৎ প্রবাহ) লাগ্‌লে কাঁপতে থাকে সেই রকম কাঁপতে লাগলো। তিনি ওদেশে lecture দিয়ে এসে বলেছিলেন, "আমার সমস্ত শক্তিটা ওদেশে ছড়িয়ে দিয়ে এলুম। যখন lecture দিতুম, তখন দেখ্‌তুম যে, ভিতর থেকে একটা শক্তি বেরিয়ে গিয়ে লোককে অনুপ্রাণিত করছে।" স্বামিজীর অনেক সময় অনেক দর্শনাদি হোত। তিনি বল্‌তেন, ওগুলো symbolical representations (যেমন শ্রীশ্রীমায়ের উক্ত স্বপ্ন-দর্শন)। তিনি দর্শনাদিতে—যেমন retina তে (চক্ষু-গোলকে) inverse pictures (উল্টা ছবি) পড়ে—সেই রকম দেখ্‌তেন।

স্বামিপাদ

ধর্ম্মবীর—কর্ম্মবীর—বীর সাধকাগ্রগণ্য,
রামকৃষ্ণ সংঘ-মাঝে উজ্জ্বল-যতি-বরেণ্য ;
স্বামিজীর দক্ষপাণি,
গুরুকার্য্যে প্রাণ দানি,
গভীর সমাধি মুখে করিলে মহা প্রয়াণ ।
তোমার অভাবে আজি ধরা শোকে মুহ্যমান্ ॥ ১
প্রশান্ত-সাগর সম গভীর হৃদয়বান,
রাগদ্বেষ-লোভশূন্য—কঠোর-কর্ম্মী মহান্ ।
অপার করুণাধার,
মহাদ্বন্দ্বে নির্ব্বিকার,
বাহ্য আড়ম্বর-হীন ছিল তব কর্ম্মগতি
সাধ্যে তাই সিদ্ধি তব শ্রীকরে করিত স্থিতি ॥ ২
দেখিনি জীবনে কভু বিরক্তি বা প্রতিবাদ,
গলিত-গঙ্গার-ধারা বহমান্ আশীর্ব্বাদ ;
হেন ভক্তি ভাবুকতা,
হেন স্নেহ-প্রবণতা,
কদাচিৎ মর-লোকে দৃষ্ট হয় ভাগ্যবশে ।
দেবত্ব পাইল কত তোমার পদ-পরশে ॥ ৩
রামকৃষ্ণ-সংঘ-মঠ-আশ্রম যত যথায়,
তব প্রেমে বদ্ধছিল সূত্রে মণিগণ প্রায় ।
শত্রু-মিত্র উদাসীন
সবে তব স্নেহাধীন,
ভাগ্যবান্ সেই যেবা আসিল তব পরশে ।
ব্যাপিল আ-বঙ্গ-ধরা তব শুভ্র জ্যোতি-যশে ॥ ৪

জয়রামবাটী-মঠ-মন্দির কীর্ত্তি মহতী
ঘোষিবে তোমার নাম—যতদিন সংঘস্থিতি।
মরুভূমি সমস্থলে,
সাজাইলে জলে ফলে,
কত বিদগধ প্রাণে দিলে শান্তি শীতলতা।
ভুবন-ব্যাপিনী কীর্ত্তি তব যে রহিল গাথা॥ ৫
যে উদার ভাবে সংঘ বাঁধা রবে ভবিষ্যতে
করিবে অশেষ কর্ম্ম জগতে জীবের হিতে
সে ভাবের মর্ম্মবাণী
শুনালে হয়ে অগ্রণী
প্রথম সংঘসভাতে—বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে।
গতবর্ষে—ন্যাসি-গৃহি-ভক্ত-সম্মিলন-দিনে॥ ৬
শ্রীহীন হয়েছে সংঘ আজি তব অপ্রকটে
তব পূত দীপ্ত মূর্ত্তি জাগিছে হৃদয় পটে।
'উদ্‌বোধন' মঠে আজ
পড়েছে নির্ম্মম বাজ
শূন্য হেরি দশ দিশি হে যতি!　তব বিহনে।
তব পূতস্মৃতি যেন জাগ্রত থাকে মননে॥ ৭
গুরু কার্য্য সাঙ্গ করি—গিয়েছ চরণে তাঁর,
বহিয়া নিয়েছ শিরে—কত ভক্তজন ভার।
শ্রীচরণ শিরে ধরি,
তব পুণ্য নাম স্মরি,
এদীন নয়ন নীরে—রচিল প্রয়াণ-গীতি।
আশীষ অন্তিমে পাই রামকৃষ্ণলোকে স্থিতি॥ ৮

শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

একখানি চিঠি

প্রিয়—

এই করিয়াই কি মহামায়া খেলা করেন? হায় হায়! এবারে যে একেবারে সব শেষ করিয়া দিলেন! আর ত কিছুই রহিল না। একটু দাঁড়াইবার, জ্বালা জুড়াইবার শেষ আশ্রয়টুকু ছিনাইয়া লইয়া গেলেন। কি বলিব—বুকের ভিতরটায় যে কি হইতেছে তাহা আমি জানি, আর আমার অন্তর্য্যামী যিনি আছেন তিনিই জানেন। কি কুক্ষণে এবার বাহির হইয়াছিলাম। এতদিন আশে পাশে ঘুরিয়া ও নানা ভাবে তাঁহারই অহেতুক স্নেহ করুণার আবরণে জীবন ধারণ করিয়া শেষে এই হইল যে, শেষ সময়ে তাঁহার একটু শ্রীচরণ সেবা হইতেও বঞ্চিত হইলাম। কত কথা, কত স্মৃতি মনে পড়িতেছে; তাহা লইয়াই ভগ্ন-হৃদয়ে চোখের জল আর হা-হুতাশ সম্বল হইয়াছে। কিন্তু তবুও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সবই করিতে হইবে। শ্রীশ্রীমহারাজ বলিতেন,—'তপ্ত জলে খড় পোড়ে না'। আজ আমার অবস্থা তাহাই হইয়াছে! অসহ্য উত্তাপ, কিন্তু পুড়িয়া মরিব না। ধন্য মহামায়া!

কি বলিব, যেদিন তাঁহার কাছে বিদায় ও আশীর্ব্বাদ লইতে গেলাম, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—'বাবা, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ফিরে এসো।' মন্দভাগ্য আমি—ভিন্নরূপ করিয়া বসিলাম। আজ সেই কর্ম্মেরই বোধ হয় ফলভোগ হইতেছে—পাঁজর ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ও তপ্ত চোখের জলে। ভারতের সীমান্ত প্রদেশ হইতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং পত্রে তাহা পাইয়াছিলাম। ভীষণ কষ্টকর পথে চলিতে চলিতে কতবার কতভাবে তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলাম—কতবার যে ভীষণ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি, ও তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদ ও ভগবানের দয়ার কথা মনে করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বলতে পারি না। তখন কত ভাবিয়াছিলাম,

ফিরিয়া আসিয়া মহারাজের কাছে ঐ সকল অভিজ্ঞতার * * * কথা বলিয়া আরো আনন্দ লাভ করিব। আরো কত কি ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! আমার সব আশা ভরসার মূল ভগবান অলক্ষ্যে ছেদন করিয়া দিয়া একবারে পথে দাঁড় করাইয়া দিলেন। কি কর্ম্ম লইয়া যে জন্মিয়াছিলাম আর কত অপরাধই যে মহারাজের শ্রীচরণে করিয়াছিলাম—বুদ্ধি-বৈগুণ্য ঘটাইয়া ও বাসনার ফেরে ফেলিয়া তাই তিনি শেষে এই মনস্তাপরূপ ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জন্যই যেন এই সময়ে তাঁহার নিকট হইতে আমায় সরাইয়া দিয়াছিলেন। পত্রে লিখিয়া আপনাকে আর মনোবেদনা কি জানাইব—আপনি আমাকে জানেন ও সবই বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার নিজের দিক হইতে দেখিলে তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন তাহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল কিছুই নাই—খুব সত্য কথা। রোগ ও জরাজীর্ণ দুর্ব্বহ জীবনভার লইয়া তিনি এতদিন আমাদেরই কল্যাণের জন্য কতই না কষ্ট করিতেছিলেন! নিজের কর্ম্ম সব শেষ করিয়াও মাত্র আমাদেরই জন্য এই ভীষণ সংসারমঞ্চে নানা ভাবে জীবন-নাট্যের অভিনয় করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগা আমরা, তাঁহার জীবনের সেই অহেতুক নিঃস্বার্থ ভাবের বিন্দুমাত্রও, তাঁহার প্রতি কি জীবনে, কি মরণে কোন সময়েই দেখাইতে পারিলাম না। কেবল নিজেরা যে অমূল্য নিধি হারাইলাম তাহাই ভাবিয়া শোক করিতেছি ও করিতে থাকিব।

তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ ও ইচ্ছার বলে নানা প্রকার অবস্থা বিপর্যায় ও বিপদ অতিক্রম করিয়া গত ২২শে আগষ্ট তারিখে সবে—আশ্রমভূমিতে পা দিয়াছি, আর অমনি তত্রত্য অধ্যক্ষ আমায় গলা জড়াইয়া ধরিয়া 'আমাদের সব গেল'—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মুহূর্ত্তেক হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিতেই অকস্মাৎ মহারাজের মূর্ত্তিখানি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা ভয়ানক ভাবে কাঁপিয়া উঠিল। ব্যাকুল ভাবে কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে পর, তিনি মহারাজের অসুস্থ সংবাদ দিয়া কয়েকখানি পত্র দেখাইলেন। তখনই ক্ষণিকের জন্য মনে আসিয়াছিল যে, এবারে হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আর সেই সঙ্গে দেহ মন অবসন্ন হইয়া

পড়িল। কিন্তু অনিশ্চিতের উপর স্বপ্নেরও অগোচর চিন্তাকে এরূপ ভাবে মনে স্থান দিতেও ভয় হইতে লাগিল এবং নানা ভাবে মনকে প্রবোধ দিয়া পরদিন কলিকাতা রওনা হইব স্থির করিয়াছিলাম। তখন স্বামী— বলিলেন, তিনি পরদিবস একখানি তারের খবর কলিকাতা হইতে পাইবার আশা করিতেছেন এবং আমাকে ঐ খবরটা জানিয়া পরে রওনা হইতে অনুরোধ করিলেন। পরদিন তারের খবর আসিল—কলিকাতা হইতে ১৭ই তারিখে করা তার—'Sarat Maharaj improving but not out of danger'. ঐ দিবসই বিকালে স্বামী—লিখিত একখানি পোষ্টকার্ড ও তারের খবর পাওয়া গেল। তারের খবরে ছিল—'Improving—hopeful,' কিন্তু পোষ্টকার্ডে এই খবর ছিল যে, wire পাঠাইবার পরই আবার এখানে তাঁহারা wire পাইয়াছিলেন, তাহার wordings এইরূপ—'Sudden change Condition extremely grave'. ইহা ১৮ তারিখের খবর। যাহা হউক এই খবর মাথায় লইয়া এক প্রকার পাগলের মত অবস্থায় পরদিন ভীষণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আশ্রম হইতে বাহির হই এবং প্রায় চার দিনের মধ্যে ৯২ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গতকল্য সকালে এখানে উপস্থিত হইয়া এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া বজ্রাহতের ন্যায় পড়িয়া আছি। কলিকাতা যাওয়া আর দরকার হইল না। শীঘ্র হইবেও না। ঐ হাহাকারপূর্ণ শ্মশানে যাইবার ইচ্ছা বা সাহসও আমার আর নাই। এইখানেই চারিদিকে যেন ভীষণ দাবানল জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহাতে আছে কেবল অসহ্য উত্তাপ, অগ্নির লেলীহান জিহ্বা নাই। তাহা থাকিবেও না, কারণ তাহা হইলে ত আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না!

বিভিন্ন বৃত্তি ও সংস্কার লইয়া জন্মিয়াও এতদিন আমরা সকলে এক একটি শীতল ছায়ার আশ্রয়ে বেশ কাটাইতেছিলাম—জ্বালা জুড়াইতেছিলাম, কিন্তু কালের নির্ম্মম হাত, দৃশ্য জগৎ হইতে একটি একটি করিয়া ঐ আশ্রয়গুলি সরাইয়া লইতেছে। ইহার পর আরো যে কি হইবে জানি না—ভাবিতেও পারি না, আর ভাবিবার অবসরও নাই। কিন্তু এবারে যাহা হইল তাহাতে আমাকে

একেবারে নিরাশ্রয় করিয়া রাখিয়াছে। যে অপরিসীম ধৈর্য্য ও ক্ষমার দ্বারা তিনি আমাকে কোলে স্থান দিয়া রাখিয়াছিলেন, এ জগতে সে জিনিষের একান্ত অভাব হইয়া গেল। সে স্নেহ, সে দয়া ও সহানুভূতি ত আর কোথায়ও পাইব না! চারিদিক হইতে নিদারুণ যন্ত্রণা পাইয়া যখন অসহনীয় বোধ হইত তখন ঐ পায়ের তলায় বসিয়া দুটি মিষ্টি কথা শুনিয়া গা জুড়াইত। এখন তাহাও মিলাইয়া গেল। সম্বল কেবল অতীতের স্মৃতি, আর তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস। বাকী জীবনটুকু তাহা লইয়া কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হই।

শ্রী—

হে শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতা! তুমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও বীরেশ্বর শ্রীবিবেকানন্দ-প্রচারিত মহাসত্য সকল যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই অপার-মহিম অপ্রতিহত-প্রভাব গুরুশক্তির কথা ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারে দৃঢ়বদ্ধপরিকর হইয়া "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—রূপ অভয়বাণী উচ্চারণে সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার কর! নবযুগে তোমাতে নবশক্তি সঞ্চারিত হউক—প্রকাশিত হউক!

স্বামী সারদানন্দ

*　　*　　*

হে পাঠক! শ্রীভগবান্ জগদ্‌গুরুরূপে সত্য সত্যই পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন। আশ্বস্ত হৃদয়ে শ্রবণ কর, তাঁহার পূত আশীর্ব্বাণী,—"যত মত, তত পথ" "সর্ব্বান্তঃকরণে যাহাই অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইতেই তুমি শ্রীভগবানকে লাভ করিবে।" মুগ্ধ হইয়া মনন কর—পরাবিদ্যা পুনরানয়নের জন্য তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যা!—এবং তাঁহার কামগন্ধহীন পুণ্য চরিত্রের যথাসাধ্য আলোচনা ও ধ্যান করিয়া, আইস, আমরা উভয়ে পবিত্র হই।

স্বামী সারদানন্দ

মাধুকরী

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ

বাঙ্গলার নবযুগের নবীন সন্ন্যাসের গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণগিরিচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, শান্তগম্ভীর নিস্তরঙ্গ জ্ঞানসমুদ্র শুকাইয়া গেল, শ্রীরাম-কৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজী, নরলীলা সম্পূর্ণ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন।

ভবিষ্য-ভারতের মহা-অভ্যুত্থানের আদর্শরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আদর্শ দেশ তথা জগতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করিয়াছিলেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ",—সেদিন যাঁহারা ত্যাগ, তপস্যা, চরিত্রবল, বিদ্যা লইয়া সে আদর্শপ্রতিষ্ঠা জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। অলোকসামান্য প্রতিভা, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, প্রখর পাণ্ডিত্যের সহিত শিশুর সারল্য ও বজ্রের দৃঢ়তা—তাঁহার মধ্যে, কঠোর তপস্যার উত্তাপে গলিয়া একটা গোটা মানুষ গড়িয়াছিল,—সম্মুখে দাঁড়াইলেই সেই মানুষটির পরিচয় যেন প্রাণে আসিয়া ধরা দিত—মন বলিত, নরের মধ্যে ইনি নরদেব! যে দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে, সেই ধন্য হইয়াছে!

শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে কলেজের ছাত্র বিংশতিবর্ষীয় যুবক শরচ্চন্দ্রের আসিয়া আত্মসমর্পণ, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা, তপস্যা, তীর্থপর্য্যটন, তারপর বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে অভ্যুদয়ের পর বেদান্ত-প্রচারে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের সম্পাদকত্ব গ্রহণ—মঠ ও মিশনের শৈশবেই তাহাকে অনাথ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রস্থানের পর, গুরুভ্রাতৃগণের সহিত একত্রে ধর্ম্ম-সংঘ ও কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের রক্ষা ও পরিপুষ্টির গুরুদায়িত্ব সুদীর্ঘকাল একাগ্র নিষ্ঠায় পালন, মনুষ্য জাতির পরম কল্যাণের জন্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'

রচনা, তারপর বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন আহ্বান, কর্ম্মী, শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট মিশনের মূল লক্ষ্য ও উপায় সম্পর্কে সর্ব্বশেষ উপদেশ দান, অবশেষে সর্ব্ব কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে দেহত্যাগ ;—কত বড় একটা কর্ম্মময় জীবন যে তিনি ভবিষ্য-দ্বংশধরদিগের জন্য রাখিয়া গেলেন, আমাদের সাধ্য নাই,—স্পর্দ্ধা নাই যে, তাহার কিয়দংশও অনাবৃত করিয়া দেশকে দেখাই !

বাঙ্গালী অতি সহজেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠে, কোন আদর্শই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিরলস নিষ্ঠায় বহন করিতে পারে না, বাহিরের বাধা ও ভিতরের দৌর্ব্বল্য তাহার আদর্শকে ম্লান করিয়া ফেলে, সাধনা ব্যর্থ করিয়া দেয়, কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ এই মতের একটা জীবন্ত প্রতিবাদ। উদার অধ্যাত্ম-দৃষ্টি, অপূর্ব্ব চরিত্রবল, স্বার্থলেশহীন মানবকল্যাণৈকলক্ষ্য কর্ম্মযোগ, প্রগাঢ় স্বদেশপ্রীতি, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যবৃন্দের মধ্যে ছিল, আর তাহা ছিল বলিয়াই ত্রিশবৎসর কাল স্বামী সারদানন্দজী গুরুভ্রাতাগণের সহিত একত্র হইয়া সম্পাদকরূপে অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত বিভিন্ন কর্ম্ম ও সাধনার কেন্দ্রগুলি পরিচালন করিয়া গিয়াছেন এবং বিদায়ের কিছুকাল পূর্ব্বে জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের কর্ম্মীদিগকে বলিয়া গিয়াছেন, "সংঘকে পবিত্র রাখিও, প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শ-নিষ্ঠা অব্যাহত রাখিও, যশ অহঙ্কার, আত্মগৌরব যেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত না করে। সংঘের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে উদার ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা ভুলিয়া যাইও না।" আর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার তপস্যালব্ধ যে সকল ভাব জগৎকে দান করিয়াছেন, তাহা যদি আমরা জীবনে পরিণত করিতে পারি, তবে তো কথাই নাই, আমাদের জীবন ধন্য হইবে ; যদি এই বিষয় আমরা চিন্তাও করিতে পারি, তবে দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে। তাঁহার ভাব গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়াই আমাদের দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা !"

হে স্বামিন্, হে আচার্য্য, তোমার এই মহাবাণীই আমাদের যাত্রা-

পথের সম্বল, তোমার ত্যাগপূত গৈরিক-দীপ্তি নিত্যধাম হইতে তোমার দুঃস্থ স্বদেশবাসীকে পথ প্রদর্শন করুক। যে জাতির সমষ্টি-মুক্তির সাধনায় তুমি জীবন অতিবাহিত করিয়া গেলে, সেই জাতির কল্যাণ সাধনের ব্রতগ্রহণের যাহাতে আমরা যোগ্য হই, সেই আশীর্ব্বাদ কর।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৪)

স্বামী সারদানন্দ

স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগে ভারতবর্ষের দরিদ্র, আর্ত্ত, বিপন্ন জনগণ একজন প্রধান বন্ধু হারাইল। মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে, জল-প্লাবনে, ভূমিকম্পে, ঝড়ে, অগ্নিকাণ্ডে—গ্রাম, নগর, জেলা, প্রদেশ বিপন্ন হইবামাত্র রামকৃষ্ণ-মিশন সাহায্য-দানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। স্বামী সারদানন্দ এই মিশনের অন্যতম সংগঠক এবং স্থাপনের সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের অন্যতম সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথম অংশ কঠোর তপশ্চর্য্যায় অতিবাহিত হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা অনুসারে তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, এবং গীতার কর্ম্মোপদেশ কি প্রকারে জীবনে মূর্ত্তিমান্ হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত' ঠিকই বলিয়াছেন যে, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার ভিতরে যে আগুন ছিল, তাহাই তাঁহাকে অবিচলিত চিত্তে সংসারের কাজ করিতে সমর্থ করিত। তিনি জনহিতকর কার্য্যের জন্য যত রকম সাহায্য পাইতেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখিতেন এবং রিপোর্টে সমস্ত হিসাব দিতেন। তাঁহাকে লোকে যে সাহায্য পাঠাইত, তাহার একটা প্রধান কারণ ছিল, তাঁহার মহৎ চরিত্রে বিশ্বাস, কিন্তু শৃঙ্খলার সহিত হিসাব রাখা ও প্রকাশ করাও অন্যতম কারণ বলিয়া আমাদের ধারণা। যাঁহারা জনহিতকর অরাজনৈতিক, রাজনৈতিক কোন কার্য্যের জন্য সর্ব্বসাধারণের টাকা রাখেন, খরচ করেন, তাঁহারা সকলে স্বামীজির এই গুণটি লাভ করিলে দেশের মঙ্গল হইবে।

(প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩৩৪)

SWAMI SARADANANDA

Death of the Secretary of the Ramkrishna Mission

Swami Saradananda, the Secretary of the Ramkrishna Mission, passed away on Friday, at the *Ramkrishna Math, Udbodhan* Office, Baghbazar, Calcutta. A direct disciple of Sri Ramkrishna he lived a life of strenuous prayer and austerity for several years at Baranagore, Puri, Brindaban, Benares and the Himalayas. At the call of Swami Vivekananda in 1896 he went to London and after working there for some time sailed for America where he preached the message of Vedanta for about two years.

He helped Swami Vivekananda to found the *Ramkrishna Math* and to organize the activities of the Ramkrishna Mission. He acted as the Secretary from its inception and was practically the executive head of the whole organization. Swami Saradananda made extensive preaching tours in Guzerat, Kathiawar and Eastern Bengal. The present progress and development of the Sister Nivedita Girls' School owes not a little to his fostering care and close supervision He edited the *Udbodhan* for a long time and was the author of several important books, the principal of which is the philosophic treatise on his master's life —*Statesman, 21-8-27.*

THE LATE SWAMI SARADANANDA

Tribute to the Ramkrishna Mission

In moving the resolution expressing sorrow at the death of Swami Saradananda and condolence with the members of the Ramkrishna Mission, Babu Sachindra Nath Mukerjee said at the meeting of the Calcutta Corporation held on Wednesday that a Prince among men had passed away, whose purity of life, loftiness of aims and principles and absorption in a high ideal had entitled him to the reverence and regard, the respect and admiration of his countrymen. It might be said that a Sannyasin is civilly dead but not so the late Swami and his comrades of the religious Order to which he belonged, who had taken their rightful place in the life of the people and laid themselves out for the alleviation of pain and misery. Whenever the call came from any quarter the Ramkrishna Mission was ready and prepared to give their best without any distinction of caste or creed. They were like a band of ministering angels, who extended their right hand of sympathy and

fellowship to all who suffered from the ravages of Nature—pestilence or famine. To the speaker, it was a matter of no little surprise that not long ago, the Ramkrishna Mission was looked upon in certain high official quarters with sinister eyes of mistrust and suspicion. This showed how the officials were alien to the realities of things in the country and failed to feel aright the pulse of the people. The late Swami sat at the feet of his Master, the Prophet of the new age in India, and received from him the message which he promulgated by his life and teachings both here and abroad. In America he was the comrade-in-arms of the late Swami Vivekananda and the two fought together for dissipating the prevailing prejudice and ignorance of the sublime ideals, traditions and culture of Hindusthan. They went, saw and conquered and the cause of Sanatan Dharma had made such progress as must be gratifying to all lovers of Hindu thought. Though dead, the Swami would live in the Ramkrishna Mission which was in a great measure the out-flowing of his genius and powers of organisation. He had left all he had and followed his Master and the country was all the richer by his sacrifices, his beneficent endeavours, and altruistic activities. The speaker concluded by paying a glowing tribute to Paramhansa Ramkrishna and his disciples who had deepened and developed the moral and spiritual forces in the country and carried on such a tough fight against ignorance and ailments, want and penury, suffering and distress, which are unfortunately so much abroad, despite the outward glamour of British rule.—*Bengalee.*

বন্যা-কার্য্য

উড়িষ্যায় ও গুজরাটে মিশন সেবা-কেন্দ্র খুলিয়াছেন। তারাপুর ও ক্যাম্বে প্রদেশে ৭৫ খানি গ্রামে কার্য্য চলিতেছে। ধামনগর (বালেশ্বর) কেন্দ্রে সপ্তাহে ১৫০ মণ চাউল বিতরণ হইতেছে। যাঁহারা সাহায্য করিবেন তাঁহারা উহা উদ্বোধন কার্য্যালয়ে ও বেলুড় মঠে পাঠাইবেন।

কথাপ্রসঙ্গে

'সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা'

কিছুদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে দুইটি বিরোধী দলের উদ্ভব হইয়াছে। একদল নীতিবাদী, এবং অন্যদল যে কি তাহা ঠিক বলা যায় না, কারণ অপরে যাহাকে 'দুর্নীতি' বলে, তাঁহারা তাহাকে 'দুর্নীতি' বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নন। এই দুই দলের ভিতর অনেকদিন হইতে মসীযুদ্ধ চলিতেছিল, প্রবীণেরা এতদিন নীরব বা নির্লিপ্ত ছিলেন, বর্ত্তমানে তাঁহারাও আসরে আসিয়া নামিয়াছেন।

শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধে এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যাহাতে অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন। অনেকেই মনে করিতেন, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে কামসর্ব্বস্বতার যে একটা ঢেউ আসিয়াছে তাহার অনেকটা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথেরই আমদানী। কিন্তু তিনি যখন স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা প্রজনার্থ নয়, কেন না সেখানে সে পশু, সার্থকতা তাহার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম্ম উভয়ের সীমানা বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপনার পূরো খাজনা আদায়ের দাবী করে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়ে এক সঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারী মামলা চল্‌চেই। উপরে যে পশু শব্দটা ব্যবহার করেচি ওটা নৈতিক ভালমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্ম-বোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে, বংশরক্ষা-ঘটিত পশুধর্ম্ম মানুষের

মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু সে হল বিজ্ঞানের কথা—মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। * * * ইংলণ্ডে পিউরিটান যুগের পর যখন চরিত্র-শৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্য তারি কলঙ্ক-রেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্য কালের নয়। * * * সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রুতা এসেচে সেটাকেও এখনকার কেউ কেউ মনে করচেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান-মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলচে, ঐ আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ;” —তখন কবিবরের মুখে এই কথা শুনিয়া অনেক নব্য সাহিত্যিক প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার মুখের মত জবাব দিবার জন্য তাঁহারা একজন উপযুক্ত লড়ায়ে লোক খুঁজিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্রকে তাঁহারা পাইলেন না, কারণ তিনিও তৎপূর্ব্বে ‘ শনিবারের চিঠি’তে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের নির্লজ্জতায় তিনিও দুঃখিত। চিরকালের ডাংপিটে স্বভাব তিনি-যাহা পারেন নাই আজ কালের ছোকরা সাহিত্যিকগণ অনায়াসে সাহিত্যে তাহা চালাইয়া দিয়াছেন দেখিয়া তিনিও যেন লজ্জায় মুখ ঢাকিয়াছেন! অবশেষে আসরে নামিলেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র। তিনি ভাদ্রের ‘বিচিত্রা’য় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, “সাহিত্যের বে-আব্রুতা সম্বন্ধে কোনও নিত্য বা সনাতন মাপকাটি নাই, এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা আব্রুতার ও বে-আব্রুতার মধ্যে একটা খুব সুনির্দ্দিষ্ট সীমানা টানিয়া দেওয়া যায়। ‘চোখের বালি’র অনেকগুলি দৃশ্য অনেকের মতে অতিরিক্ত বে-আব্রু। ‘ঘরে-বাইরে’র অনেকটা তো বটেই, অথচ আমরা তা মনে করি না এবং সম্ভবত কবীন্দ্রও তা মনে করেন না। * * * কবির কতক কথায় মনে হয় যে, যতক্ষণ লেখক কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন, ততক্ষণ তিনি শ্লীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ

লইয়া টানাটানি করেন, তখনই তিনি বে-আব্রু। কিন্তু তাহাতেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। শরীর-ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেন না চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে। তা ছাড়া 'হৃদয়-যমুনা' 'স্তন' 'বিজয়িনী' 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও একটি সীমারেখা আছে যাহা অতিক্রম করিলেই সাহিত্য বে-আব্রু পদবাচ্য হইতে পারে। সে সীমারেখা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তার বাহিরে কোন্ বই, ভিতরেই বা কোন্ বই—তাহা নির্ণয় করিবার কোনও নির্দ্দেশই কবি দেন নাই।"

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র এই প্রসঙ্গে আশ্বিনের 'বঙ্গবাণী'তে বলিয়াছেন, "নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে নাকি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর অপরের হাতে তাহা কদর্য্যতায় কালো হইয়া উঠে। * * * সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা। Idea পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা—ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণকর কি-না।"

বঙ্গসাহিত্যে দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা বলিয়া শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্রের যথেষ্ট অখ্যাতি আছে। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, তাঁহার উপন্যাস সমূহে তিনি যে সব চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা জাতির কল্যাণেরই নিমিত্ত। কিন্তু সমস্যা এইখানেই। তিনি যাহা কল্যাণকর মনে করেন তাহাই অনেকের ধারণা সর্ব্বনাশকর। কি কল্যাণকর এবং কিই বা অকল্যাণকর তাহা কেহই কোন লোককে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারে না। ব্যক্তি-বিশেষের শিক্ষা, সংস্কার ও রুচির উপর তাহা অনেকটা নির্ভর করে।

সুতরাং সাহিত্যের মধ্যে জাতির কল্যাণ ও অকল্যাণের নির্দ্দেশসূচক সীমা-রেখা টানা বড়ই দুরূহ। আমাদের মনে হয়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্রের মধ্যে সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া যে বচসার উদয় হইয়াছে তাহা তত মারাত্মক নয়, যতটা মারাত্মক সাহিত্যকে কল্যাণ ও অকল্যাণের সীমা-চিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। সমাজে এমন কতকগুলি জিনিষ চলিত আছে, যাহা সমাজের চক্ষে নীতিবিরুদ্ধ নহে, তথাপি লোকসমক্ষে ঐরূপ আচরণ অভদ্রতা, সুতরাং সেই গোপনীয় জিনিষকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশ করা শ্লীলতা-বিরুদ্ধ। তথাপি তাহা ততটা মারাত্মক নহে এইজন্য যে, যদি উহা সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ নরনারীর ভিতর আচরিত হয়, কিন্তু সেই আচরণ যদি অসামাজিক ও অবৈধ হয় তবেই উহা দোষণীয়; আরো দোষণীয়—যদি উহাকে সমাজে চালাইয়া দিবার মত কোন কু-মত্‌লব্ সাহিত্যিকের থাকে। কিন্তু কথা হইতেছে, একজন যাহাকে অসামাজিক ও অবৈধ বলিতেছেন, অন্যে তাহাকে ঐরূপ না বলিতে পারেন, তর্কের খাতিরে নহে, আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত তিনি যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাহা হইলে বলিবার কি আছে? এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে কি ইহার কোনই সুমীমাংসা হইতে পারে না? আমাদের মনে হয়, ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য যিনি সম্যক অবগত আছেন, ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত যিনি সুপরিচিত, ভারতীয় চরিত্র-মাধুর্য্যে যিনি শ্রদ্ধাবনত, তাঁহার পক্ষে জাতির কল্যাণের জন্য সাহিত্যের মধ্যে শুভপথ বাছিয়া লওয়া তত কঠিন নহে। স্বামী বিবেকানন্দ এক কথায় বলিতেন, যাহা মানুষকে দুর্ব্বল করে তাহা অধর্ম্ম, যাহা তাহাকে সবল করে তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অথবা কল্যাণ ও অকল্যাণের এই সংজ্ঞা মানিয়া লইলে বলিতে পারা যায়, যে-সাহিত্য ব্যক্তি ও জাতিকে সর্ব্বরকমে দুর্ব্বল করে তাহা সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা লইয়া যেখানে তর্ক উঠিয়াছে সেখানে স্বামিজীর উপরোক্ত কথা ভাবিয়া দেখা সাহিত্যিকগণের একটু কর্ত্তব্য।

বরিশালে স্বামী সারদানন্দ

সে আজ অনেক দিনের কথা। ১৮৯৯ সন। পৌষ মাসের শেষাশেষি। নাগ মহাশয়ের দেহত্যাগের কয়েকদিন পরে স্বামী সারদানন্দজী ঢাকা হইতে বরিশালে আগমন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের দু একটি বালক-শিষ্য তখন বি, এম কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল এবং নিত্যানন্দ মহারাজের ইতিপূর্ব্বে এখানে আগমন হেতু শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ভক্তদল গঠিত হইয়াছিল। শরৎ মহারাজের আগমন বার্ত্তায় ইহারা মাতিয়া উঠিল; এবং তাঁহার থাকিবার সকলপ্রকার ব্যবস্থাদি করিল।

অশ্বিনী বাবুর বাড়ীর সন্নিকটে একখানি নূতন গৃহে স্বামিজীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যবিজয় জনসাধারণ বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের মধ্যে বিপুল পুলক সঞ্চার করিয়াছিল। ফলে আত্মবিস্মৃত জাতির অন্তরে আত্মশক্তির একটা দিব্য গৌরব জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা, পরমহংসদেবের শিষ্য, বিলাত-ফেরত্ স্বামী সারদানন্দ বরিশালে আসিয়াছেন। এযে অভাবনীয়! সংবাদটি হুহু করিয়া সহরময় ছড়াইয়া পড়িল। স্বামী সারদানন্দের দ্বারা স্বামিজীকে দেখিবার সখ মিটাইবার জন্য শত সহস্র লোক চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল। বৃহৎ প্রাঙ্গণটি কাণায় কাণায় ভরিয়া গেল। আর স্থান সঙ্কুলান হইল না।

অশ্বিনীকুমার তখন বরিশালে, সংবাদটি তাঁহার কানে পৌছিল। এদিকে স্বামী সারদানন্দ অশ্বিনীকুমার সহরে উপস্থিত আছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন তখন অশ্বিনীকুমার নিজেই তাঁহাকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

এই প্রবন্ধের উপকরণ পূজনীয় স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেনের নিকট হইতে সংগৃহীত। সুরেন বাবুর উপরই পূজনীয় শরৎ মহারাজের সেবার ভার অর্পিত ছিল।

সারদানন্দ মহারাজ অশ্বিনীকুমারের বাড়ী গেলেন। সেখানে যেন উৎসব পড়িয়া গেল। কত কথা, কত আলাপন, কত রহস্য, কত আনন্দ! মাঝে মাঝে দুই বন্ধুর কলহাস্যে গৃহখানি যেন ভরিয়া উঠিতেছিল।

সমবেত উপস্থিত দর্শকগণ সন্যাসীর মুখে দু একটি কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই জনৈক বালক-ভক্ত তাঁহাকে আনিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার তখন তাঁহার গৃহে কয়েকদিন থাকিবার জন্য শরৎ মহারাজকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছিলেন। এদিকে দর্শকেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বালক-ভক্তটি উৎসাহ আধিক্যে সারদানন্দজীর একখানি হাত নিজের হাতে জড়াইয়া,—'চলুন চলুন' বলিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। তাহার বড় ভয় হইয়াছিল—পাছে মহারাজ অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে থাকিতে সম্মত হন, তাহা হইলে যে তাহাদের বড় সাধে বাজ পড়িবে। একান্তে মহারাজের সেবা ও সঙ্গলাভ করিবার জন্যই না তাহারা গোপনে অশ্বিনীবাবুকে না জানাইয়াই নিজেরা কষ্টেসৃষ্টে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাদের সকল আশা বুঝি ধসিয়া যায়। অশ্বিনীকুমার বালকটির ঔদ্ধত্য দেখিয়া চটিয়া গেলেন। "কেহে ছোকরা তুই?"—বলিয়া তিনিও মহারাজের অপর হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,—"জানিস্, এই চেয়ারে স্বামী ত্রিগুণাতীত এসে তিন মাস কাটিয়েছেন, নিত্যানন্দ স্বামীও কয়মাস এই ঘরে থেকে গেছেন, এ আমার কে হয় জানিস্, আমার ভাই হয়, আমার বাড়ীতে থাক্‌বে না ত কোথায় থাকবে? এখানেই থাক্‌তে হবে।" এই টাগ্-অব্-ওয়ারের মাঝে পড়িয়া শরৎ মহারাজ ত একবারে অবাক! একদিকে ভক্ত, অপরদিকে বন্ধু ও ভ্রাতা। সে এক আশ্চর্য্য দেখিবার দৃশ্য, বালকের টানটিই বুঝি ছিল কিছু জোরাল। এই টানাটানির মাঝখানে অশ্বিনীকুমার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "ভক্তের টান জবর টান। ভক্তের টানে ভগবান বাঁধা, শরৎ মহারাজ তোদের ওখানেই থাক্‌বেন। তুই ছাত্র, শিষ্য, তোর কাছে পরাজিত হওয়ায় আজ আমার গৌরব।" অধিকাংশ সময় অশ্বিনী বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া

শরৎ মহারাজ বালকটির সহিত ফিরিয়া আসিলেন এবং যে আট দিন বরিশালে ছিলেন উক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন।

শরৎ মহারাজের অবস্থান সময়ে প্রভাতে আটটা নয়টার পর হইতে এগার বারটা পর্য্যন্ত, কখন আহারের পরও (যে কয়দিন অশ্বিনী বাবুর বাড়ীতে আহার করিয়াছেন) এবং বৈকালে রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত অশ্বিনী বাবুর গৃহে শত শত উৎসুক ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর সহিত শরৎ মহারাজ ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা করিতেন। তখনকার দিনে বরিশালে খুব কীর্ত্তন চলিত। অশ্বিনী-বাবু ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে নৈতিক আন্দোলন অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে ধর্ম্ম অর্থে শুধু নৈতিক জীবনই বুঝিত; এবং লোকের ধারণা ছিল সাধুদের ধর্ম্ম-উপদেশগুলি বিনাইয়া বিনাইয়া বৈষ্ণব বিনয়ে সিক্ত হইয়া কোমল মৃদু ও মধুস্রাবী হইবে। কিন্তু নূতন সন্ন্যাসীর উপদেশ শুনিয়া তাহাদের ধারণা একেবারে উল্টাইয়া গেল। তাহারা বুঝিলেন, নৈতিক জীবনের অতি উর্দ্ধে ধর্ম্মজীবন। নীতিমান্ হইলেও ধার্ম্মিক নাও হইতে পারেন এবং দেখিলেন, যুবক-সন্ন্যাসী যেন এক সিংহগর্জ্জী পুরুষ, সিংহ-শাবকের বাক্যাবলী তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া কোন এক সুপ্ত স্বপ্নবিহ্বল আত্মাকে, মুর্চ্ছিত চেতনাকে যেন স্পর্শ করিয়া জাগাইয়া দিল। মহারাজ বলিতেন, "Self-confidence, Self-confidence—what I want. আত্মপ্রত্যয়-বলে ব্রহ্মশক্তি হুঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠিবে। আত্মপ্রত্যয়ের অভাবেই এই শ্লথ বিলম্বিত জাতি দেব-ঋষির বংশধর হইয়াও আজ মৃত্যুমুখে। এই আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করাই ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্ম। আপনারা আবার দেবতা হইবেন, আবার ঋষি হইবেন, ভারতবর্ষ আবার জাগিয়া উঠিলে, আবার দেবভূমি বলিয়া ঋষিকণ্ঠে বন্দিত হইবে। জগৎ ভারতকে পূজা ও অর্ঘ্য দান করিবে। * * * * * ভারতে ধর্ম্মের আদর্শ—বল। সে আদর্শ বলিতেছে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। আপনারা এই আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরুন। আদর্শই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। আদর্শই আপনাদিগকে বল দান করিবে। তাই চাই অন্তরের ভিতর সূক্ষ্ম অনুসন্ধানী (introspection) দৃষ্টি। আমাদের

শুদ্ধ হৃদয় অন্ধকার পথ সমুজ্জ্বল করিবে। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করুন। বাহির হইতে কেহ কাহাকেও দাঁড় করাইতে পারে না ও শক্তি দান করিতে পারে না। পরমুখাপেক্ষীর চেষ্টা বৃথা। আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করুন, আর যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আপনিই আসিবে। আজ যাঁহারা আপনাদিগকে হীন ও দুর্ব্বল ভাবিতেছেন আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ হইলে কাল তাঁহারাই ভগবানের লীলার সহচর হইবেন। তাঁহাদের আশ্রয় করিয়া অভাবনীয় বিপুল বীর্য্য প্রকাশ হইবে।" * * * * *

মহারাজের প্রত্যেকটি বাক্য হইতে যেন আগুনের ফিন্‌কি ছুটিত, শ্রোতারা নির্ব্বাক্ মন্ত্রমুগ্ধ। কি যেন একটা নূতন বাণী তাহাদের মধ্যে দিব্য প্রেরণা সঞ্চার করিয়া দিল। তাহাদের ভিতরটা গম্‌গম্ করিয়া উঠিল। এমনি ছিল মহারাজের দৈনন্দিন উপদেশ। খালি বল, খালি বীর্য্য, খালি তেজ, খালি শক্তি! যে শুনিত সে ভাবিত, সে বড়—আর ছোট নহে; প্রভুর কার্য্য করিবার জন্য তাহার জন্ম, মরা মানুষও যেন বাঁচিয়া উঠিত। সহরটা টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

ছাত্রদের উপদেশপ্রসঙ্গে মহারাজ যেমন আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার জন্য জোর দিতেন তেমন বিজ্ঞান পড়িবার জন্য বিশেষ করিয়া কহিতেন। মহারাজের অগ্নিগর্ভ উপদেশ শুনিয়া নর নারী ঝাঁকে ঝাঁকে দীক্ষা লইবার জন্য ব্যাকুলতা জানাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি বলিতেন, "মানুষগুরু দীক্ষা দেয় কাণে, জগৎগুরু দীক্ষা দেয় প্রাণে। আপনারা খুব করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করুন, বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন আলোচনা করুন, মূর্খ থাকিয়া কি লাভ? লোকের কথায় কেবল চালিতই হইবেন, কোন কিছু একটায় নিষ্ঠা-সহকারে লাগিয়া থাকিতে পারিবেন না। তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণতর বুদ্ধির নিকট ভড়কাইয়া যাইবেন। একটু জ্ঞান লাভ হইলেই বুঝিতে পারিবেন দেশকাল ভেদে আপনাদের প্রাণ কি চাহিতেছে। আপনাদের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি কি? আপনাদের আদর্শই বা কি? শুধু হুজুক করিয়া দীক্ষা দীক্ষা করিয়া মাতিলে কি হইবে? জমি প্রস্তুত হইলে ভগবান আপনিই দীক্ষা দিবেন! সেই দীক্ষা-লাভের জন্য

হৃদয়ের কপাট খুলিয়া সতত উন্মুখ হইয়া থাকুন। সময় হইলে কাহার মুখ দিয়া কাহার হৃদয় হইতে প্রেরণা লাভ করিবেন তাহা কে বলিতে পারে? কোন্ পথ দিয়া প্রভু কাহাকে তাঁহার আঙ্গিনায় লইয়া যাইবেন তাহা কে জানে? কিন্তু প্রাণে প্রাণে সত্যিকার দীক্ষা পাইলে তাহা অমনি বুঝিতে পারিবেন। বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক দীক্ষার একটা contagious spirit আছে। একজন দীক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করিলে উহা বহুর মধ্যে সংক্রামিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে atmosphere পরিষ্কার হইলে spiritটিও কাটিয়া যায়। তখন লোক যেই সেই। তাহাতে বরং অনিষ্ট হয়। Personalityর মোহে হঠাৎ কিছু করা উচিত নহে। হুজুক কাটিয়া গেলে জ্ঞান-মার্জ্জিত বিচারবুদ্ধি লইয়া গুরুকে পরীক্ষা করিয়া স্থির শান্ত চিত্তে বজ্রদৃঢ় সংকল্প লইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।" বস্তুতঃ মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দান করিলেন না। কত নর নারী যে, ভগ্ন মনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

স্বামী সারদানন্দজী প্রকাশ্য সভায় তিনটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে প্রথম বক্তৃতাটি হইবার কথা ছিল। স্থান ছিল—সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা। কিন্তু তাহা হইতে পারে নাই। ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার তৎকালীন সম্পাদক জনৈক ব্যবহারজীবী বক্তৃতার নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সভা হইবার অনুমতি প্রত্যাহার করিলেন; কারণ, স্বামী সারদানন্দ বিলাতফেরত্। বিলাতফেরত্ সন্ন্যাসীর আগমনে সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা যে কলুষিত হইয়া যাইবে! যিনি শাস্ত্র-বিধান লংঘন করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে পারিয়াছেন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার অধিকার নাই! এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অশ্বিনীকুমার, কালীশচন্দ্র-প্রমুখ মনীষিগণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি উত্তেজনা! কি চাঞ্চল্য! উহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জনতা হইতে ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভায় লোষ্ট্র-নিক্ষেপ আরম্ভ হইল, গৃহখানির উপর নানারূপ উপদ্রবের উপক্রম হইল। অশ্বিনীকুমার অতিকষ্টে ক্ষুব্ধ

জনতাকে সংযত করিয়া পরদিবস হইতে তাঁহার কলেজে সভা হইবে ঘোষণা করিলেন।

উত্তেজনার ফলে তিন দিনই সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রসিদ্ধ ব্রজমোহন-হলে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। বারান্দা ভর্ত্তি হইয়া গেল। প্রাঙ্গণে ও রাস্তার উপরে লোকের ভিড় ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। অনেক মহিলা স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অশ্বিনী-কুমার তিন দিনই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং তিন দিনই ইংরাজি বক্তৃতার বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজি-অনভিজ্ঞ শ্রোতারা বলিতেন, স্বামিজীর বাক্যাবলি ইংরাজিতে হইলেও উহা এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, প্রাণে আসিয়া সজোরে আঘাত করিত। ইংরাজি না জানিলেও তাঁহারা বিনা কষ্টে বাংলার ন্যায়ই সহজে মর্ম্ম-গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন। বক্তৃতার ভাষা ছিল এরূপ প্রাণবন্ত! বক্তৃতার পরে নিত্য কিছু সময় ধরিয়া নানারূপ প্রশ্নোত্তর চলিত, প্রশ্ন করিতে দেরী হইলেও উত্তর দিতে দেরী হইত না। বিষয়গুলি যেন মহারাজের জলবৎ সহজ হইয়াছিল, উত্তরগুলি যেন তাঁহার নখদর্পণে। শরৎ মহারাজের উত্তর দিবার ভঙ্গীটি বড় চমৎকার ছিল, যেন ন্যায়শাস্ত্রের (Logic) সিদ্ধান্ত করিতেছেন। সে সময় ৺গোরাচাঁদ (দাস) বাবু বার-লাইব্রেরীর বয়োবৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ উকীল এবং নিজেও ভক্তজন, পণ্ডিত লোক বলিয়া বিখ্যাত। প্রশ্ন অধিকাংশ তাঁহারই ছিল। সভার মুখপাত্র হিসাবেও তিনি অধিকাংশ প্রশ্ন করিতেন। প্রথম দিনে বেদান্তের সার্ব্বভৌমিকত্ব আলোচনা-কালে মায়াবাদ-প্রসঙ্গে মহারাজ কহিয়াছিলেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। গোরাচাঁদ বাবু ভূমিকা করিয়া কহিলেন, "স্বামিজী, একটি জটিল প্রশ্ন করিতেছি দয়া করিয়া বিশদভাবে বুঝাইবেন। আপনি যে বলিয়াছেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ব্রহ্ম ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই তাহা হইলে যদি একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন তবে আমরা এই সৃষ্টি ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য (diversity) দেখিতেছি কেন?" শরৎ মহারাজ কহিলেন, "প্রশ্নটি ঠিক করিয়া

বলুন, this question is self-contradictory and illogical. If you can put it in logical form, I can answer"—শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক একেবারে 'থ' হইয়া গেল। গোরাচাঁদ বাবু প্রশ্নটিকে পুনঃপুনঃ ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সাজাইতে চেষ্টা করিতে যাইয়া প্রতিবারই দেখিলেন প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তখন শরৎ মহারাজ একটু হাসিয়া কহিলেন, "This question was asked a thousand times from the very beginning of civilisation but subsequently fell through as it could not logically stand". তারপর তিনি বুঝাইয়া দিলেন। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ ছিল,—সৃষ্টির কোন অখণ্ড ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মনের সম্বন্ধে ইহার আপেক্ষিক সত্তা মাত্র আছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় সহায়ে জিনিষটা এক প্রকার জানিতে পারিতেছি কিন্তু যদি আর একটি ইন্দ্রিয় থাকিত তাহা হইলে আবার কিছু অন্যরূপ প্রতিভাত হইত। সুতরাং ইহার কোন সত্যিকার নিজ সত্তা নাই। ইহা অপরিবর্ত্তনীয়, অনন্ত ও সর্ব্বগ নহে। ইহা আমাদের মনের সৃষ্টিমাত্র, মনের ভিতরে দেশ কাল ও নিমিত্তের যে ধারণা আছে তাহারই সাহায্যে এই স্থূল জগতের প্রকাশ দেখিতে পাই, সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে অখণ্ডের ভিতরে *দেশ নাই, কাল নাই, নিমিত্ত নাই, কারণ মনই যে সেখানে নাই,* যেখানে মন নাই সেখানে কালের (time) কল্পনা অসম্ভব। তদ্রূপ যেখানে সর্ব্বব্যাপকত্ব সেখানে বিকাশ বা সৃষ্টির জন্য আলাদা দেশ (space) অসম্ভব ; তিনি মাত্র এক, অদ্বিতীয়,—সেখানে কোনরূপ কার্য্যকারণ (causation) থাকিতে পারে না। এই ভুল দেখাটা মনের সৃষ্টি, মন সহায়ে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি বা ভাবিতেছি তাহাই মায়া। যতই ইহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিব ততই আমরা চক্রাকারে এই মায়ার মধ্যে ঘুরিতে থাকিব। সুতরাং মায়ার বাহিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত জগৎটা যে মিথ্যা উহা উপলব্ধি করিতে পারিব না। সান্ত মন লইয়া অনন্তের ধারণা অসম্ভব, ব্রহ্ম-উপলব্ধি দ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্তি ঘটে, স্বস্বরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইলে মায়া

বিদায় গ্রহণ করে (bids good-bye)। তখন আর রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় না—জগতের অস্তিত্ব থাকে না। একমাত্র স্বতঃ-প্রকাশমান ব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকেন, কাজেই বুঝিতে পারিতেছেন মায়া-রাজ্যে মায়াতীতের প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত নহে।

শরৎ মহারাজের উক্ত আলোচনাটি এত সহজ, এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, শুনিয়া হর্ষে মুহুর্মুহু করতালিধ্বনি সভাগৃহখানি মুখর করিয়া তুলিল। অবশেষে গোরাচাঁদ বাবু ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "এরূপ পাণ্ডিত্য, এরূপ সহজ জ্ঞান, এরূপ তত্ত্ব-উপলব্ধি ও সরল প্রকাশভঙ্গী আমি আর জীবনে দেখি নাই। স্বামিজীর প্রাণদায়ী ধর্ম্মালোচনা আমাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনেক আজগুবী ধারণা ও কুসংস্কার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। স্বামিজীর আগমনে, অভিনব ধর্ম্মব্যাখ্যায় বরিশালে এক নব-যুগের সূচনা হইল। এখন স্পষ্ট বুঝিতেছি, ধর্ম্ম শুধু শাস্ত্রে নহে, তীর্থে নহে, মন্দিরে নহে, উহা আমাদের অন্তরে; দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে সহজ-প্রতিষ্ঠার ও আচরণের বস্তু।"

প্রথম দিন বক্তৃতার বিষয় ছিল বেদান্ত (সার্ব্বভৌম বেদান্ত-ধর্ম্ম) Vedanta, the Universal Religion. অশ্বিনীকুমার স্বামিজীকে লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তরুণ সন্ন্যাসীর অঙ্গে আজানুলম্বিত গৈরিক আল্‌-খাল্লা, মস্তকে গৈরিক পাগড়ী, চোখে মুখে এক উজ্জ্বল দীপ্তি, উন্নত গ্রীবা, পুষ্ট দেহখানি,—গেরুয়ায়-গেরুয়ায় এক অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিয়াছিল। দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল—ইতিপূর্ব্বে বরিশালবাসীর ধারণা ছিল—সন্ন্যাসী জটাজূটধারী, ভস্মমাখা, নগ্নদেহ, কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত, কল্পনার অতীত, এ যে জুতামোজাপরা বাবু সন্ন্যাসী! গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ অতিক্রম না করিয়াই যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ কি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে? কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। অশ্বিনী-বাবুর কানে বোধ হয় সে কথা গিয়াছিল। তাই সভার প্রারম্ভে স্বামী সারদানন্দজীর পরিচয় উপলক্ষে কহিলেন, "স্বামী সারদানন্দজী ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন চিহ্নিত সন্ন্যাসী শিষ্য। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা, পরমহংসদেবের কৃপায় শুধু বিশ্ব-আলোড়নকারী

একজন বিবেকানন্দই যে সৃষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার কৃপায় ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন বিবেকানন্দ। এক একজনে যেন এক একটি আগ্নেয়গিরি। ইঁহাদের বাক্য, হাবভাব, প্রতি ভঙ্গিতে, ইঁহাদের জীবন-যাত্রার আঁকেবাঁকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। ইঁহাদের সত্তাটিই যেন জ্বলিতেছে, ইঁহারা যেখানে অবস্থান করেন ও যে পথ দিয়া চলিয়া যান সেখানেরই অমঙ্গল ভস্মীভূত হয়। যেই ইঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িবে সেই জীবনে ইঁহাদের একটা উত্তাপ অনুভব করিবে। ইঁহাদের প্রভাবে বাঘে ও মহিষে এক ঘাটে জল খায়। আমি আলমোড়ায় দেখিয়াছি, ভারতবাসীর সহিত এক সঙ্গে ইংরেজ, বিবেকানন্দের পদসেবা করিতেছে, জুতা খুলিতেছে। ইঁহারা ঠাকুরের বিশেষ কার্য্যের জন্য ভারতের মুক্তি হেতু শরীর ধারণ করিয়াছেন। যদি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিতেন তবেই আপনারা বুঝিতে পারিতেন স্বামী সারদানন্দ তাঁহারই একটি অবিকল প্রতিচ্ছবি। ইঁহারা আজন্ম সন্ন্যাসী, ঠাকুরের উপদেশ-বর্ণিত হোমাপাখী। ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই উর্দ্ধমুখগতি। তাই সংসার আশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও ইঁহাদের সন্ন্যাস গ্রহণ শাস্ত্রবিগর্হিত নহে। ইঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য অভিনব সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি ভগবান পরমহংসদেবের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে বিবেকানন্দের মত অল্প বয়সেই ইংলণ্ড আমেরিকা গমন করিয়া অদ্ভুত তপঃশক্তি ও পাণ্ডিত্য-প্রভাবে তত্রত্য বুধমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। আজ আপনারা ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ধন্য হউন।”

বক্তৃতাকালে স্বামিজী স্থাণুর মত নিশ্চল দণ্ডায়মান, হস্ত বক্ষোপরি পরস্পর সম্বদ্ধ। মাঝে মাঝে গ্রীবা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। গৈরিক-মণ্ডিত শান্ত সমাহিত চিত্র আলোক-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া এক বিচিত্র মহিমা সৃষ্টি করিতেছিল। স্বামিজীর নাতিউচ্চ সুকোমল কণ্ঠধ্বনি দূর হইতে শ্রুত হইয়া শ্রোতৃহৃদয়ে কথার আঁকেবাঁকে রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চের লহর তুলিতেছিল। বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত সভা নিস্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ। সভা ভঙ্গ হইলে সকলেই যেন কি এক নূতন আলোক লাভে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অশ্বিনী বাবু বরিশালের প্রসিদ্ধ বাগ্মী। বক্তৃতাকালে হাতের নানা ভঙ্গিতে তাঁহার বক্তব্য সহজভাবে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ একেবারে নিশ্চল থাকিয়া বক্তৃতা করাতে বক্তৃতা একটি অশরীরী বাণীর মতই শ্রুত হইত। জনৈক ভক্ত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহারাজের নিকট এ বিষয় প্রশ্ন করিলেন। মহারাজ উত্তরে কহিলেন, "বক্তৃতার সময় ঠিক ঠাক হাত নাড়া ভঙ্গিকরা একটা মস্ত বড় আর্ট, বাগ্মীরা উহা করিয়া থাকেন। Art of Oratoryতে-এ সব আছে। উহাতে বক্তৃতা খুব impressive করা যায়। কিন্তু স্বামিজী ঐসব পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, বক্তৃতার সময় অহঙ্কারকে তাড়াইয়া দিয়া শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মৌনভাবে সমাহিত চিত্তে ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইতে হয়। যাহা বলিবার তিনিই বলাইবেন ও তিনি নিজেই শুনিবেন। এইরূপে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করিয়া বক্তৃতা করিলে তবে সে বক্তৃতায় ভগবানের বাণী প্রচারিত হয়। অহঙ্কার আগিলেই 'ব্যস্', তোমার কথাই বলিবে, ভগবান পলাইয়া যাইবেন। তাঁহার বাণী আর প্রকাশ করা হইবে না। পূর্ব্বে কথা বলিতে গেলেই আমার হাত পা ছোড়ার বড় মুদ্রাদোষ ছিল। বিলাতে স্বামিজী হাতে একটা ছড়ি লইয়া বসিতেন এবং আমাকে আয়নার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বক্তৃতা করিতে আদেশ করিতেন। হাত পা নড়িলেই স্বামিজীর বেত্র আসিয়া, হাতের উপর আঘাত করিয়া আমাকে সজাগ করিয়া দিত। এমনি কত যত্ন করিয়া তিনি আমার সেই দোষটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আহা! তাঁহার হাতের বেত খাইয়াই ত শিখিয়াছি! তিনি এমনি করিয়াই হাতে কলমে আমাদের শিখাইয়াছেন।" এই প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "বিলাতে স্বামিজী অনেক দিন আমাকে সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য কহিয়াছেন, কিন্তু বক্তৃতার নাম শুনিলেই আমি নার্ভাস্ হইয়া পড়িতাম এবং 'আজ না' 'আজ না' বলিয়া দিন কাটাইতাম। ভাবিতাম কি বলিব? কিছুইত জানি না, মাথামুণ্ড কিছু ভাবিয়াও পাইতাম না। স্বামিজীর কাছে ঐ কথা বলিলে তিনি একদিন ধমক দিয়া কহিয়াছিলেন, তোর এত মাথাব্যথা কেন? ঠাকুরের

কাজ করিতে আসিয়াছিস। তুই উপলক্ষ মাত্র, সভায় গিয়া দাঁড়াইবি, তাঁহার যাহা খুসী বলাইয়া লইবেন। ভাল মন্দ তাঁহার। বিবেচনা করিতে তুই কে? দেহাভিমান লইয়া ঠাকুরের কাজ? ওটাকে ছুড়িয়া ফেলিতে না পারিলে আসিয়াছিলি কেন? যা ফিরে যা, দেহাভিমান থাকিতে ঠাকুরের কাজ হয় না। স্বামিজীর গালাগালিতে অভ্যস্ত থাকিলেও আমার প্রাণে বড় লাগিল। বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। একটু পরেই স্বামিজী আবার কহিলেন, ক্ষেপেছিস্ না কি? 'পারিব পারিব' বলিলেই সকল পারিবি, তোকে দিয়ে ঠাকুরের অনেক কাজ হইবে। সেকথা আমি জানিতে পারিয়াছি, তুই সভায় শুধু গিয়া দাড়াইবি। দেখবি, ঠাকুরের কাজ তিনিই করিবেন। কি জানি ও সব, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ঘটনাক্রমে স্বামিজীর ঐ দিনই একটি বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। সভাস্থলে যাইয়া হঠাৎ প্রকাশ করিলেন, সে দিন তিনি বক্তৃতা করিবেন না—করিবেন তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ। আমি ত কাঁপিয়াই অস্থির। মনে মনে স্বামিজীর উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও উঠিতেছিলাম না দেখিয়া স্বামিজী একটা ঠেলা দিয়া কহিলেন, যা—বল্‌গে যা—ভয় নেই। সে স্পর্শে সে স্বরে আমি যেন মন্ত্রচালিত হইয়া বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলাম। তারপর আর কিছু মনে নাই। বক্তৃতা শেষে স্বামিজী বলিয়াছিলেন বক্তৃতাটি তাঁহার আশানুরূপ হইয়াছিল। গুডউইন্ হাসিতে হাসিতে আমাকে জানাইল যে, বক্তৃতাটি খুব ভালই হইয়াছে। যাক্ বাঁচিলাম, বুক হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল, বড় ভয় হইতেছিল স্বামিজীর না আবার কতই গাল খাইব।" * * *

দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল Origin and Development of Religion। এই বক্তৃতায় মহারাজ প্রথম ভয়, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতি হইতে কিরূপে ধর্ম্মের উদ্ভব হইল, কিরূপে ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক মূল সূত্রগুলি (laws) আবিষ্কৃত হইল ও তৎপরে ক্ষণস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়ের ধারণা আসিল—মায়াবাদের উদ্ভব প্রভৃতি পরপর দেখাইয়া যাইতে লাগিলেন। তারপর তিনি বিবৃত করিলেন,—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মরূপ সাধারণ-সংজ্ঞায় ধর্ম্ম পরিণত হইল; এবং এই

একত্ববোধ হইতে সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্য এবং বিনাদ্বন্দ্বে একলক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য নীতিধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। ইহাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম আরও পরিণতি লাভ করিয়াছে। হিন্দুঋষি বলিতেছেন, ভগবান সত্য শিক্ষা দিবার জন্য মানুষ হইয়াছেন এবং মানুষও পুনরায় ভগবান হইতে পারিবেন। ধর্ম্ম-আদর্শের চরম পরিণতির বীজ মাঝে মাঝে লক্ষিত হইলেও বর্ত্তমানে এই কয়েক বৎসর হইল উহা পূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই পরিণতির দুইটি ধারা—সর্ব্বভাব ও ধর্ম্মসমন্বয় এবং সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের সেবা। পূর্ব্বে ভূমানন্দে মগ্ন হইয়া সমাধিতে জড়বৎ থাকা যে চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত, বর্ত্তমানে ঐ ভূমানন্দ ত্যাগ করিয়া উচ্চতম ভূমি হইতে মনকে জোর করিয়া নামাইয়া আনিয়া, আপনাকে বিপুল আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায়, ভগবানের বিরাট ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক যন্ত্রবৎ চালিত হইয়া দ্বৈতাদ্বৈত ভূমির সীমারেখার উপরে অবস্থিত থাকিয়া সেবা-জীবন যাপন করাই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই আদর্শটি কিরূপে কার্য্যে পরিণত হয় তাহাই বুঝাইতে যাইয়া শরৎ মহারাজ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছিলেন,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে কিরূপ শক্তির বিকাশ পথে শারীরিক ক্রিয়া উৎপাদন করে। এই অন্তর ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্রমান্বয়ে শুদ্ধ হইলে প্রকৃতির ইচ্ছা ঠিক ঠিক উপলব্ধি ও ধারণ করিতে পারে। এবং উহা মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রবৎ চালিত করে। মানুষের কাঁচা আমিটি তখন চিরকালের জন্য মরিয়া যায়, সেও ভগবানের হাতের যন্ত্র হয়। তখন আর বেতালে পা পড়ে না। কিন্তু কামগন্ধ কিছুমাত্র থাকা পর্য্যন্ত অথবা স্ত্রীপুরুষ ভেদ থাকিলে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের দিব্য প্রেরণায় চালিত হওয়া অসম্ভব। এই স্ত্রীপুরুষ ভেদ চিত্ত হইতে মরিয়া মুছিয়া ধুইয়া না গেলে ধর্ম্মজীবন যাপনের আরম্ভই হইতে পারে না, ইহা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। মহাপুরুষ বা অবতারদের জীবন শাস্ত্র

বাক্যের যথার্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা এইরূপ একজন মহাপুরুষের পদতলে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি যাঁহার মধ্যে দেহবুদ্ধি বা কামগন্ধের লেশমাত্রও ছিল না, তিনি নারীমাত্রকেই জগজ্জননী বলিয়া দেখিতেন। তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাম এরূপ বিশুদ্ধ ও একসুরে বাঁধা ছিল যে, জগন্মাতার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও তাহাতে ধরা পড়িয়া তাঁহাকে কলের মত চালিত করিত। জগন্মাতার আদেশে তাঁহার জীবনের প্রতি কার্য্যটি নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার সাধনা এরূপ অদ্ভুত তীব্র ছিল এবং লোক-শিক্ষার নিমিত্ত জগন্মাতার আদেশ যে অন্তরে উপলব্ধি করিতেন তাহা নহে, পরন্তু উহা শব্দ-স্পর্শে শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত। তিনি মনুষ্য কণ্ঠের মতই তাহা স্পষ্ট ও নিবিড় ভাবে শুনিতে পাইতেন। তাই তিনি অনেক সময় কহিতেন, হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিও।"

এই প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ আরও বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম, শাস্ত্র, তীর্থ বা মন্দিরের ভিতর নহে, ধর্ম্ম অনুভূতির বস্তু; সুতরাং বেশ-ভূষা বা সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যবহারের মধ্যে নিহিত নহে। ধর্ম্ম—আচরণের, জীবনের প্রতি স্তরে প্রতি কার্য্যে প্রতিষ্ঠার বস্তু, ধর্ম্ম অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ মাত্র সুতরাং উহা সহজ হইবার (matter of being) জিনিষ।"

তৃতীয় দিনের বিষয় ছিল জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়। এই বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলিয়াছিলেন, "মানুষের পূর্ণ জীবন লাভ করিতে হইলে এই ভাব ও সমন্বয়ের প্রয়োজন। পূর্ব্বপূর্ব্বগ আচার্য্যগণের জীবনে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। যদিও সময় বিশেষে লোককল্যাণের নিমিত্ত কাহারও ভিতরে জ্ঞানের প্রাধান্য, কাহারও ভিতর ভক্তির আতিশয্য, কাহারও ভিতর কর্ম্মের অদ্ভুত প্রেরণা লক্ষিত হইলেও তাঁহাদের জীবনী সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের মনীষার মূলে—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সমন্বয়ের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির লক্ষ্য এক এবং ইহাদের

২

প্রত্যেকেরই আদর্শে পৌঁছাইবার সমান শক্তি। পরস্পরের কমবেশী সাহায্য ব্যতীত ইহার একটিও স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়াইতে পারে না। জ্ঞান ও ভক্তির প্রতিষ্ঠা আবার কর্ম্মের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে।"

* * * * *

ষষ্ঠদিনে অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সাধারণের আলাপ-আলোচনা বন্ধ করিয়া-দিলেন। অভিপ্রায়—এতদিন দিনরাত বিপুল জনসমাগম হেতু তাঁহারা একান্ত করিয়া মহারাজের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, আজ তাঁহারা প্রাণের ক্ষুধা মিটাইয়া লইবেন। ব্রজেন নন্দী, সুরেন সেন ও যোগেন্দ্র-প্রমুখ ভক্তগণ মহারাজকে কহিলেন, "সভাসমিতি ও আলোচনায় একমাত্র অশ্বিনীবাবুর সহিত কথোপকথন ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় উল্লেখ মাত্র করিলেন না। এইবার কিছু ঠাকুরের কথা বলুন, আমরা শুনি।" অনেক অনুনয়ের পর মহারাজ সহাস্যে কহিলেন, "আমিত্বের 'আ' থাকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা। যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই দেখিতেছি, ঠাকুরকে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ঠাকুরকে কিছু বুঝিয়াছেন স্বামিজী ও নাগমহাশয়। আমরা ঠাকুরের সেবকমাত্র, তাঁহার আদেশ শুধু পালন করিতে চেষ্টা করিতেছি। তিনি কৃপা করিয়া যেদিন আমাকে বুঝাইবেন সেদিন মাত্র বুঝিব। ঠাকুর-সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে বড় ভয় হয়। স্বামিজীই বলেন,—'অগোচরে পাছে বাড়াইতে যাইয়া ঠাকুরকে খাটো করিয়া ফেলি!' স্বামিজীরই এই, অন্যে পরে কা কথা! ঠাকুরের খুব ধ্যান চিন্তা করিও, তিনিই তোমাদিগকে আলবাৎ বুঝাইয়া দিবেন। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট প্রকাশ হইবেন—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশ্বাস কর। আমরা ভাবময় ঠাকুরের কতটুকু বুঝিয়াছি!—কিছুই বুঝি নাই।"—বলিতে বলিতে সহসা মহারাজের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল, দেহ নিস্পন্দ, চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত, ঊর্দ্ধগতি। দুই এক বিন্দু অশ্রু চোখের কোণে গড়াইয়া পড়িল, শ্বাস রুদ্ধ। একটা দিব্যশ্রী বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এইরূপ মিনিটের পর মিনিট চলিতে লাগিল। কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই, নিস্তব্ধ। গৃহের বায়ুমণ্ডল যেন নিবিড়,

চেতন হইয়া উঠিল। অবশেষে সুরেন্দ্রকুমারের বড় ভয় হইল। সে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিল—শ্বাস নাই। তারপর নাড়ী টিপিয়া দেখিল,—নাড়ীও নাই। কি করিবে, ঠিক পাইল না; তারপর ডাক্তার ডাকিতে যাইবে এমন সময় যোগেন্দ্র বলিল, "শুনিয়াছি, সামান্য উদ্দীপনা হইলে ঠাকুরের ঘন ঘন ভাবসমাধি হইত। হয়ত ঠাকুরের নাম উল্লেখে ইনি গভীর ভাবসমাধিমগ্ন হইয়াছেন।" এই অবস্থায় সাধারণ ভূমিতে মন নামাইয়া আনিতে হইলে কি প্রক্রিয়া করিতে হয় তাহা তখনও ইহারা জানিত না। কাজেই ভীষণ আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপর ধীরে ধীরে একটু বাহ্য চৈতন্যের আভাস পাওয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে "রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ" উচ্চারণ করিতে করিতে সংজ্ঞালাভ করিলেন। সে রাত্রে তাঁহাকে যেন গভীর, নিবিড় ভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। বেশী কোনো কথা হইতে পারিল না। ভক্তেরা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে-ঠাকুরের নামমাত্র গ্রহণে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, গভীর ভাবসমাধিতে মন প্রবেশ করে, সে-ঠাকুর কত বড়, কত মহান! অনেক ক্ষণ কাটিয়া গেলে ভাবটা একটু ফিকা হইলে, সুরেন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার জীবনে কি কোনো বিশেষ বাসনা আছে?"

শরৎ মহারাজ বলিলেন, "কৈ, একমাত্র ঠাকুরের আদেশ পালন করা ছাড়া আর ত কিছুই খুঁজিয়া পাই না।"

সুরেন্দ্রকুমার পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ঠাকুরের নিকট আপনি কোন দিন কোন বাসনা পূর্ণ করাইবার জন্য আব্দার করিয়াছিলেন কি না? শুনিয়াছি, স্বামিজী নির্ব্বিকল্প সমাধির জন্য ও বাবুরাম মহারাজ ভাব হইবার জন্য ঠাকুরকে অনেক মিনতি করিয়াছিলেন।"

তদুত্তরে মহারাজ কহিলেন, "একদিন ঠাকুর আমাদের সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কল্পতরু হইয়াছিলেন। আমাদের তখন ঠাকুরের শক্তির উপর এমনি অখণ্ড বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুর যে বর দান করিবেন তাহা অব্যর্থ হইবে। কেহ ভক্তি, কেহ জ্ঞান, কেহ মুক্তি

প্রভৃতি চাহিলেন। ঠাকুর আমাকে নীরব দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কিরে চুপ করে কেন, তোর কি বাসনা, বল্‌না? কহিলাম,—সর্ব্বভূতে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতে পারি। ঠাকুর মৃদু হাস্তে কহিলেন, সময়ে হবে।" সত্যই কি শরৎ মহারাজের মধ্যে ঠাকুরের এই আশীর্ব্বাদ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল না? এই অনুভূতি কি এই সুদীর্ঘকাল তাঁহার আর্ত্ত পীড়িত জীবসেবার মূলে প্রেরণা সঞ্চার করে নাই?

আর একদিন উপদেশ-প্রসঙ্গে মহারাজ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বলিতেন, 'সকাল সন্ধ্যায় নিত্য বসবি, উহাতে তাড়াতাড়ি হয়।' বরিশালে এত কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যেও মহারাজের কিন্তু সকাল সন্ধ্যায় বসার নিয়মটি বাদ যায় নাই। তিনি মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় একলা গান গাহিতেন।

একদিন মহারাজ, অশ্বিনী বাবু প্রমুখাৎ কালীবাড়ীর সিদ্ধ মহাপুরুষ ৺সনা ঠাকুরের (সনাতন) নাম শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। তখন প্রাতঃকাল, রৌদ্র উঠিয়াছে। কয়েকজন ভক্তসহ মহারাজ থানার কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময় সনা ঠাকুর কদাচিৎ মন্দির হইতে বাহির হইতেন। শরৎ মহারাজ মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র সহসা ঝড়ের মত সনা ঠাকুর বাহির হইয়া শরৎ মহারাজকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উভয়ের চক্ষু পরস্পরের মুখে নিবদ্ধ। উভয়েই নির্ব্বাক। চোখে চোখে কি কথা হইয়া গেল, তাহা তাঁহারাই জানেন। দুইটি মহাপুরুষের প্রেমালিঙ্গন দর্শনে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। কালীবাড়ী যেন গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল। ভাব কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সুরেন্দ্রকুমার শরৎ মহারাজের পরিচয় প্রদান করিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য শুনিয়া তিনি হঠাৎ কহিলেন, "পরমহংসদেব যে সাক্ষাৎ—।" তখন শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া মহাপুরুষের সহিত মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। সনা ঠাকুর শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্য বালকের ন্যায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন, এবং শরৎ মহারাজ দুই চারিটি কথায় ঠাকুরের জীবনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। তৎপর শরৎ মহারাজ

সনা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার যে অবস্থা এবং যে বৃদ্ধবয়স তাহাতে এত কঠোরতা করিতেছেন কেন ?"

সনা ঠাকুর কহিলেন,—

"মা যেমনি রাখছেন্ তেমনি থাক্‌ছি। ওসব কথা সে বেটি জানে।"

বরিশালে আট দিন অবস্থানের মধ্যে কয়েকটি আগ্রহবান যুবকের নিকট শরৎ মহারাজ রামকৃষ্ণ-মিশনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া যান। তখনকার অনেক উপদেশ এখনও ভক্তদের মুখে শুনা যায়।

অষ্টম দিন প্রভাতে তিনি বরিশাল পরিত্যাগ করেন। বহু ছাত্র ও গণ্যমান্য ভদ্রলোক তাঁহাকে বিদায় দিতে ষ্টীমার-ষ্টেশনে উপস্থিত হন। "পরমহংসদেবকী জয়" এই তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে ষ্টীমার ছাড়িয়া গেল। ষ্টীমার দৃষ্টি ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে সমবেত জনসংঘ বিষণ্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল। এই আট দিন বরিশালে যে প্রাণের খেলা চলিয়াছিল, ভক্তগণ সেই সম্পদটুকুই ভক্তিনম্রচিত্তে স্মরণ করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন

সভ্যতায় বর্ব্বরতার বীজ

মাতৃ-স্নেহ

সব প্রাণীরই দেখা যায় শৈশব অতি সংকট কাল। এই অবস্থায় অধিকাংশ জীবের মৃত্যু ঘটে। এই সময় শরীর দুর্ব্বল থাকায় রোগ ও শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান বড় কঠিন। নিম্ন স্তরের প্রাণীতে দেখা যায়, মায়েরা প্রসব করেই হয় মরে যায়, না হয় সন্তান ফেলে পালায়। এই অসহায় অবস্থায় যে কটি বাঁচে সেই কটি থাকে। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়েছি, লক্ষ লক্ষ প্রাণী জন্মমাত্র মরে, হয় ত একটি কি দুটি বাঁচে।

যে সব প্রাণীর অধিক সন্তান বাঁচে তারা হচ্ছে একটু উচ্চ স্তরের। উচ্চ স্তরের প্রাণীর মধ্যে মাতৃ-স্নেহ দেখা যায়, এই মাতৃ-স্নেহই শিশুকে বাঁচিয়ে রাখে। যে প্রাণীর মধ্যে এই মাতৃ-স্নেহ যত কম সে জাতি তত অল্প কাল স্থায়ী।

গরু, কুকুর, বেরাল প্রভৃতি সব গৃহপালিত পশুর মধ্যে এই মাতৃ-স্নেহ কিছু কালের জন্য প্রবল থাকে। অতি নিরাপদ স্থানে প্রসব করলেও তারা তাদের সন্তান লুকাবার চেষ্টা করে; এবং গরু এমন কি তার রাখালকেও তার সন্তানের কাছে গেলে মারতে আসে। এ সব হল তাদের প্রাচীন যুগের স্বভাবের নিরর্থক অভিব্যক্তি।

গৃহপালিত পাখী যেমন—টার্কী, গিনিতে এই সন্তান-রক্ষা-বৃত্তি অতি মাত্রায় দেখা যায়, কারণ তারা অতি অল্পদিন গ্রামবাসী হয়েছে। কিন্তু মুরগী, পাতিহাঁস এরা যেখানে সেখানে ডিম ফেলে রাখে। আর এক জাতের বড় হাঁস, তারা খাবার জন্যে তাদের বাসা ছেড়ে যাবার আগে বালি ও কাঠকুটো দিয়ে ডিম ঢেকে রেখে যায়। দেখা যায় যে, বাসা ছাড়বার পূর্ব্বে বেশী জিনিষ না পেলে অন্ততঃ কিছু না কিছু তার ওপরে চাপিয়ে যাবেই। প্রাচীন কালের নিয়ম, প্রয়োজন না থাকলেও যেন কলের মত তাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

খরগোসকে তুলো দিয়ে যতই ভাল বিছানা করে দাও, প্রসবের সময় সে লোম ছিঁড়ে তার শিশুর বিছানা করবেই। মানুষের সঙ্গে বাস করে ও নানা সাহায্য পেলেও, তার প্রাচীন স্বভাবের জন্য মানুষের সাহায্য তার মনঃপূত হয় না। মানুষের মধ্যেও ঠিক তাই। একটা খল মানুষকে তুমি যত রকমেই সাহায্য কর না কেন, তার স্বভাবের জন্য সে-সব কিছুতেই তার 'মনঃপূত হবে না। যখন সন্তান প্রসব করে তখন গৃহপালিত পশুদের প্রাচীন স্বভাব বীজাকারে থাকায় তারা ভয়ানক হিংস্রক হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ গরু তার শিংয়ের বড় বেশী ব্যবহার করে। তাই মানুষ যত্ন করে

অল্প শিংযুক্ত গরু বেছে নিয়ে শিংশূন্য গরুর সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। কারণ, মানুষ ত তাদের পালন ও রক্ষা করছেই তখন তার অযথা শিংয়ের ব্যবহারের কি দরকার? যেমন ইংরাজ জাতি ভারতবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন বলেই তাদের নিরস্ত্র করে দিয়েছেন। এতে তাদের আত্মরক্ষার জন্য আর যুদ্ধ করতে হয় না বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের ক্ষাত্রবৃত্তি একেবারে লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

মায়ের হৃদয়ে যে স্নেহ, এ কেউ কাকেও শেখায় নি বা আবিষ্কার করেনি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মাতৃ-হৃদয়ের এই বৃত্তি বংশানুক্রমিক। কিন্তু যে প্রাণীর মধ্যে প্রথম মাতৃ-স্নেহ দেখা দেয় তা কোথা থেকে এলো? যদিও এই বৃত্তির ইতিহাসের নির্দ্দেশ করা যায় না, যদিও এ হিমালয় পাহাড়ের চাইতে প্রাচীন, তবুও প্রশ্ন উঠে—এ বৃত্তি প্রথম মায়ের মনে ফুটে উঠলো কোথা থেকে? যাহোক, এ বৃত্তিটি কিন্তু দ্বিপদ এবং চতুষ্পদে একই প্রকারের। বাঁদর তার বাচ্ছাকে যেমন নিবিড় স্নেহ-বন্ধনে বেঁধে দেয়, আমাদের মাও ঠিক তেমনি করে রাখে।

কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের ভার এবং স্নেহ মার চাইতে বাপেতে থাকাই ত উচিত ছিল। বাপ যখন সবল সুস্থ তখন শত্রুর হাত থেকে বাপ যেমন রক্ষা করতে পারে, মা তেমন ত পারে না। কিন্তু মাকে যেমন বাধ্য হয়ে সন্তানের কাছে-কাছে থাকতে হয় তেমন বাপের দরকার হয় না। প্রসবের পর মার বেশী পরিশ্রম করবার উপায় থাকে না, কাজে কাজেই মাকে সন্তানের কাছে-কাছে থাকতে হয়। আর একটা কারণ, প্রকৃতি মায়ের স্তনে দুগ্ধ দিয়ে স্নেহের উৎস খুলে দেন। কিন্তু ফের প্রশ্ন ওঠে, এ প্রেম-ঝরণার মূল কোথায়? আর, প্রাণীর মধ্যে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। উট্‌ পাখীর মা ডিমে তা দেয় না, দেয়—বাপে। মাছের মধ্যে অনেক জাতির মায়েরাই ডিমের শত্রু, ডিম পেলেই খেয়ে ফেলে, বাপই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

ক্রমে যতই দিন যাচ্ছে ততই বাপ মায়ের স্নেহ কমে আসছে। কারণ, গ্রাম এখন নিরাপদ। কাজে কাজেই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাপ মায়ের

কমে আসছে। এদিকে বাপ মায়ের ব্যক্তিগত শিক্ষাদান ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে, সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন বেড়ে যাচ্ছে। ছেলে-পুলের লালন পালনের ভার এখন প্রথম অবস্থায় ধাত্রীর নিকট, দ্বিতীয় অবস্থায় বিদ্যালয়ে। পোষাক, খাওয়া দাওয়া, চিন্তা প্রভৃতি সবই আজকাল সাধারণ শিক্ষালয়ে শিশুকে শিখতে হয়। এই রকম করে বাপমায়ের কর্ত্তব্য ধীরে ধীরে কমে আসছে,—এর ফল সঙ্গরাহিত্য হেতু বাপ মায়ের স্নেহের হানি,—এবং স্নেহের অবসানে এই মনুষ্য-সমাজ কি অবস্থায় দাঁড়াবে তা আমরা এখনও ঠিক ঠিক কল্পনা করতে পারি না। কেউ কেউ বলেন, সমস্ত শিশু হবে দেশের (state), কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, বাপ-মা কেবল জন্ম দিয়েই খালাস্। বাপ মার কাছে সব শিশুই সমান হবে, সাহায্য করতে চান সব শিশুকেই করতে হবে। সম্পত্তি নিজের ছেলেপুলের জন্যে রেখে গেলে চলবে না, দিয়ে যেতে হবে দেশকে।

সমাজ এমনি করে বদলাচ্ছে এবং বদলাবে। বেদের ঋষিরা যদি এখন ভারতবর্ষে স্বর্গ থেকে বেড়াতে আসেন তা হলে আমাদের নিরামিষ ভোজন এবং সাহেবী পোষাক দেখে অবাক হয়ে যাবেন। মনু মহা-রাজকে দেখে দার্শনিক নীৎসে (Neitze) প্রাচীন বলে তাকে প্রশংসা করবেন, কিন্তু শূদ্রশিশুরা তাঁর সমাজতত্ত্ব শুনে বিদ্রূপ করবে। জগৎ মানে—গমনশীল, সৃষ্টি—একটা চির পরিবর্ত্তন।

সঙ্গ থেকে স্নেহ, মায়া, মমতা প্রভৃতি জন্মায়। যাঁরা এটা বোঝেন তাঁদের কাছে এ সবের মাধুর্য্য, মোহ অথবা যাদু থাকে না। অন্তরের বেদনা থেকে যে-সব স্নেহ প্রভৃতি মধুর বৃত্তির আবির্ভাব হয় তাঁরা সে-গুলোকে একটা মনের গড়া কল্পনা এবং সেই কল্পনাটা সত্য বলে মেনে নিয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করা, বলে মনে করেন। সাধারণ লোকে স্নেহ, মমতা বা মনের বেদনার বশবর্ত্তী হয়ে যে কাজ করে, জ্ঞানীরা তা যুক্তি ও কর্ত্তব্য বোধে করেন। পূর্ব্বে জ্ঞানের চর্চ্চা কম ছিল। মুদ্রাযন্ত্র সাহায্যে সেই জ্ঞান এখন সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রবেশ করে মানুষকে নানা প্রকারে অবিশ্বাসী করে তুলেছে, কাজেকাজেই বিশ্বাসের

ভিত্তিতে সুশৃঙ্খলিত সমাজ, ধর্ম্ম সবই বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্ত্তনকে ধরে রাখা বড় কঠিন। এরই ফলে দেখা যাচ্ছে, ত্রিপিটক, পুরাণ, বাইবেল এবং কোরাণের গল্পে লোকের অনাস্থা, স্ত্রী ও শূদ্র জাতির অভ্যুত্থান, অধিকারিবাদ না-মানা, খাদ্যাখাদ্য ও স্পর্শ-দোষকে কুসংস্কার মনে করা, আধ্যাত্মিক ব্যবসায়ের একচেটে বন্দোবস্তকারীদের এবং ধনীদের বিপদ এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত, বিজ্ঞান ও সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-মূলক সমাজের উপর লোকের উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা-বৃদ্ধি।

নায়কের অনুসরণ

দেখা যায়, একটা খোঁয়াড়ে যদি একপাল ভেড়া রেখে দেওয়া যায়, এবং তাদের যখন সকালে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন সব ভেড়াগুলোরই চেষ্টা হয়, আগে বেরুবার। হুড়কো খোলবার আগেই, তারা লাফ মেরে বেরিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে পর পর সকলেই লাফাতে থাকে। তারপর যখন হুড়কো খোলা হয়ে যায়, তখনও আগের ভেড়ার মত পরের ভেড়াও লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে থাকে। অগ্রগামীর অনুসরণ করা ভেড়ার একটা প্রবল বৃত্তি। এ থেকেই আমাদের দেশে "গড্ডলিকা প্রবাহ" কথাটা হয়েছে। একটা ভেড়া রাস্তায় যেতে যেতে যদি শুয়ে পড়ে তবে সবগুলো পর পর শুয়ে পড়বে। এ রকম একটা ব্যাপার আমরা প্রয়াগে থাকতে দেখি। যমুনার ব্রিজের ওপর দিয়ে প্রায় আড়াই শো ভেড়া যাচ্ছিল। সামনেরটা যেই হোঁচট লেগে শুয়ে পড়লো আর সেই আড়াই শো ভেড়া পর-পর সমস্ত ব্রিজ জুড়ে শুয়ে পড়ল। যাতায়াত বন্ধ, চাবুক মাল্লেও ওঠে না। শেষে গরুর গাড়ি এনে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়।

বন্য অবস্থায় এরা বাস করতো পাহাড়ে। পালান ছাড়া আত্মরক্ষার এদের আর কোনও উপায় ছিল না। সেইজন্য অগ্রগামী সবল ভেড়া যে ভাবে পালাত পরের ভেড়ারা ঠিক তার অনুসরণ করতো। কত খানা-খড্ডাই পার হয়ে যেতে হোত, এক সঙ্গে সাম্না-সামনি অনেকে যেতো বলে সামনের বস্তু তাদের দেখা অসম্ভব হয়ে পড়তো। সেই জন্য নায়কের

যথাযথ অনুসরণ ছাড়া তাদের বাঁচবার আর কোনও উপায় থাকতো না। পশুদের মধ্যে এই যে অনুসরণ-বৃত্তি দেখা যায় এটাও সেই বন্য জীবনের অবশেষ।

শুনতে পাওয়া যায়, চিকাগোতে নাকি এই নিরীহ পশুদের ঐরূপ স্বভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের একটির পর একটি করে বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হোত। তারা কোনও ওজর আপত্তি করতো না। অন্য পশুদের ঐ বৃত্তি নেই বলে তাদের বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যেতে খুব কষ্ট পেতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলি বন্য-জীবনের অবশেষ। কিন্তু আর এক রকমের অনুকরণবৃত্তি জীবে দেখা যায়। সেগুলো এই জীবনেই তারা অজ্ঞান প্রযুক্ত অনুকরণ করে থাকে। যেমন শিশু আধ আধ ভাষায় দুলে দুলে বই পড়ে, গান করে, কাগজে হিজিবিজি লেখে। আমাদের বাঁকড়ো রিলিফ ক্যাম্পে একটা বাঁদর ছিল সেটা লিখতে গিয়ে কলম ভাঙ্গতো ও কালি ফেলতো, চেয়ারে বসে চা খেতো, ফেলে দেওয়া বিড়ি মুখে দিয়ে বসে থাকতো। 'ফিডি' বলে একটা কুকুর আছে, যেই ছেলেরা রাত্রে শুতে যায়, সেও গিয়ে তাদের পাশে বালিসে মাথা দিয়ে শোয়।

এ ছাড়া পশুদের আরও কতকগুলি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলো ঠিক অনুকরণ কিনা বোঝা বড় কঠিন। বেলুড়-মঠে 'কাপ্তেন' বলে একটা কুকুর ছিল। খাওয়ার ঘণ্টা পড়লেই সেও সেই সঙ্গে চীৎকার করে উঠতো—বোধ হয় বুঝতে পারতো খাওয়ার সময় হয়েছে। 'ভোমরা' বলে আর একটা কুকুর ছিল, তাকে স্নান করিয়ে দিলেই সে প্রসাদ পাবার ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হতো—সে হয়ত ধারণা করে নিয়েছিল স্নানের পর কিছু খেতে হয়। তাকে যতবার স্নান করান যেতো ততবার সে প্রসাদের ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হতো। উদ্বোধন-অফিসে 'লিলি' বলে একটা কুকুর আছে, সে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ ভুলে খরগোসের সঙ্গে খেলা করে, তাদের খাঁচার মধ্যে গিয়ে বসে থাকে, তাদের ছানাদের মাই দেবার চেষ্টা করে—সে বোধ হয় জানে এদের

অনিষ্ট করলেই ঠ্যাঙান খেতে হবে। একবার খেলা করতে গিয়ে একটা খরগোস মেরে ফেলে, এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে লেজ গুটিয়ে খাটের তলায় গিয়ে শুয়ে রইলো। আবার দেখা গেছে মারতে গেলে ছুটে গিয়ে ওপরে শরৎ মহারাজের পেছনে গিয়ে লুকুতো—সে বুঝতো যে, এঁর কাছে গেলে মারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। বেলুড়-মঠে 'গঙ্গা' বলে একটা গরু আছে সেও অপরের বাছুরকে দুধ দেয়, প্রসব মাত্র অপরের বাছুরের গা চেটে দেয়। আরও অনেক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি,—এগুলো তাদের অনুকরণ-বৃত্তি, না সহজাত-জ্ঞান, না বুদ্ধি, ঠিক বলা বড় কঠিন।

পাশ্চাত্যেরা কেউ কেউ বলেন, পশুদের আত্মা নাই; এগুলো কি তারই লক্ষণ? না একই জীবাত্মার, নিজ কর্ম্মফলে বহুযোনি-ভ্রমণের ফলে, সকল অভিজ্ঞতা সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে তোলা থাকে, উপযুক্ত অবস্থা পেলেই সেই সংস্কার স্মৃতিরূপে আরূঢ় হয়ে মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়,—তাই পশুর মধ্যেও অতি বড় সভ্যের ধর্ম্ম এবং অতি বড় সভ্যের মধ্যেও পশুর ধর্ম্ম দেখা যায়। অসভ্য পশুতে যে কৃতজ্ঞতা, দয়া, বিশ্বস্ততা, ত্যাগ, ভালবাসা প্রভৃতি যে দৈবী সম্পদ এবং সভ্য মানবে যে হিংসা, চৌর্য্য, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি আসুর সম্পদ দেখতে পাওয়া যায়—এর কারণ কি? দৈবী সম্পদ যদি ক্রমবিকাশের ফল হয় তবে সেগুলো অত নিম্ন স্তরে দেখা দিল কি করে? আর আসুর-সম্পদ যদি নিম্ন স্তরের ধর্ম্ম হয় তবে সেগুলো এত প্রচণ্ড ভাবে সভ্য-মানবের মধ্যে বর্ত্তমান কেন? একটা বাঘ তার শত্রুকে নখ দিয়ে চেরে, আর সভ্য মানব বেয়নেট দিয়ে ফাড়ে, একটা সাঁওতাল হয়ত একটা লোককে গলা টিপে মারে, আর সভ্য মানব গ্যাস দিয়ে দম বন্ধ করে দেয়, একটা বুনো হয়ত পাথর ছুড়ে একটা মানুষ খুন করে, আর সভ্য মানব উড়ো জাহাজে চড়ে গেরস্তোর বাড়ীর ওপর বোমা ফেলে—উন্নতিটা কোথায়? সভ্যতা এবং অসভ্যতা ত সমান ভাবে সব যুগেই রয়েছে। তবে কাল্‌চারের এত গর্ব্ব কেন?

বাসুদেবানন্দ

দীপালি

বৃথা তব দীপালি উৎসব,
বৃথা তব দীপদান সব,
মূঢ় তুমি, একি আকিঞ্চন !
ক্ষুদ্র তব দীপের প্রয়াসে
কতটুকু আঁধার বিনাশে,
ক্ষীণ জ্যোতি করি বরিষণ ?
ওই তব অট্টালিকা পাশে,
লুকায়েছে দুঃখ, লাজ, ত্রাসে
অন্ধকারে মৃন্ময় কুটীর !
অন্ধকারে ভরা দশদিক
অমানিশা স্তব্ধ অনিমিখ্
হেরে চেষ্টা ক্ষুদ্র জোনাকীর !

চাই আলো, চাই আলো, কবি !
আঁধারে ঘিরেছে আজি সবি
অলক্ষ্মী এসেছে ওই ঘরে ;
দীপকেতে রুদ্র তান ধর,
অলক্ষ্মীরে দগ্ধ আজি কর,
হীন স্বার্থ পুড়ে যেন মরে ।
হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, দ্বেষ
সে আগুনে হউক নিঃশেষ,
ত্যাগ-দীপ দাও আজি জ্বালি ;
হেরি পূত আলোকের রেখা,
লক্ষ্মী, স্বস্তি, শুভ দিবে দেখা,
ধন্য হবে আজি এ দীপালি ।

শ্রীবিজয়গোপাল গাঙ্গুলী

ইউরোপে চার্চ্চিয়ানিটী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চার্চ্চিয়ানিটীর প্রতিষ্ঠা

পশ্চিম-রোমকসাম্রাজ্যে যে সমস্ত জার্ম্মানদল শাসন করিত তাহাদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক নামক একটি শাখা অতিশয় বলশালী হইয়া, অন্য সমস্ত দলকে পরাভূত করিয়া পশ্চিম ও মধ্য-ইউরোপে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই শাখা রোমকচার্চ্চের অত্যন্ত পৃষ্ঠপোষক ছিল বলিয়া, বিশপ ও আর্চ্চবিশপগণ সাম্রাজ্য বিস্তারে ইহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ফ্রাঙ্করাজ ইটালীর এক সমৃদ্ধসম্পন্ন প্রদেশ জয় করিয়া তাহা চার্চ্চকে দান করেন। এইরূপে ফ্রাঙ্করাজ্য ও রোমকচার্চ্চ অথবা ফ্রাঙ্করাজ ও পোপের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে খৃষ্টমাসের সময় ফ্রাঙ্করাজ সার্লেমান্‌কে পোপ 'রোমকসম্রাট' উপাধি দান করিয়া তাঁহাকে রোমকসাম্রাজ্যের অধীশ্বর-পদে বৃত করিলেন। তখন রোমকচার্চ্চ ও রোমকসাম্রাজ্য, এই দুই এর সহযোগিতায় খৃষ্টীয় সমাজে এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি হইল, তাহা এই,—খৃষ্টীয় সমাজের দুইটি প্রধান অঙ্গ। একটি—Temporal বা পার্থিব অথবা রাষ্ট্রনৈতিক, অন্যটি—Spiritual বা ধর্ম্মনৈতিক। রাজনৈতিক শাসনের জন্য রাষ্ট্র-মহামণ্ডল এবং ধর্ম্মনৈতিক শাসনের জন্য ধর্ম্ম-মহামণ্ডল শ্রীভগবান সৃজন করিয়াছেন। রোমকসম্রাটের উপর রাষ্ট্র-মহামণ্ডল বা সাম্রাজ্যশাসনের ভার এবং রোমকপোপের উপর ধর্ম্ম মহামণ্ডল বা খৃষ্টীয় জনগণের ধর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার—তিনিই দিয়াছেন। সম্রাট ও পোপ তাঁহার দুই হস্তস্বরূপ। অতএব খৃষ্টীয় সমাজের রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম বিষয়ক যাহা কিছু সমস্তই তাঁহাদের শাসনাধীনে চলিবে এবং তাঁহাদের আদেশ অমান্য করা ভগবদ্‌ বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবে।

রোমকসাম্রাজ্যের রাষ্ট্রবিভাগের উপর রোমকসম্রাটের এই অসামান্য পদগৌরব প্রজাবর্গ মানিয়া লইলেও, তাঁহার সর্ব্বময় প্রভুত্ব তাহারা কখনও স্বীকার করে নাই, কিন্তু ধর্ম্মবিভাগে রোমকসমাজের উপর রোমকচার্চ্চের সর্ব্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চার্চ্চের শাখা-প্রশাখা তখন সমগ্র সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন দেশে ও প্রদেশের প্রাদেশিক কেন্দ্রে আর্চ্চবিশপগণ থাকিতেন। তাঁহাদের অধিকারে বিরাট ভূসম্পত্তি থাকিত। বড় বড় রাজপ্রতিভূর মত তাঁহারা রাজার হালে বাস করিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাসনাধীন এক একটি ভূভাগের নাম ছিল—"ডাইওসিস্" (Diocese)। বহু যাজকমণ্ডলী তাঁহাদের অধীনে থাকিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশমত ধর্ম্মশাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কোন দেশে বা প্রদেশে দুইজন আর্চ্চবিশপ থাকিলে দুইজনের মধ্যে একজনের উপর কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইত। সমগ্র যাজক ও আর্চ্চবিশপ মণ্ডলীর একমাত্র কর্ত্তা পোপ—এই ভার নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তাঁহার বাণীই ভগবদ্ বাণী, সুতরাং ভগবদ্ বাক্য যেমন মিথ্যা হইতে পারে না তেমনি তাঁহারও বাক্য কখনও কোন রূপে মিথ্যা হইতে পারে না—সর্ব্বদা অভ্রান্ত, অতএব তাঁহার আদেশ ভগবানের আদেশের ন্যায় বিনা বাক্য ব্যয়ে ও বিনা বিচারে পালন করিবার জন্য সকলকে বাধ্য করা হইত। যদি রোমক-সম্রাট বা রাজন্যবর্গ কোন প্রদেশে কাহাকেও আর্চ্চবিশপ নিযুক্ত করিতেন, রোমকযাজকসম্রাট পোপ আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি করিয়া সেই নিয়োগ অনুমোদন না করিলে তাহার কোনই মূল্য বা গুরুত্ব থাকিত না।

পোপ, আর্চ্চবিশপ ও যাজকমণ্ডলী কেহই বিবাহ করিতেন না। সুতরাং কোন পোপের দেহান্তর হইলে সত্তর জন প্রধান যাজক কর্ত্তৃক গঠিত একটি কমিটী হইতে পরবর্ত্তী পোপ মনোনীত হইতেন। কমিটীর এই সত্তর জন সভ্যের প্রত্যেকের উপাধি ছিল "কার্ডিনাল"। কার্ডিনাল-গণ নিজেদের ভিতর হইতেই কোন একজনকে উপযুক্ত বাছিয়া পোপের আসনে বসাইয়া দিতেন।

সাধারণ যাজকগণ গ্রামে গ্রামে গিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট

'ক্রিশ্চিয়ানিটী' প্রচার করিয়া তাহাদিগকে 'চার্চ্চিয়ানিটী'র অধীনে আনিতেন। কিন্তু এই 'চার্চ্চিয়ানিটী'র বাহিরে আর একটি ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল। তাঁহারা ছিলেন 'হার্মিট্' (Hermit)। তাঁহারাও বিবাহ না করিয়া মঠে বা আশ্রমে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেন এবং অবসরকাল লোককল্যাণের জন্য বিপন্নের সহায়তা, রোগী-পরিচর্য্যা, বিদ্যাদান প্রভৃতি সমাজহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের অধীনে বহু হাসপাতাল, অনাথালয় ও বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। তাঁহাদের মধ্যে এমনও অনেকে ছিলেন যাঁহারা চিরজীবন সর্ব্বদা এই সব কাজ লইয়াই থাকিতেন। তাঁহাদের যাঁহারা অধ্যক্ষ, তাঁহারাও সম্মানে ও প্রতিষ্ঠায় রোমকআর্চ্চবিশপগণ হইতে কিছুমাত্র ন্যূন ছিলেন না। তাঁহাদেরও অধীনে প্রভূত ভূসম্পত্তি থাকিত। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া, ঐ সমস্ত কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ধনিগণ তাঁহাদিগকে বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি দান করিতেন। হার্মিট্গণ ছিলেন— ন্যায়নিষ্ঠ, পবিত্র, বিদ্যানুরাগী, সাধন-ভজনশীল এবং লোককল্যাণরত। তাঁহাদের সম্পত্তির বাৎসরিক যে আয় হইত, তাহার কতকাংশ তাঁহারা দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। যাজকমণ্ডলীর সহিত হার্মিট্গণের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তাঁহাদের প্রচার কার্য্যে হার্মিট্-গণও সহায়তা করিতেন। অনেক সময় যাজকমণ্ডলীও তাঁহাদের মতামত লইয়া চলিতেন। এইরূপে ধীরে ধীরে হার্মিট্গণও চার্চ্চিয়ানিটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্পত্তিও চার্চ্চের অধীনে আসিল। রোমকযাজকসম্রাট পোপের অধীনতা স্বীকার করিবার এবং তাঁহাকে মানিবার কোন বাধাই হার্মিট্গণের ছিল না, কারণ তিনি ভগবানের প্রতিনিধি, সুতরাং সকলেরই অবশ্য মান্য। এখন হইতে, যাজকগণের ন্যায় হার্মিট্গণের কর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য হইল—সর্ব্বাগ্রে পোপের ও চার্চ্চের স্বার্থরক্ষা, তারপর অন্য কাজ। হার্মিট্গণের ভূসম্পত্তি এবং সর্ব্বাঙ্গীন সহায়তা পাইয়া, পোপের ও চার্চ্চের প্রভুত্ব ইউরোপের বহু দেশে অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল।

হার্মিট্গণ পার্থিব জীবন ত্যাগ করিবার সময় ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞায়

আবদ্ধ হইতেন, প্রথম—Chastity (পবিত্রতা), দ্বিতীয়—Poverty (দারিদ্র্য), এবং তৃতীয়—Obedience (অধ্যক্ষের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা)। হার্‌মিট্‌গণ যখন চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত হইলেন তখন তাঁহাদের এই ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞা, পোপ ও আর্চ্চবিশপগণ নিজেদের যাজকমণ্ডলীর মধ্যেও প্রবর্ত্তন করিলেন, অর্থাৎ যে কেহ যাজক শ্রেণীভুক্ত হইতে আসিতেন তাঁহাকেই এই তিনটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। ধর্ম্মের শাসন যত দৃঢ় হয়, রাষ্ট্রের শাসন ততদূর দৃঢ় হইতে পারে না ; সুতরাং হার্‌মিট্‌ ও যাজকমণ্ডলীর এই অকপট আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, রোমকসাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ধর্ম্মপতি পোপকে অধিক শক্তিমান করিয়া তুলিল। তখন হইতে সম্রাটের সহিত পোপের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। এতদিন ছিল রোমকধর্ম্মরাজ্যের (The Holy Roman Empire) দুইটি অঙ্গের দুইজন প্রভু, রাষ্ট্রের—সম্রাট এবং ধর্ম্মের—পোপ। ভগবানের দুইজন প্রতিনিধি এইরূপে তাঁহার রাজ্য শাসন করিতেন, কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেন না, বরং পরস্পরের সহায়তায় উভয়েই শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এখন পোপের শক্তি এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল যে, রাষ্ট্রনৈতিক কোন কোন বিষয়ে তিনি সম্রাটকেও আর গ্রাহ্য করিতেন না। পোপ বলিতেন, মানবের পার্থিব জীবন হইতে ধর্ম্মজীবন শ্রেষ্ঠ, তিনি সেই শ্রেষ্ঠ রাজ্যের অধীশ্বর, সুতরাং পার্থিব রাজ্যের সম্রাটের আসন তাঁহার অনেক নিম্নে, অতএব তিনি তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া চলিবেন কেন? এবং সম্রাটেরও তাঁহাকে কোন বিষয়ে আদেশ করিবার কি অধিকার আছে? রোমকসম্রাট সার্লেমান্‌ হইতে এ পর্য্যন্ত সকল রাজাকেই তাঁহারা সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং এখনও করেন, এইরূপে রাষ্ট্রীয় শাসনভার তাঁহারাই সম্রাটের হাতে দেন, সুতরাং সম্রাট তাঁহাদেরই প্রতিনিধি—ভগবানের প্রতিনিধি নহেন। অবশ্য রোমকসম্রাট, পোপের এই দাবী মানিয়া লইতে পারিলেন না। ফলে বাধিল যুদ্ধ। যুদ্ধে রোমকপোপই জয়ী হইলেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া পোপের ও যাজকমণ্ডলীর প্রভুত্ব আরো আশাতীত রূপে বাড়িয়া গেল।

(ক্রমশঃ) চন্দ্রেশ্বরানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

১৯২০, ৫ই জুলাই, সোমবার, সকাল

তখন তিনি দাড়ি কামাচ্ছিলেন। সু—নমস্কার করলেন। অ—মহারাজ বললেন যে, কামাবার, জল খাবার, হাতে আগুন—এমন সময় কাউকে নমস্কার করতে নেই।

স্বামী তু—অর্থাৎ এমন সময়ে নমস্কার করবে যাতে বিঘ্ন না ঘটে। পাশে নমস্কার করায় বললেন—সামনে নমস্কার করতে হয়, তাহলে দেখা সাক্ষাৎ হয়। তা নইলে ত মনে মনেও নমস্কার করা যায়। অনেকে বলে থাকে, অত (বাঁধা) বিধিনিষেধ থাকা ভাল নয়—স্বাধীনতা বাড়তে পায় না। ছেলেবেলায় কথাগুলো বেশ লাগত, ভাবতাম, ঠিক কথা। যত বয়স বাড়ছে, দেখছি—ওগুলো কিছু কাজের কথা নয়, নেহাৎ non-sense (বাজে কথা)। অনধিকারীকে দিলেই জিনিস বিকৃত হয়; স্বাধীনতা হয় না, উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ে। তবে ব্রহ্মজ্ঞানী সমুদয় বিধিনিষেধের পারে।

ঐ দিন—বৈকাল ৫টা

আজ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু গরম বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। মহারাজ বারান্দায় easy chairএ (আরাম কেদারায়) বসে আছেন। বলছেন, বারান্দায় রাত্রিতে ঘুমুতে ভারি কষ্ট—একটুও হাওয়া নেই। আর তুমিও যেমন! শরীরের জন্ম কত করছে, কিছুতে কি কিছু হচ্ছে? শরীরং ক্ষণভঙ্গুরম্।

উপস্থিত একজন সাধু কুমিল্লার বিরাগী ছেলেটির কথা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, বৈরাগ্যবান্ বলে বোধ হয়। বাঙ্গলা দেশে এক মহাপুরুষের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ কোরে প্রায় ১১ বৎসর যাবৎ

তাঁর উপদেশানুসারে জীবন কাটাচ্ছে। ভাল বলেই বোধ হয়। আর একদিন এসেছিল, সেই দিনই পরিচয় হয়েছে। অসিঘাটে থাকে।

একটি বালক জাম পাড়ছিল। অনেকবার বিফল প্রযত্ন হয়ে শেষে দুই একটা জাম কুড়িয়ে পেলে।

পূর্ব্বোক্ত সাধুটি বললেন,—মহারাজ, এ ছেলেটিকে আমাদের ওখানে (অনাথালয়ে) রাখার প্রস্তাব হয়েছিল।

স্বামী তু—আর একটি ছেলের কথা কা— তোমাকে বলেনি? ঐ যে ম্যাট্রিক্ পাশ কোরে এখানে কলেজে পড়বে বলে আসতে চায়। তুমি কি বলেছ?

সাধু—ছোট ছেলেদের মধ্যে তাকে রাখা যায় কিনা, তাকে না দেখ্‌লে কি কোরে বলা যায়? ছেলেটির বয়স হয়েছে, তার ভালমন্দ যা হোক্ চরিত্র একটা গঠন হয়েছে, এ অবস্থায় তাকে বিশেষ করে না জানা পর্য্যন্ত আমি ত বলতে পারিনে যে, সে ছেলেদের মধ্যে থাক্। এখানে আস্‌লে তার জন্যে যা best possible তাই কোরে দেওয়া যাবে এখন।

স্বামী তু—আমাদের ইচ্ছা, যখন একটা প্রতিষ্ঠান আছেই তখন সেটা বেড়ে উঠুক্। তার বাড় বন্ধ করে রাখা ত আর ঠিক নয়।

সাধু—আমার ইচ্ছা, যারা যথার্থ অনাথ তারা যদি কেউ এসে পড়ে তাকে অবশ্য রাখ্‌তে হবে। কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ছেলে রাখ্‌তে গেলে এখানে না রেখে অন্যত্র বন্দোবস্ত করে দেওয়াই ভাল।

স্বামী তু—সেবাশ্রমের ভাবটা দেশ নিয়ে ফেলেছে। দেখ না, কত সেবা-সমিতি হচ্ছে। এখন আর আমরা না করলেও চলে। শরৎ-মহারাজের সঙ্গেও আমার এ সম্বন্ধে আলাপ হয়েছে। শিক্ষাসম্পর্কে এখনও আমরা কিছুই করে উঠ্‌তে পারিনি। কিন্তু এ কাজটার আরম্ভ হয়ে যাওয়া দরকার।

সাধু—মহারাজ, আমাদের সেবাশ্রমের অনাথালয়ের বারান্দায় বাহিরের ছাত্রদের নিয়ে আমরা ক্লাস খুলতে পারি, কিন্তু এতে এক গোলমাল হয় এই যে, ছেলেরা নিজেদের স্বার্থ এত ভুলে বসে যে, যখন তারা বুঝতে পারে যে, বেতন দিতে হয় না, জরিমানাও দিতে

হয় না, তখন থেকে তারা আর নিয়মের বাঁধাবাঁধির ভেতর থাকতে চায় না।

স্বামী তু—তাদের প্রথমটা সাবধান করে দিয়ে, যদি তারা না শোধ্‌রায় পরে তাড়িয়ে দিলেই হল। তু—বাবুদেরও ইচ্ছা, এ রকম ইস্কুল হয়। মহেশ ভট্টাচার্য্য কুমিল্লায় জায়গা দিতে চেয়েছেন—মেয়েদেরটা ত খুলেই দিয়েছেন। এখন ছেলেদের জন্য তেমন লোকই পাচ্ছেন না।

তেমন লোকই দেখছি না। এখন ত কত গ্রেজুয়েট্‌ আস্‌ছে। তাদের সে ভাব কই? আমি সকলের কথা বলছি না, কিন্তু অনেকেই তেমন সুবিধার নয়। তাদের মতলব যে, যখন ঘর ছেড়ে এসেছি, তখন আর খেটে মরবো কেন? যেটুকু যার কাজ সেটুকু করে খালাস। আর দিব্যি রাঁধা ভাত! কিন্তু ঘরেতে বাপ-মা-ভাইদের সঙ্গে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি যারা ঠাকুরের জনকে আপনার জন না ভাবতে পারবে, আর সকল সেবকরা ভাই-ভাই—এ ভাব না আন্‌তে পার্‌বে—তাদের কিছুই হবে না। এখন তবুও চলে যাচ্ছে, কিন্তু এঁরা গেলে যে কি হবে কে জানে? তখনই গোল। লোক তৈরী হচ্ছে না। আবার কেউ কেউ বল্‌ছে, এ ত স্বামিজীর মত, ঠাকুরের মত নয়। আরে, স্বামিজীর মত কি ঠাকুরের মত থেকে আলাদা? গোল থাকে ত মিটিয়ে নে না। আলোচনা হওয়া ত খুবই ভাল।—কে জান? ওরও ঐ মত। মার বাড়ীতে যখন থাকতাম তখন আমার ভারি অসুখ। ওর সঙ্গে ভারি তর্ক হোত। কিছুতেই বুঝতে চাইতো না। আর এদের বল্‌লেও হবে না। যা মাথায় ঢুকেছে, অন্য কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। আর বল্‌বে, আমরা নিজেরা আগে কিছু বুঝে টুঝে নিই, তারপর কাজ কর্‌বো।

আমি একবার খুব বলেছিলাম। স—ও সেখানে ছিল, আর আমার কথাগুলো তার খুব ভাল লেগেছিল। কাজেই ফিরে গিয়ে আমার কথার উপর খুব চড়িয়ে আমি যা বলিনি, স—ওকে বলেছে। ও ত কেঁদেকেটে প্রকাণ্ড এক চিঠি লিখলো। শেষে আমি উত্তর দিয়ে দিলাম যে, ওর অনেক কথাই আমি বলিনি।

সবাই বলে, ধ্যানজপ করবো। কিন্তু তাও কি করে? আর ধ্যানজপ কি একমাত্র পথ? এখানে থাকবে ও এখানের ভাব মানবে না—এ ভারি অন্যায়। দেখতে হয়, ভাবটা কি? মিশনের সব সুযোগ সুবিধা-গুলিও নেবে, অথচ ভাবটা মানবে না! স্বামিজীর যে ভাব—একশবার আমি জন্মাব কেবল পরের সেবার জন্য—এই ভাবটা ত নেওয়া চাই? তা নইলে এখানে কেন? বাইরে ত ঢের ঢের সাধুসন্ন্যাসী আছেন! ভিক্ষা কোরে খাও, ধ্যান কর।

নূতন দলের মধ্যে যা দেখছি, স—ই বেশ ছোকরা, খুব উৎসাহ, তবে শরীরটা বিশেষ ভাল নয়। মহারাজকে বল্লে, "যা বলবেন, তাই করবো। আর আমি না পারি, তখন আপনাকে যেতে হবে।" সাহস কোরে লেগে গেল—ভেতরটাও খুলে গেল। এ রকম ভাবের সহিত কাজ করতে করতে হঠাৎ এক সময় খুলে যায়। কটা বাজ্‌ল? গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন স্নান করতে যাই।

প্রশ্ন

বঙ্গভাষায় অশ্লীল ও লালসাপূর্ণ কুরুচি সাহিত্যের আদি স্রষ্টা কে বা কাহারা? এই কুরুচি যখন আমাদের নির্ম্মল গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দূষিত করিতেছে তখন সেই কারণ ধ্বংসের উপায় কি?

শ্রীভারদ্বাজ

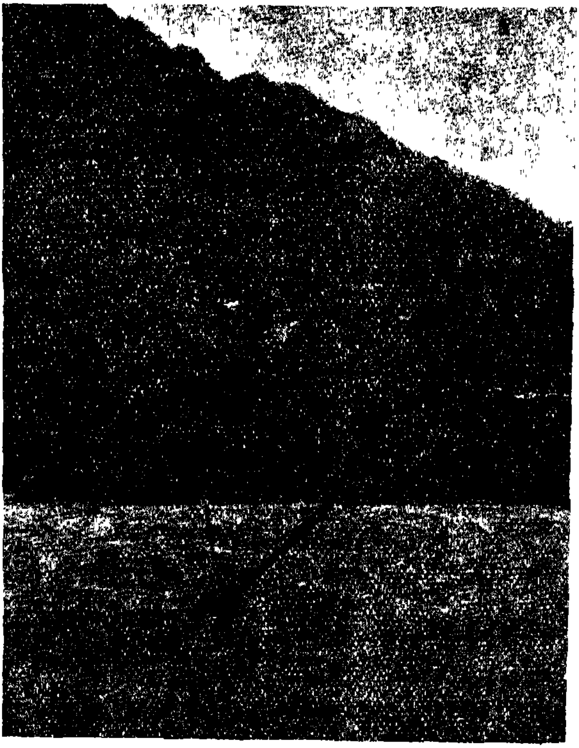
কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৩শে জুলাই বৃহস্পতিবার পাঁচটা ত্রিশ মিনিটের সময় আমরা জলজীবী হইতে ধারচুলা যাত্রা করিলাম। এখান হইতে ধারচুলা ষোল সতের মাইল। জলজীবীর মন্দির বড় রাস্তা হইতে বহু নীচে বলিয়া মালপত্র লইয়া উপরে উঠিতে আমাদের বড় কষ্ট হইল। ধারচুলার রাস্তা মোটামুটি মন্দ নয়। তবে সময় সময় জোর বৃষ্টি হওয়ায় বড় অসুবিধা হয়। জলজীবী হইতে পাঁচ মাইল যাইয়া একটি গ্রামে স্নান শৌচাদি করিয়া কিছু জলযোগের পর আমরা আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই গ্রামে রান্না করিয়া খাইয়া পথচলা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করায় রাস্তায় ক্ষুধায় আমাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইল। সারাদিন অন্ন জোটে নাই। কোথাও কোথাও রাস্তার ধারে ভুট্টার ক্ষেত আছে। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা কাঁচা ভুট্টার সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। রাস্তা অনেক সময়ে কালী নদীর ধার দিয়াই গিয়াছে। অনুমান সাত মাইল চলার পর আমরা বালুয়াকোট্ পৌছিলাম। বালুয়কোট্ গ্রামটি রাস্তা হইতে সামান্য দূরে—উঁচু পাহাড়ে। সেখানে যাইলে রান্না করিয়া খাওয়া চলিত। কিন্তু আজই ধারচুলা পৌছিব মনে করিয়া খাওয়া হয় নাই। সুতরাং কর্ম্মভোগ অনিবার্য্য। বালুয়াকোট্ এবং ধারচুলার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ভোটিয়াদের শীতকালে আসিয়া বাস করার উপযোগী কতকগুলি ঘর আছে। এই রাস্তায় কয়েকটি গ্রাম পার হইয়া একটি ছোট নদী পাওয়া যায়। এই ভাবে চলিতে চলিতে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা ধারচুলায় পৌছিলাম

ধারচুলা কালী নদীর সন্নিকটে অনেকটা সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এখানকার উচ্চতা বোধহয় ৩০০০ ফিটের অধিক হইবে না। গ্রীষ্মকালে

এখানে বেশ গরম পড়ে ; আম, পেয়ারা ইত্যাদি ফল এখানে পাওয়া যায়। লোকসংখ্যা মন্দ নয়, বিশেষতঃ শীতকালে। কারণ, তখন বহু ভোটিয়া পরিবার শীতপ্রধান অঞ্চল হইতে আসিয়া এখানে বাস করে। রাস্তা হইতে তাহাদের সব ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি দোকান এবং একটি পোষ্ট-অফিস আছে। কালী নদীর অপর তীর-বর্ত্তী নেপাল রাজ্য রাস্তা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।



ধারচুলায় কালী নদীর উপর ঝোলা দিয়া লোক পার হইতেছে।

এখানে কালী নদীর দড়ির পুল আছে। স্থানীয় অভ্যস্ত অধিবাসিগণ এই সঙ্কটাপন্ন পুল দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করে। দেখিলে অবাক হইতে হয়।

ধারচুলা হইতে আড়াই মাইল দূরে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ-তপোবন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এবং পরিশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় আমরা 'তপোবনে' পৌঁছিলাম। ইতিপূর্ব্বে কৈলাস যাওয়ার রাস্তায় 'তপোবনে' আমরা দুই একদিন থাকিব বলিয়া পত্র দেওয়ায় সেথানকার সন্ন্যাসী মহারাজগণ আমাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহারা খুব আহ্লাদিত হইলেন। এইবার নিজেদের স্থানে আসা গেল। দুই একদিন নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করা যাইবে।

'তপোবন' নূতন প্রস্তুত হইয়াছে। আশ্রমটি কৈলাস যাওয়ার রাস্তায়। পাশেই কালী নদী। চারিদিকে উঁচু পাহাড়। 'তপোবনে'র নিকট 'তপৌনা' বলিয়া একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। 'তপৌনী' হইতে 'তপোবন' নাম-করণ হইয়াছে। 'তপোবনে'র কাছেই খেলার রাস্তায় একটি জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে সেই জলপ্রপাত বৃহৎ আকার ধারণ করে। শ্রীমতী রুমা দেবীর নাম এই অঞ্চলে অনেকেই জানেন। তাঁহার মত ধর্ম্মপ্রাণা এবং সেবাপরায়ণা স্ত্রীলোক এদিকে বিরল। তিনি যে কত কৈলাসযাত্রীকে কতভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় এবং রামকৃষ্ণ-মিশনের জনৈক সন্ন্যাসীর সহায়তায় আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপর একজন সদাশয়া ভোটীয়া রমণী 'তপোবনে' একটি শিবালয় এবং ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। 'তপোবনে' নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অবৈতনিক স্কুল খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। অল্পবিস্তর কাজ আরম্ভও হইয়াছে। এথানে আমরা একদিন ও একরাত্রি বাস করি। ধারচুলা হইতে রাস্তার জন্য চাল, ডাল ইত্যাদি রসদ কিছু কিনিয়া লওয়া হইল। 'তপোবনে'র সন্ন্যাসী মহারাজগণ আমাদিগকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। এথানকার স্বামী বুদ্ধানন্দ আমাদের সঙ্গে কৈলাস-দর্শনে যাইবেন স্থির হইল। তাঁহাকে লইয়া এইবার আমরা চারিজন হইলাম। কুলী মাধোয়াকে তাহার পাওনা মজুরী চুকাইয়া দিয়া এইথানে বিদায় দিলাম। আমাদের মালপত্র লইয়া যাওয়ার জন্য নূতন দুইজন ভোটীয়াল্ (নেপালী) কুলী

ঠিক করা হইল। তাহারা আমাদিগকে গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। 'তপোবন' হইতে গার্ব্বিয়াং ঘোড়ায় মাল লইয়া যাওয়া মুস্কিল। রাস্তা জায়গায় জায়গায় অত্যন্ত খারাপ।

২৫শে জুলাই, শনিবার, দুপুর বেলা খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিয়া আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের পরের ষ্টেজ খেলা এখান হইতে সাত মাইল। আমাদিগকে পূর্ব্বকথিত জলপ্রাপাতটি পার হইয়া যাইতে হইল। রাস্তা কালী নদীর ধার দিয়া। আধ মাইল যাইয়া দেখি, উপরের পাহাড় ধসিয়া পড়ায় রাস্তার চিহ্ন মাত্র নাই। কি করিয়া এস্থান অতিক্রম করা যায় ভাবিয়া আমরা আকুল হইলাম। পাহাড় একদম খাড়া। নীচেই ভীষণকায়া কালী নদী ভীম-বিক্রমে গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়াছে। কোথাও পা রাখিবার জো নাই। একটু চাপ দিলেই মাটি এবং পাথর সরিয়া যায়। তারপর উপর হইতে যখন তখন বড় বড় পাথর ধসিয়া ছুটিয়া আসে। কুলী দুইজন অনায়াসে এইস্থান অতিক্রম করিয়া গেল। আমরা চারিজন অতি কষ্টে এ স্থানটি পার হইলাম। আন্দাজ একশত গজ স্থান পার হইতে আমাদের এক ঘণ্টার উপর লাগিয়াছিল। অতঃপর অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা পাওয়া যায় নাই। শেষের দিকে চড়াই বেশী। সন্ধ্যার সময় আমরা খেলায় পৌঁছি। খেলায় একটি পোষ্ট-অফিস আছে। আমরা পেনশনপ্রাপ্ত পোষ্ট-মাষ্টারের বাড়ীর এক বারান্দায় আশ্রয় লইলাম। এখানে খুব ভাল গাওয়া ঘী পাওয়া যায়। এখান হইতে রাস্তার জন্য আমরা কিছু ঘী কিনিয়া লইলাম। এখানে একটি ছোট দোকানও আছে।

পরদিন খুব সকালে আমরা আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের পরের ষ্টেজ পাঙ্গু, খেলা হইতে অনুমান আট মাইল। প্রথম দুই মাইল একদম উৎরাই—ধবলী নদীর পুল পর্য্যন্ত। এখানে প্রাতরাশ সারিয়া পুল দিয়া ধবলী পার হইয়া আমরা চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম। ধবলী খানিকটা যাইয়া কালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই রাস্তায় পানীয় জলের বিশেষ অভাব। অদূরে স্থানে স্থানে ছোট বড় জলপ্রপাত

দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সব জায়গায় যাওয়া সহজ নয়। পিপাসা পাওয়ায় আমাদের একটি কুলী কষ্ট করিয়া দূর হইতে এক কমণ্ডলু জল লইয়া আসিল। দুই এক জায়গায় রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কিছু দূর ঘুরিয়া যাইতে হইল। চড়াই শেষ করিয়া মাইলখানেক সমান রাস্তা। তারপর গঙ্গু গ্রাম। গঙ্গুতে ঢুকিবার পূর্ব্বে রাস্তার ধারে একটি বাঁধান পানীয় জলের ধারা আছে। গঙ্গু হইতে ভোটরাজ্য আরম্ভ হয়। ভোটরাজ্য চারিটি পট্টিতে বিভক্ত, যথা—চৌদাস, ব্যাস, দরমা এবং জোহার। গঙ্গু, চৌদাস পট্টির অন্তর্গত। জোহার এবং দরমা আমরা অদূরে রাখিয়া আসিয়াছি। চৌদাস পার হইয়া ব্যাস—আরও উপরে। গঙ্গু গ্রামটি বেশ বড়। এখানে আমরা এক প্রধানের বাড়ীতে উঠি। প্রধান, কয়েক বৎসরের পূর্ব্বে মারা যান। তাঁহার স্ত্রী জীবিতা আছেন। তাঁহার সন্তানাদি নাই। অবস্থা বেশ ভাল। শুনিলাম, তিনি নাকি স্থানীয় স্কুলের জন্য নিজের দুতলা বাড়ী শীঘ্রই ছাড়িয়া দিবেন। গঙ্গুর স্কুলে উচ্চ প্রাইমারী ষ্টাণ্ডার্ড পর্য্যন্ত পড়ান হয়। গঙ্গু গ্রামটি অত্যন্ত অপরিষ্কার। পিশু এবং মাছির এখানে অবাধ রাজত্ব। দিনের বেলায় মাছির জ্বালায় বসা যায় না, রাত্রিতে পিশুর জ্বালায় ঘুম হয় না।

ভোটিয়ারা শঙ্কর-জাতি। ইহাদের ধমনীতে যেমন এদেশী পাহাড়ী রক্ত আছে, তেমনি তিব্বতী রক্তও আছে। ইহাদের চেহারা, ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। না ইহারা এদেশী হিন্দু, না তিব্বতী বৌদ্ধ। ইহাদের গায়ের রং সাধারণতঃ তাম্রবর্ণ, নাক চ্যাপটা এবং চক্ষু ছোট। ইহারা পরিশ্রমী, সরল এবং অতিথি-সৎকার-পরায়ণ; ইহারা অনেকেই ব্যবসা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। চাষবাসও আছে। ভোটিয়ারা পশম দিয়া নিজেদের ব্যবহারের জন্য কম্বল, আলোয়ান, আসন, মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করে। সময় সময় এই সব জিনিষ অল্প পরিমাণে নীচেও চালান হয়। রাস্তায় দেখা যায়, চলিতে চলিতে ভোটিয়ারা টেকো দিয়া সুতা কাটিতেছে। মহাত্মা গান্ধী ভোটে আসিলে ইহাদের এই স্বাবলম্বন দেখিয়া নিশ্চয় খুব খুসী হইতেন। ইহাদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও পান-দোষ প্রবল। দুপুর

বেলার আহার পঙ্গুতে সারিয়া, বিকাল বেলা শোশার দিকে যাত্রা করি।

পঙ্গু হইতে শোশা আড়াই মাইল। প্রথম আধ মাইল উৎরাই করিয়া, একটি ছোট নদী পার হইয়া চড়াই আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার সময় আমরা শোশায় পৌঁছিলাম। চড়াই শেষ করিয়া পাহাড়ের মাথায় খানিকটা সমান জায়গায় এই গ্রাম। গ্রামটি সমৃদ্ধিশালী বলিয়া মনে হইল। আমরা পাটোয়ারী খোসালসিং (কুশলশিং ?) এর বাড়ীতে উঠিলাম। খোশালশিং লোকটি বেশ ভদ্র, আদবকায়দা দুরস্ত। আমাদের খুব আদর যত্ন করিলেন। আমাদের রাত্রিবাসের জন্য একটি পরিষ্কার ঘর ছাড়িয়া দিলেন। গিয়াই আমরা দুগ্ধসংযুক্ত চা পান করিলাম তারপর রাত্রিতে ঘী, মাখন, রুটি, দুইটা তরকারী এবং দুধ। নীচের অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানে রাত্রে বেশ শীত বোধ হইল। যাত্রীদের থাকিবার জন্য এখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে।

২৭শে, জুলাই সোমবার অতি প্রত্যূষে আমরা তীজ্জার দিকে যাত্রা করিলাম। শোশা হইতে তীজা তিন মাইল। সুতরাং তীজায় পৌঁছিতে আমাদের আন্দাজ এক ঘণ্টার বেশী লাগে নাই। প্রথম সামান্য চড়াই, তারপর বাকী রাস্তা উৎরাই। তীজ্জা যাইতে হইলে বড় রাস্তা হইতে নামিয়া অন্য রাস্তায় যাইতে হয়। আয়ার ছিলেন পিছনে, আমরা তিনজন এবং কুলী দুইজন আগে চলিয়া আসিয়াছিলাম। আয়ার একা রাস্তা ঠিক করিতে না পারিয়া অন্য রাস্তায় চলিয়া যান। এ দিকে আমরা তীজ্জা পৌঁছিয়া তাঁহার কোন খবর না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম। কোথায় গেলেন আয়ার ? কি হইল ? না আছে তাঁহার সঙ্গে গরম কাপড়, না কাছে খাবার। তাঁহাকে পিছনে ফেলিয়া আমরা কেন আগে চলিয়া আসিলাম ? কত দুশ্চিন্তা মনে উঠিতে লাগিল। কত আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। ভগবান্ করুন যেন কোন দুর্ঘটনা না হয়! অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা গেল। তবুও আয়ার আসিলেন না। অবশেষে তিনি বড় রাস্তা দিয়া গল্লাগড়ের দিকে চলিয়া গিয়া থাকিবেন অনুমান করিয়া তাঁহার জন্য কম্বল, ওয়াটারপ্রুফ্, মোমবাতি, এবং কিছু খাবার দিয়া একটি লোককে

ঐ দিকে পাঠান হইল। বিকাল বেলা খবর পাওয়া গেল, একটি লোক আয়ারের মত পোষাকপরা এবং ঐরকম চেহারার একজন ভদ্রলোককে গল্লাগড়ের দিকে যাইতে দেখিয়াছে। এই সংবাদে আমাদের দুশ্চিন্তার কতকটা লাঘব হইল। তীজায় আমরা ভোটীয়া সওদাগর লালসিং পাতিয়ালের বাড়ীতে উঠিলাম। লালসিং আমাদের পূর্ব্বপরিচিত। তীজার কাছেই দুই তিনটি গ্রাম আছে। কাছে কোন দোকান নাই। স্থানটি অত্যন্ত অপরিষ্কার। বাড়ীর কাছে রাস্তা দিয়া চলা দুষ্কর। এখানেও পস্সুর মত মাছি এবং পিশুর দৌরাত্ম্য। এখানে রাস্তার দুই ধারে বিচুটিগাছ খুব। লালসিং পাতিয়ালের অবস্থা এক কালে খুব ভাল ছিল। ভোটে তাঁহাকে অনেকেই জানে। তিনি আমাদের যথোচিত আদর যত্ন করিলেন। এখানে একটি স্কুল আছে। এখানে এক রাত্রি কাটাইয়া পরদিন সকালে আমরা গল্লাগড়ের দিকে রওনা হইলাম। রাস্তার জন্য কিছু রসদ এখান হইতে কিনিয়া লওয়া হইল।

তীজা হইতে গল্লাগড় বার মাইল। খানিকটা সমান রাস্তা। তারপর আড়াই মাইল বেশ চড়াই। জায়গায় জায়গায় পাথরের সিঁড়ির মত আছে। চারিদিকে বেশ জঙ্গল। বিচুটিগাছও অপর্য্যাপ্ত। তিন মাইল উৎরাই করিয়া একটি ছোট নদী পাওয়া যায়। কাছে একটি গ্রাম আছে। গ্রামে বেশ ভাল গাওয়া ঘী পাওয়া যায়। আমরা কিছু কিনিলাম। নদী পার হইয়া আবার চড়াই। অনুমান, দুইটার সময় আমরা গল্লাগড়ে পৌঁছিলাম। এখানে রাস্তার ধারেই একটি ধর্ম্মশালা আছে। কিন্তু উহা অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিয়া আমরা নিকটেই লালসিং নামে এক কৃষকের ঘাসের ছাপ্পরেই আশ্রয় লইলাম। সেখানে গিয়া দেখি আয়ারও রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার কাছে অনেক কথা শুনা গেল। তাঁহার মুখে মণ্ডলমহাশয় বলিয়া এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কথা শুনিলাম। মণ্ডলমহাশয় কৈলাস এবং মানস-সরোবর দর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন। রাস্তায় আয়ারের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। লিপুলেক্ পাসে ঠাণ্ডায় তাঁহার পায়ের বুড়া আঙ্গুল খসিয়া পড়িয়াছে। চেহারা

অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। মণ্ডলমহাশয় মায়াবতী হইয়া কৈলাস গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তাঁহার কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। লালসিং গরিব কৃষক হইলেও অতি চমৎকার লোক। আমাদের অত্যন্ত যত্ন করিল। আমরা তাহার আতিথেয়তায় অতিশয় খুসী হইয়াছিলাম। জটাজূটসমন্বিত বাবাজী আনন্দ সিং বলিয়া এক পাহাড়ী সাধুও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বাবাজী অত্যন্ত কঠোরী, ফলমূল ছাড়া কিছু আহার করেন না। তাঁহার পরণে শুধু কৌপীন, পিঠে একটা বোচ্‌কা এবং একটা কম্বল। বোচ্‌কায় তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য দুই একটা জিনিষ, একটা টেকো এবং কিছু তুলা রহিয়াছে। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতের লোক। অবসর পাইলেই টেকো দিয়া সুতা কাটেন। খদ্দর ছাড়া কিছু পরেন না। তিনিও আমাদের মত কৈলাসযাত্রী। তাঁহার সাজসরঞ্জাম দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। এই সামান্য জামা-কাপড় লইয়া লোকটি কি করিয়া কৈলাস দর্শন করিয়া ফিরিবে? না আছে তাঁহার টাকা পয়সার সম্বল! আমরা সকলে সেই ঘাসের ছাপ্পরে কোন রকমে রাত্রি কাটাইলাম। আগামী কাল নিপ্পানীর চড়াই—সেরকম চড়াই কৈলাসের রাস্তায় হিমালয়েতে আর কখনও আমাদের করিতে হয় নাই। পাহাড়টি সারাদিনের রাস্তা। আগা-গোড়া ভীষণ চড়াই এবং উৎরাই। দুই তিনটি গুহা ছাড়া কোথাও থাকিবার স্থান নাই। এই রাস্তায় পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। তাই নাম হইয়াছে নিপানী বা নিপ্পানী। রাস্তায় খাওয়ার জন্য রুটি, তরকারী, কমণ্ডলু ভরিয়া জল ইত্যাদি সঙ্গে রাখিতে হইবে। রাত্রে অল্প অল্প বৃষ্টি হইল। সকালেও বৃষ্টি।

মালপত্র গুছাইয়া নয়টার পর বৃষ্টি থামিলে আমরা যাত্রা করিলাম। পরের ষ্টেজ মাল্পা বার মাইল দূরে। মাঝখানে নিপ্পানী। এই রাস্তার কথা স্মরণ হইলে বুক এখনও কাঁপিয়া উঠে। খানিকটা সমান রাস্তা যাইয়া তার পর নিপ্পানীর চড়াই আরম্ভ হইল। রাস্তা একদম খাড়া এবং অতি সরু। দুইধারে বিচুটি গাছ। তারপর এক পা চলিতেই অসংখ্য জোঁকের

আক্রমণ। তবে চলিবার সময় বৃষ্টি না হওয়ায় কতকটা রক্ষা। আড়াই মাইল একটা চড়াই শেষ করিয়া আমরা কিছু খাইয়া লইলাম। পাহাড়ে চলিবার সময় পেট খালি রাখিতে নাই। সুতরাং চলিতে চলিতে ক্ষুধা পাইলেই আমরা কিছু খাইয়া লইতাম। তারপর উৎরাই পাঁচ ছয় মাইল। আগাগোড়া সিঁড়ির মত রহিয়াছে। চলিতে চলিতে পায়ে এবং হাটুতে ব্যথা হইয়া যায়। সময় সময় দম লইবার জন্য আমরা অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বাবাজীর বেশ স্মরণ-শক্তি! গীতা এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রের অনেক শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ আছে। পথ চলিতে চলিতে তিনি এই সব শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। এই জন্য আমার মজা করিয়া তাঁহার নাম দিয়াছিল "Walking Vedanta" (চলমান বেদান্ত)। এই রাস্তায় তিনিও শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিলেন। জায়গায় জায়গায় রাস্তা এত সরু এবং সঙ্কটজনক যে, গড়াইয়া হাজার ফিট নীচে খরস্রোতা নদীগর্ভে পড়িয়া যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সেই সব স্থানে দাড়াইয়া নীচে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া যায়। পাঠক-পাঠিকাগণ, একবার মানসপটে কল্পনা সহায়ে এই রাস্তার একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া নিন্। তাহা হইলে আমাদের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া আমাদের উপর সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু ভোটিয়াল্ কুলীরা পিঠে পঁয়ত্রিশ সের অথবা একমণ বোঝা লইয়া অনায়াসে এই সব রাস্তায় চলে। দেখিয়া অবাক হইতে হয়। কি কৌশল ইহাদের! কি শক্তি ইহাদের! একটি নদীর ধারে যাইয়া বড় বড় পাথরের উপর বসিয়া আমরা সকলে আহারাদি করিলাম। এই নদীটি আমাদিগকে পার হইয়া যাইতে হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরিশ্রান্ত হইয়া আমরা মাল্লায় পৌঁছি। এখানে কাছে কোথাও লোকালয় নাই। রাস্তার নিকটেই পোষ্টেল রাণারের (Postal runner) থাকার জন্য ঘাসের একটি ছোট ছাপ্পর আছে। আমরা সেখানে আশ্রয় লইলাম। বাস্তবিক নিপ্পানীর রাস্তা ঠিক আসল রাস্তা নয়। নিপ্পানীর নীচে দিয়া কালী নদীর ধারে ধারে যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তাই আসল রাস্তা। সেই রাস্তায় এত চড়াই উৎরাই নাই বলিয়া এইরূপ কষ্ট হয় না।

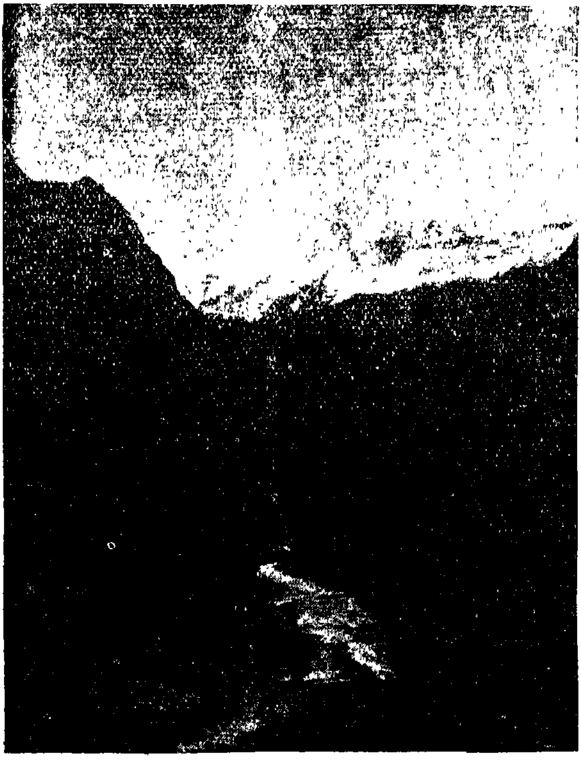
সেই রাস্তায় কালী নদীর উপর একটি পুল আছে। পুল পার হইয়া চলিতে হয়। কালী নদীর এত ভীষণ স্রোত যে, প্রায় প্রতি বৎসরই বর্ষাকালে সেই পুল ভাঙ্গিয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে সেই পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে ঠেকিয়া নিপ্পানী অতিক্রম করিতে হইল।

৩০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যূষে মাল্লা হইতে আমরা বুদির দিকে যাত্রা করিলাম। মাল্লা হইতে বুদি সাত মাইল। অনেকটা রাস্তাই কালী নদীর ধার দিয়া। এই রাস্তায়ও চড়াই উৎরাই আছে, তবে খুব কষ্টকর নয়। মাল্লা হইতে সামান্য দূরে রাস্তার ডানধারে ঠিক কালী নদীর তীরে একটি প্রকাণ্ড এবং চমৎকার গুহা আছে। ফিরিবার রাস্তায় এই গুহায় আমরা এক রাত্রি বাস করিয়াছিলাম। গুহাটি এত বড় যে, উহাতে দশ বার জন লোক অনায়াসে আশ্রয় লইতে পারে। মাল্লা হইতে বুদির রাস্তা দুই এক জায়গায় অত্যন্ত খারাপ এবং সরু। অতি কষ্টে সেই সকল স্থান পার হইতে হয়। পা একটু পিছ্‌লাইয়া গেলেই জীবন-নাশের আশঙ্কা আছে। অনেক সময় সেই সঙ্কটাপন্ন স্থান এড়াইবার জন্য আমরা দূর দিয়া ঘুরিয়া যাইতাম। দুই এক জায়গায় উপর হইতে জলের ধারা আসিয়া পড়িতেছে। মনে আছে, এই রকম একটা স্থান পার হইতে যাইয়া আমাদের জামা, কাপড়, ছাতা খোলা থাকা সত্ত্বেও একেবারে ভিজিয়া গেল। সেখানে মুসলধারে অবিরল যেন বৃষ্টি হইতেছে। বুদির কাছে একটি নদী এবং কয়েকটি ধারা আছে। নদীটি যাইয়া কালীর সঙ্গে মিশিয়াছে। বারটার সময় আমরা বুদি পৌঁছি। বুদির কাছেই একটা ধারায় স্নান করিয়া লইলাম। বুদির উচ্চতা অনুমান ৮০০০ ফিট। বুদিতে একটি স্কুল এবং ধর্ম্মশালা আছে। এখানে পঁচিশ ত্রিশ ঘর লোকের বাস। আমরা স্কুলের প্রাঙ্গণে আহারাদি করিয়া বিকাল বেলা গার্ব্বিয়াং যাত্রা করিলাম।

বুদি হইতে গার্ব্বিয়াং অনুমান চার মাইল। প্রথম দেড় মাইল চড়াই করিয়া বেশ সমতল ভূমি পাওয়া যায়। সবুজ ঘাসের মাঠ। মাঠে নানা রকম ফুল ফুটিয়া আছে। তাহার মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে।

বহুদিন এমন সমতল স্থান দেখি নাই। তাই দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। এখানকার দৃশ্য অতি মনোরম, একেবারে অন্য রকমের। চারিদিকে ছোট ছোট দেওদার গাছ। অন্যান্য গাছ অতি কম। স্থানটির নাম ছালেক্। এখানে শীত অপেক্ষাকৃত বেশী। এখানকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০০ ফিটের কম নয়। দুই একটি ছোট নদী পার হইয়া আমাদিগকে যাইতে হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা গার্ব্বিয়াং পৌঁছিলাম।

গার্ব্বিয়াং-এও বেশ শীত। এখানকার উচ্চতাও ১০০০০ ফিট। স্থানটি সমতল। সম্মুখে কালী নদী এবং অপর পারে অতি সুন্দর তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়।



গার্ব্বিয়াং হইতে তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গের দৃশ্য

গার্ব্বিয়াং ব্যাস-পট্টির অন্তর্গত একটি বড় গ্রাম, ভোটিয়াদের একটি মস্ত আড্ডা। এখানে বহু ভোটিয়া পরিবার বাস করে। অবশ্য আমরা যখন যাই তখন অনেক পরিবারই ব্যবসাব্যপদেশে তিব্বতে চলিয়া গিয়াছিল। এখানকার ঘর বাড়ীগুলি বেশ বড়। অনেক বাড়ীই দুতলা। ঘরের দরজা জানালায় অনেক কারুকার্য্য রহিয়াছে, কাঠের উপর খোদাই করা। এখানে একটি পোষ্ট-অফিস, একটি স্কুল এবং কয়েকটি দোকান আছে। পোষ্ট-অফিস এবং স্কুল একই বাড়ীর বিভিন্ন কামরায়। এখানে একটি ডাক্‌বাঙ্গলা আছে। রাস্তা ঘাট অত্যন্ত অপরিষ্কার। যেখানে সেখানে আবর্জ্জনা এবং ময়লা পড়িয়া আছে।

আমাদের আশ্রয়স্থান স্কুলবাটী। যখন আমরা স্কুল প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলাম তখন ছেলেরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। জটাজূটসমন্বিত বাবাজী আনন্দ সিং তাঁহার ধ্বজা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সগর্ব্বে ভারতমাতা এবং মহাত্মা গান্ধীর জয় ঘোষণা করিলেন। ছেলেরাও তাঁহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিল, "ভারত-মাতাকী জয়, গান্ধী মহারাজকী জয়।" বাবাজীর চেহারা, পোষাক, নিশান এবং টেকো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমরা পৌঁছিয়া দেখিলাম, দুইজন পুরুষ-সাধু এবং দুইজন স্ত্রী-সাধু এই মাত্র কৈলাস হইতে ফিরিয়াছেন। ঠাণ্ডায় একজন সাধুর পা অত্যন্ত জখম হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী-সাধু দুইজনও বেশ কাহিল হইয়া গিয়াছেন।

গার্ব্বিয়াং-এ আমরা তিন দিন একরাত্রি বাস করি। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের এখানকার অনেকের সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় হইল। ৩১শে জুলাই শুক্রবার কয়েকজন শিক্ষিত ভোটিয়া সওদাগর আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে স্থানীয় জন-সাধারণের জন্য ধর্ম্ম, নীতি এবং সমাজসংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। আমার নিজের বক্তৃতা করিবার বিশেষ অভ্যাস নাই। স্বামী বুদ্ধানন্দ আমাদের মধ্যে প্রাচীন। তিনি বলিলে বেশ হয়, কিন্তু তিনি বক্তৃতা দিতে নারাজ। কারণ তাঁহার মত—বক্তৃতায় বিশেষ কাজ হয় না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিয়া

জড় হইল, শেষে কথাপ্রসঙ্গে ভোটিয়া সমাজের নৈতিক দুরবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধানন্দজী বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে দুর্নীতি, কদাচার ইত্যাদি যথেষ্ট আছে। এই সব আশু দূর করার চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ সমাজ উচ্ছন্ন যাইবে। এই ধরুন না, 'রংবং'। রংবং-এ কি সব অশ্লীল ব্যবহারই না হয় *! ইহা কি লজ্জার বিষয় নয়?" উপস্থিত ভোটিয়ারা নিজেদের দুর্গতির কথা ভাবিয়া মরমে মরিয়া গেলেন। বলিলেন, "সুশিক্ষার অভাবই আমাদের অবনতির মূল কারণ।" আমরা বলিলাম, "আপনাদের ত টাকা পয়সার অভাব নাই। স্থানে স্থানে ভাল ভাল স্কুল করিয়া শিক্ষার প্রচার করুন না।"

১লা আগষ্ট শনিবার এক মজার ঘটনা হয়। স্কুলগৃহের একটি কামরায় নিজেদের আস্তানায় বসিয়া আমরা খোসগল্প করিয়া সময় কাটাইতেছি। এমন সময় মহা গণ্ডগোল শুনা গেল। বাহিরে আসিয়া দেখি বহুলোক জমা হইয়াছে, আর গেরুয়া পরা একজন সাধু চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "দেখুন, এই শালারা (অপর দুইজন সাধুকে দেখাইয়া) আমায় রাস্তায় একা পাইয়া আমার সর্ব্বস্ব লুট করিয়া লইয়াছে। আমার থালা, ঘটি, গায়ের কাপড়, টাকা পয়সা সব কাড়িয়া লইয়াছে। তারপর আমায় যা মার মারিয়াছে, কি বলিব। দেখুন, আমার সমস্ত শরীর ফুলিয়া গিয়াছে। আপনারা ইহার একটা বিচার করুন।" সাধুটি বাঙ্গালী, তাহার গায়ের রং মিশ্‌কাল। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। কাপড় চোপড় অত্যন্ত ময়লা। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে। তিনি নিজেকে তান্ত্রিক সাধু বলিয়া পরিচয় দেন। আমাদেরও তাঁহাকে দেখিয়া তাহাই মনে হইয়াছিল। অপর সাধু দুইজনের মধ্যে একজন

* গ্রামস্থ প্রমোদ-গৃহ, সেখানে গ্রামের যুবক-যুবতী মিলিত হইয়া নৃত্য-গীত মদ্যপান ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করে। অনেকের মুখে শুনিয়াছি, রংবং-এ আমোদ-প্রমোদ অনেক সময়ে শ্লীলতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। ঐ খানে যুবক-যুবতী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নব্য সংস্কারেচ্ছু ভোটিয়ারা রংবং সমাজের কলঙ্ক বলিয়া মনে করেন। তবে উহা তুলিয়া দিবার জন্য তেমন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না।

নাথসম্প্রদায়ের বলিয়া মনে হইল। তাঁহার পাঞ্জাবী শরীর। চেহারা বেশ লম্বা চওড়া, এবং বলিষ্ঠ। কাণে বড় বড় হাড়ের আংটি, চক্ষু রক্তবর্ণ, পরণে লম্বা আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ী। অপরটি নাগা সম্প্রদায়ের। তাঁহার পরণে শুধু কৌপীন, গায়ে কম্বল, মাথায় জটা পাকান, চেহারা দোহারা। নাথসম্প্রদায়ের সাধুটি আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমার কথাও আপনারা শুনুন। এই শালা খলে হইতে আমার টাকা পয়সা লইয়া গিয়াছে, আমায় কামড়াইয়া দিয়াছে এবং আমার গলার মালা ছিঁড়িয়া দিয়াছে।" আমরা ব্যাপারটা কি, প্রথম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বাঙ্গালীটি নাথ সম্প্রদায়ীকে দোষ দেন, নাথ সম্প্রদায়ী বাঙ্গালীকে দোষ দেন। অবশেষে বুঝা গেল, দুই পক্ষেই দোষ আছে, তাঁহারা সকলেই এক সঙ্গে কৈলাস দর্শনে গিয়াছিলেন। রাস্তায় এই ঝগড়া হইয়াছে। ব্যাপারটা যাহাতে আপোষে মীমাংসা হয় তাহার ব্যবস্থা করা গেল। বুদ্ধানন্দজী মধ্যস্থ হইয়া সব মিটমাট করিয়া দিলেন। সাধু কয়জন স্কুল বাড়ীতে আমাদের কামরাতেই আসন করিয়াছিলেন। দেখা গেল, স্কুল ঘরটি একটি ছোট খাটো ধর্ম্মশালা। যত যাত্রী আসে সব এইখানে আশ্রয় লয়। বৃষ্টি না থাকিলে স্কুল সাধারণতঃ বাহিরেই বসিয়া থাকে। গর্ব্বিয়াং শীতপ্রধান স্থান বলিয়া ছাত্র শিক্ষক সকলের পক্ষেই বাহিরে রোদে বসিয়া কাজ করা আরামদায়ক।

(ক্রমশঃ) বিবিদিষানন্দ

শারীরিক স্নায়ুমণ্ডলী

আমাদের প্রত্যেকের শরীর একটি অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রবিশেষ। প্রকৃতির ছোট ছোট কাজে এত বেশী কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় যে, মানুষের গড়া অতি জটিল যন্ত্রেও তাহা সম্ভবপর হয় না। আমাদের এই জগতে অস্তিত্বের সম্বল হইতেছে এই জড় শরীরটা, কিন্তু তাহার পরিপোষণের

এবং পরিচালনার জন্য যে চৈতন্যের অদ্ভুত ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে ভয়বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

মোটামুটি ভাবে আমাদের শরীরটাকে একটি ইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ইঞ্জিনকে চালাইবার জন্য যেমন জল, কয়লার দরকার, শরীরটাকে চালাইবার জন্যও সেইরূপ আবার খাদ্যদ্রব্য, পানীয় প্রভৃতির দরকার। তাহার পর যেমন ইঞ্জিনের যন্ত্রের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কলকব্জার ভিতর দিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়া উহার শক্তি ছোট বড় অনেক রকম কাজ করে, আমাদের শরীরও তেমনি আভ্যন্তরিক নানা রকম যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নানা কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। যেমন ইঞ্জিন চালায় মানুষে, একদিকে কল্ টিপে আর একদিকে ইঞ্জিনের কাজ হয়, তেমনি আমাদের শারীরিক এবং মানসিক কাজ কর্ম্মের পরিচালক আমাদের শরীরের মধ্যেই অবস্থিত স্নায়ুমণ্ডলী। এই স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন, উদ্দেশ্য এবং উহার কর্ম্মপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, স্নায়ুমণ্ডলী দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে:—(১) কেন্দ্রীয় (Central) ; (২) পরিধীয় (Peripheral).

কেন্দ্রীয় স্নায়বিক পদার্থ, মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডাভ্যন্তরস্থ স্নায়ুদণ্ড দ্বারা গঠিত। মস্তিষ্ক অনেকটা গোলাকৃতি এবং শক্ত শিরাস্থিপিঞ্জরের মধ্যে সুরক্ষিত। ইহার অনেক ভাগ আছে, তাহার বিশদ আলোচনা খুব জটিল, তবে মোটামুটি ভাবে কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে চারি ভাগে ইহাকে ভাগ করা যাইতে পারে:—

(১) পরিচালক অংশ (motor area)। এই অংশের কাজ হইতেছে শরীরের যে কোন জায়গায় ইচ্ছাধীন নড়ন-চড়নের (voluntary movements) জন্য যে স্নায়বিক অনুপ্রেরণার (nervous impulse) প্রয়োজন হয় তাহা সৃজন করা।

(২) বোধাত্মক অংশ (sensory area)। এই ভাগের কাজ হইতেছে শরীরের ত্বকের উপর যে সব বোধ আমাদের আছে, সে সব অনুভব করা।

(৩) মানসিক অংশ (psychical area, silent area)। এই অংশে স্মৃতি, বুদ্ধি, বিচার-ক্ষমতা প্রভৃতির কাজ হয়।

(৪) এ ছাড়া মস্তিষ্কে আরও অনেক ছোট বড় ভাগ আছে এবং তাহা ঘ্রাণ, দর্শন, শারীরিক সামঞ্জস্য-রক্ষণ (equilibration) প্রভৃতির উপরে অধিষ্ঠান করে।

মেরুদণ্ডের ভিতরে যে স্নায়ুদণ্ড আছে তাহার বেশীর ভাগই স্নায়ু (nerve) দ্বারা পরিপূর্ণ; এই স্নায়ুগুলি টেলিগ্রাফের তারের মত মস্তিষ্ক হইতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে আজ্ঞা কিংবা ঐ সব অংশ হইতে মস্তিষ্কে বার্ত্তা বহন করে।

এই সব কেন্দ্র হইতে স্নায়ুগুলি শরীরের পরিধিতে চলিয়া যায় এবং বিশেষ কয়েকটি স্নায়ু (nerves of special sense) ছাড়া তিন রকম স্থানে শেষ হয় :—

(ক) মাংস-পেশীতে (muscles)

(খ) গ্লাণ্ডসমূহে (glands)

(গ) ত্বকের উপরে (cutaneous filaments)। এইখানে তাহাদের কাজ হইতেছে :—

(ক) মাংসপেশীসমূহ আকুঞ্চন ও প্রসারণ করা (contraction and relaxation of muscles)

(খ) গ্লাণ্ড (gland) সমূহ দ্বারা রস ঢালা (secretion of glands)

(গ) চর্ম্ম হইতে নানা রকম বোধ মস্তিষ্কে বহন করা।

মোটামুটি সব কাজগুলিই স্নায়ুমণ্ডলীর পরিচালনার অধীনে, কিন্তু সবগুলি মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। যেমন একজন পিচ্ছিল রাস্তা দিয়া চলিবার সময় হঠাৎ পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেল। এই একটুখানি সময়ের মধ্যে সে যে কত রকম করিয়া হাত পা সঞ্চালিত করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখা দূরে থাক, সে নিজেই অবাক হইয়া যায় যে, কি করিয়া সে বাঁচিয়া গেল। এই রকম চিন্তার বা বুদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়া যে স্নায়বিক কাজ আপনা হইতেই হয় তাহাকে বলে প্রাতিবিম্ব আচরণ (reflex action)

আবার কতকগুলি কাজ আছে যেগুলির অস্তিত্ব-বিষয়ে আমরা কিছুই খেয়াল করিতে পারি না—যেমন পরিপাক-কার্য্য, রক্ত-সঞ্চালন ইত্যাদি। এই সমস্তের ভারও স্নায়ুমণ্ডলীর এক বিশেষ অংশের উপর ন্যস্ত—তাহাকে স্বাধীন কার্য্যকারী ভাগ বলা হয় (autonomic system)। এই ভাগের আবার কার্য্যকারিতায় দুইটি পরস্পর বিরোধী জিনিষ আছে, একটি—sympathetic (সহানুভূতিমূলক) আর একটি—parasympathetic (অ-সহানুভূতিমূলক)। একটি আর একটিকে নিয়মিত করিতেই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত; এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নেই। ইহাদের অধীনেই আমাদের হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ (lungs) প্রভৃতি কাজ করে।

এই স্নায়ুমণ্ডলী, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক, যাহার যত বেশী বর্দ্ধিত জগতে সে তত চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান্ হয়। কিন্তু সর্ব্বদিকে উন্নত কাহাকেও বড় দেখিতে পাওয়া যায় না;—ইহার একটি হাস্যাত্মক দৃষ্টান্ত বাস্তব জীবন হইতে দেখাইতেছি। একটি গণিত বিভাগের এম্, এ ক্লাসের ছাত্রের সহিত সম্প্রতি আর একটি সেকালের বি, এ পাশ করা সংস্কৃত পণ্ডিত দিগ্‌গজের ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ হয়। পণ্ডিত চূড়ামণিটি বলেন যে, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য ঘুরিয়া বেড়ান, আর ষড়ঋতুর পরিবর্ত্তন নাকি ভগবানের একটা খেয়াল, পৃথিবীটি এক জায়গায়ই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই ছেলেটি আজকালকার বিজ্ঞান-সম্মত বোধগম্য দুই একটি যুক্তির অবতারণা করিতেই পণ্ডিতজী বলিয়া বসিলেন, "এই জগৎ টগৎ সম্বন্ধে তোমরা কি জান? যদি কেউ জানে ত মহাপুরুষ টহাপুরুষ।" ছেলেটি পাণ্ডিত্যের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়াই সরিয়া পড়িল। পণ্ডিতজীর মস্তিষ্কের মানসিক অংশে (Psychical area) কিছু গণ্ডগোল আছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীদুর্গাদাস মিত্র, বি-এস্ সি, এম্, বি

আত্ম-মঙ্গল

চলি চলি চলি
উদ্ধত বিদ্রূপ-হাস্যে নিয়তিরে পায় পায় দলি !
ভাগ্যলিপি ফাড়ি ফেলি শতখণ্ড উড়াই বাতাসে,
বিধান নিষেধ বিধি বিঁধে যাই অট্ট পরিহাসে,
বুকে ঝঞ্ঝা চোখে বজ্র প্রভাতের রক্তকেতু রথে
বাহিরাই পথে।

বাহিরাই, বাহিরাই পথে
পরিচয় নাহি রাখি দিনক্ষণ নক্ষত্রের সাথে ;
ঊর্দ্ধে আছে সীমাহীন প্রসারিত রবিচন্দ্রলোক
আছে গ্রহ উপগ্রহ তাহাদের সেথা দ্বন্দ্ব হোক্ !
মর্ত্ত্যের দুলাল
মৃত্যু নিত্য ফিরে সাথে, তারে কেন স্বর্গের জঞ্জাল ?

পথে পথে পথে
পুঞ্জিত হইয়া ওঠে বিঘ্নবাধা প্রত্যহের সাথে ;
শঙ্কা-সংশয়ের আঁধি দৃষ্টিমুখে যবনিকা টানে,
বন্ধুর সতর্ক বাণী দূর হতে পশে আসি কানে
তবু চলে রথ
লক্ষ্য কোথা নাহি জানে—আছে গতি আছে তার পথ।

চলি চলি চলি
ভেদি যাই সূর্য্যসম জীবনের শঙ্কার কুহেলি ;
ঝঞ্ঝা সম উড়াইয়া পথপ্রান্তে শুষ্কপর্ণ বাধা,
বহ্নিসম দগধিয়া সংশয়ের ঘনায়িত আঁধা
তূর্ণগতি রথে
সম্মুখে চাহিয়া শুধু কার্ম্মুক টঙ্কারি দুই হাতে।

সম্মুখে চাহিয়া চলি—পশ্চাতের রাখিনা বন্ধন
শুনিনা কে করিছে ক্রন্দন ;
শুনিনা কে তারস্বরে অনিবার ভাগ্যেরে বাখানে,
বিরাট্ মানবে ঘেরি অদৃষ্টের তন্তুজাল বোনে,
আপনারে লুপ্ত করি প্রার্থনা পূজায় যজ্ঞ যাগে
পঙ্গু ভিখারীর মত দেবতার অনুরাগ মাগে,
সংসারের পথতটে বসি
আত্মহারা নিরুপায় হতাশায় ফিরিছে নিঃশ্বসি !

ভাগ্যলেখা লেখা থাক্ ! পড়িবার নাহি অবসর !
সম্মুখে গরজে নিত্য শাশ্বত এ জীবন সমর ;
শোক দুঃখ দৈন্যজ্বালা মৃত্যুভয় কামনা সংশয়
তার মাঝে ছুটিয়াছি আপন বাহুর গাহি জয় !
অনন্ত সমরে মাতি নিজবাহু-জয়মন্ত্র জপি,
আপনার হাতে লিখি ভাগ্যপটে নিজ ভাগ্যলিপি !
আপন বাহুর গাহি জয়
উল্কা সম ছুটে চলি নাহি দ্বিধা নাহিক সংশয়,
আঘাত—আঘাত আসে পড়ি ভূমে রক্তার্চ্চিত তনু,
আবার দাঁড়াই উঠি দুই করে তুলিধরি ধনু
অনন্ত সংগ্রাম
ক্লান্তি শ্রান্তি নাহি বোধ স্বস্তি নাহি না মানি বিশ্রাম !

'আমি আছি'—আছি আছি আমি—
মুক্তিমন্ত্র লভিয়াছি সেই মন্ত্র জপি দিনযামী !
আপনারে দেখিয়াছি প্রতিদিন আপনার চোখে,
আপনারে লভিয়াছি প্রতিদিন আপনার বুকে,

আপনার গতি

আমারে দেখায় পথ—সেই পথে ছুটিয়াছি রথী !
আপনার বেগে চলি, যুঝে যাই আপনার বলে,
আপনার বীরবাহু তলে
আপন আশ্রয় খুঁজি—কে কোথায় আছে নাহি জানি,
'আমি আছি' 'আমি আছি' নিত্যকাল এই সত্য মানি !

চলি চলি চলি,
সহসা ঘনায়ে আসে মরণের তিমির গোধূলি
নয়ন-সম্মুখে মম ; শিথিল হইয়া আসে মুঠি,
হাত হতে খুলি
ধূলিতলে সর্ব্বশস্ত্র বর্ম্ম চর্ম্ম পড়ি যায় লুটি ।
নিমেষ-মাত্রের অবসর—
আবার উঠিয়া ছুটি যাত্রাপথে অক্ষয় অমর ;
কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝা নিবিড় নিদাঘ নিশামাঝে
নিঃশেষিয়া আপনারে বৈশাখের রুক্ষরক্ত সাঁঝে
আবার গরজি ওঠে ; দিনান্তের শ্রান্ত দিবাকর
প্রভাত কুহেলি ভেদি দীপ্তকর বর্ষে খরতর ।

প্রভাতের সূর্য্যপানে চাহি
তূর্য্যনাদে নিত্যকাল আপনার জয়মন্ত্র গাহি,
আপনার হাতে বাঁধি জয়পত্র আপনার শিরে
জগতের মুক্ত সিংহদ্বারে
কার্ম্মুক টঙ্কারি ঘন আপন উল্লাসে পথে চলি,
নিজভাগ্য গড়ি হাতে, নিয়তিরে পায় পায় দলি !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

বিজয়ী বিবেকানন্দ

সংস্কারের কথা বলিতে গিয়া বীর বিবেকানন্দের কথা বলিতে হয়। বিবেকানন্দ যদি চিকাগো ধর্ম্ম-সভায় ভারতীয় সভ্যতার জয়-ঘোষণা করিতে না পারিতেন, তবে সংস্কারের নামে যে ঘর ভাঙ্গার প্রবাহ বহিয়াছিল, তাহাতে দেশের অবস্থাটা যে কিরূপ বিকৃত হইত, তাহা ভাবিতেও শরীর ও মন শিহরিয়া উঠে। এখন যেমন মোগল-পাঠানের বংশ প্রায় লোপ পাইলেও কছিমদ্দিন, মফিউদ্দিনে দেশ ভরিয়া আছে, তেমনি আজ ইনক্রু, পিনক্রুতে দেশের সত্যকার অধিবাসী কাহারা, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য হইত।

স্বামিজীর আবির্ভাবের কালে ভারতের অবস্থা ছিল তম-সাত্বিক, আর ইউরোপের ছিল তমো-রাজসিক। দুইটাই পাতিত্যের কারণ। ভারত উহাতে মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল, আর পশ্চিম দর্পান্ধ হইয়া তাহার অভ্যুদয়কেই সভ্যতার চরম বিকাশ বলিয়া ভাবিয়াছিল। বীর বিবেকানন্দ ব্যতীত কে আর গর্ব্বিত ইউরোপকে বলিতে পারিত—হে ভ্রান্ত! তুমি ধ্বংসের পথে ছুটিয়াছ।

ইউরোপ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন—একান্ত ভোগসুখপরায়ণ। তাহার চিন্তাও এই জড়বুদ্ধির অনুকূল—জড়পরায়ণ। ইউরোপ ইহলৌকিক ব্যাপারে সমৃদ্ধিশালী হইয়া তাহার সভ্যতাকেই পরম সত্য ভাবিয়াছিল। স্বামিজী পশ্চিমের চিন্তায় কোথায় ভুল তাহা বিশ্লেষণের ছুরিকায় চিরিয়া চিরিয়া দেখাইয়া দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে-ভোগপরায়ণতাকে পরম প্রাপ্তি বলিয়া ভাবিতেছে, তাহাই তাহাদের প্রজ্জ্বলন্ত অশান্তিতে নিক্ষেপ করিতেছে। ইউরোপে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হইল না। দুর্জ্জয় বৈষম্যে পশ্চিম জরজর।

স্থিতির একটা ধর্ম্ম আছে, উহাকে অঙ্গীকার না করা—ধ্বংসকেই বরণ করা। পশ্চিমের জড় সভ্যতা স্থিতির অমৃত কোথায় তাহার অনুসন্ধান

করে নাই। জীবন-সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে ভোগ দিয়া। কিন্তু ভোগ যে হলাহল স্বামিজীই জড়পরায়ণ পশ্চিমকে তাহা শুনাইলেন।

জড়পরায়ণতাই পশ্চিমের প্রকাণ্ড ভ্রান্তি। তাহারা সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কত গবেষণা করিল, কতবার রাষ্ট্র-নীতির পরিবর্ত্তন করিয়া রাষ্ট্র-বিপ্লব দমন করিতে চাহিল, জড়বিজ্ঞানের সহায়তায় ইহলৌকিক সুখের সবটুকু অধিকার করিল; কিন্তু ইউরোপে যে অশান্তির বহ্নি প্রধূমিত হইয়াছিল, তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব হইতে সেই একই দহন পশ্চিমের অন্তরকে জর্জ্জরিত করিতেছে, তবু তাহার স্পর্দ্ধা অবনমিত হয় নাই।

'ধর্ম্মের দ্বারা কি উপকার হইতে পারে?'—পশ্চিমের এই সন্দেহ। স্বামিজী এই ভাবে এই প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন " * * * মনে করুন, আপনি একটি জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। একটি শিশু দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহাতে কি মিঠাই পাওয়া যায়। আপনি উত্তর করিলেন, না মিঠাই পাওয়া যায় না। তখন শিশুটি বলিয়া উঠিল, তবে ইহা কোন কাজের নয়।" শিশুরা তাহাদের নিজের দৃষ্টি হইতে অর্থাৎ কোন্ জিনিষে কত মিঠাই পাওয়া যায়, এই হিসাবে সমগ্র জগতের বিচার করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া শিশুসদৃশ, জগতের সেই সব শিশুদের বিচারও তদ্রূপ।

যে ইউরোপ কেবল বহির্জগতে নয়—চিন্তাজগতেও আজ 'গুরুগিরি' করিতেছে, তাহাদের চিন্তাকে শিশু-চিন্তা বলিয়া প্রতিপন্ন করা সহজ শক্তিমত্তার পরিচায়ক নহে। আর এইজন্যই স্বামিজীকে বীর বিবেকানন্দ বলিতেছি।

সত্যকার পরাজয় ঘটে—ভিতরে মনোরাজ্যে। পাশ্চাত্যের চিন্তা-প্রণালীকে জয় করিতে না পারিলে স্বামিজীর জীবনব্রত অসম্পূর্ণ থাকিত। কোনও যুদ্ধকুশল সেনাপতি যদি বিপুল সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইউরোপকে জয় করিত, তবে তাহাও ফলদায়ী হইত না। সমর-পরাজিত পশ্চিম আমাদের মনের উপর আধিপত্য করিয়া প্রকৃত পক্ষে আমাদের পরাজিতই রাখিত। তাই প্রতিকারের জন্য স্বামিজীকে ইউরোপে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে হইয়াছিল।

স্বামিজীর ইউরোপীয় প্রচার—ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রচার নহে, উহা যুদ্ধ ; ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় প্রজ্ঞানের সম্মুখ-সমর। এ সমর আরম্ভ না হইলে ভারতের অস্তিত্ব-বিলুপ্তি ঘটিত। কিন্তু ভারতের ভগবান্ যে স্বীকৃতি দিয়া রাখিয়াছেন, ভারতকে রক্ষা করিবেন। তাই বিবেকানন্দের আবির্ভাব সম্ভব হইল।

"তোমরা—হে ইউরোপীয়েরা! নিজেদের যত বড় বিবেচনা করছো, তত বড় নও"; এমনি সত্যবাক্ তিনি দম্ভী পাশ্চাত্য জাতিকে বলিয়া গিয়াছেন ; এবং ঐতিহাসিক সত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সারবত্তা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপের অবস্থা দেখিয়া বিবেকানন্দের বিজয়-সাফল্য পরিমাপ করিলে চলিবে না। মার্কিন ও ইউরোপে কতগুলি লোক বৈদান্তিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কতগুলি মন্দির-মঠ প্রতিষ্ঠা হইল, জড়বিজ্ঞানের প্রভুত্ব হ্রাস পাইল কিনা, এই ভাবে ইহার বিচারপদ্ধতি নয়। দেখিতে হইবে, ভারতের গতি পরিবর্ত্তিত হইল কি না? যে পাশ্চাত্য প্রবাহে দেশ ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার গতিরোধ হইল, কি—না হইল?

ফেরাঙ্গী ভাবে ভাবিত ভারত আবার ভারতের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরণতলে একটি ভক্তগোষ্ঠী সম্মিলিত ; কিন্তু দেশ তখনও মোহমুগ্ধ। তারপর চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় স্বামিজী ভারত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিলেন, তখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এক বাক্যে তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষা-ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে লাগিলেন। এদিকেও প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। দেশের যুবকজাতি স্বামিজীর গৈরিক পতাকাতলে সমবেত হইয়া ভারতীয় জীবন-যাপনের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দিকে দিকে সেবাধর্ম্মের প্রবাহ বহিল। পরবর্ত্তী কালে স্বদেশী যুগের ইতিহাসে ইহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। "নুন চিনির স্বদেশী" নহে, কেবল ভাব-বর্জ্জনই স্বদেশী যুগের প্রধান সাধ্য। এইখানেই স্বামী বিবেকানন্দের বিজয়-সাফল্য এবং ইহাই সত্যকার সংস্কার।

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

সৎকথা

১। অনন্তের সাধন পথ অনন্ত। জীবনও অনন্তকাল ধরে চলেছে; —এই দেহ নাশ হলেই সব ফুরিয়ে গেল না; আমরা ত সবাই সেই অনন্তধামের যাত্রী। তিনি অনন্ত। তাঁর ভাবও অনন্ত; পরা বিদ্যার ইতি নাই। এখানকার বিদ্যার সীমা আছে কিন্তু তত্ত্বপথের বিদ্যার সীমা নাই। * * অনন্তের রাজ্যের যাঁরা ঠিক রাজভক্ত প্রজা তাঁরা কি অলস জীবন নিয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারেন? তাঁরা সাধন দ্বারা ক্রমেই এগিয়ে পড়ছেন। জীবকে খুব উঁচু আদর্শ ধরে সাধন পথে এগিয়ে পড়তে হবে। আর তা না হলে যে তিমিরে সেই তিমিরে পড়ে থাক্‌তে হবে। তোমরা সব খুব উঁচু আদর্শ সাম্‌নে রেখে সংসারে চলবে, তবে তোমাদের কল্যাণ হবে। প্রকৃত ত্যাগী মহা-পুরুষদের জীবন দেখে সেই পথে চল্‌তে শিখ। আদর্শ ছেড় না। আদর্শ ছেড়ে দিলেই কোথায় বেঠক্করে ঠিকরে পড়বে। ঠাকুর বলতেন পতনের রাস্তা হচ্ছে কলম বাড়া রাস্তা (অর্থাৎ ঢালু)। তোমরা মহা তেজীয়ান—লক্ষ্মণ, মহাবীর, ভীষ্ম, বিদুর, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, বিবেকা-নন্দ, বিজয় গোস্বামী—এঁদের পবিত্র জীবন ও কর্ম্ম আলোচনা কর। আর 'সংযম' ধরে এগিয়ে যাও, তবেই বস্তু লাভ হবে।

স্বার্থত্যাগ আর সংযম অভ্যাস না করলে সংসারে ভাল করে চলা যায় না; সাধন-পথের ত কথাই নাই। ভগবানের কাছে ত্যাগীর খুব আদর। একদিন ঠাকুরের সঙ্গে রামবাবুর কাঁকুড়গাছির বাগানে আমরা অনেকে গিয়েছিলাম। ঐ বাগানের কাছে হিন্দুস্থানী সাধুদের একটি আশ্রম ছিল। সেদিন ঐ আশ্রমে একটি সাধু খাটিয়ার উপর বসেছিল। ঠাকুর তাকে দেখেই রাস্তার ধারের পগার (নালা) এক লাফে ডিঙ্গিয়ে তার কাছে গেলেন, আর তার সঙ্গে তন্ময় হয়ে কত কথা বলতে লাগলেন। এদিকে তাঁর (ঠাকুরের) আস্‌তে দেরী হচ্ছে দেখে আমরা বারংবার চেঁচিয়ে ডাকতেও তিনি শুন্‌তে পাচ্ছিলেন না। তখন আমা-

দের মনে অভিমান হলো। আমরা বুঝি তাঁর ভক্ত নই, খালি ঐ ত্যাগী সাধুটিই তাঁর ভক্ত। ঐ সাধুটি যেন কত কালের পরিচিত, এম্নি ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন। শেষে ঠাকুরের কাছে গিয়ে অনেক বলতে তবে তিনি আমাদের সঙ্গে ফিরলেন। তাই বলি, ভগবানের কাছে ত্যাগীর খুব আদর।

২। জনৈক ভক্ত—মহারাজ! কাশীতে মর্‌লে কি মুক্তি হয়?

শ্রীশ্রীলাটুমহারাজ—আমি কি—কাশীতে মরে ফিরে এসেছি যে বল্‌বো? * * * বিশ্বনাথ মালিক, তিনি ইচ্ছা কর্‌লে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাশী আর কতটুকু জায়গা, আর কটাই বা লোক—এদের বেকসুর খালাস দিতে কেন পার্‌বেন না? আমাদের রাজার কত হাজার হাজার জেলখানা আছে। তিনি কি ইচ্ছা কর্‌লে তাঁর একটা জেলের কয়েদীদের বেকসুর খালাস দিতে পারেন না?

সমালোচনা

The Ramkrishna Math and Mission Convention, 1926.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন ১৯২৬ সালের ১লা এপ্রেল হইতে আরম্ভ হইয়া দুই সপ্তাহকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ভারতের এবং ভারতের বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বন্ধুগণের মঠ-মিশনের আদর্শ, স্থায়িত্ব ও প্রসারকল্পে সারগর্ভ আলোচনার সহিত শতাধিক আশ্রমের বিবরণী ইহাতে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

মহাসম্মেলনের সভাপতি স্বামী শিবানন্দের, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতা এবং উপদেশাবলীও ইহাতে উদ্ধৃত আছে। অনেকগুলি আশ্রমের ছবি ইহার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য দুই টাকা।

সন্ধ্যায়—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বিরচিত। এই পুস্তিকাখানি ভক্ত-হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে দোলায়িত চিন্তা-সাগর। ইহার সীমার দিকে ভক্ত এবং অসীমের দিকে ভগবান্—মধ্যে ভাব-সমুদ্র।

জীবন-লক্ষ্য—শ্রীমৎ বিশ্বরঞ্জন ব্রহ্মচারী-প্রণীত, মূল্য এক টাকা, প্রকাশক—শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সাধন-সমর-কার্য্যালয়, পোঃ বরাহনগর, কলিকাতা। হিন্দুর এই মহা দুর্দ্দিনে লেখক তাঁহার লক্ষ্যাদর্শ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সাধনার পথে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী-প্রণীত, মূল্য—আট আনা, প্রকাশক—শ্রীযুক্ত যতিরাজ ব্রহ্মচারী, কাবুমাটায়। প্রাপ্তিস্থান —সাধন-সমর-আফিস, বরাহনগর। লেখা অন্তরঙ্গ সাধন-সম্বন্ধে। দুই এক জায়গায় বিরোধী ভাব আছে।

কর্ম্ম-পদ্ধতি ও স্বাধীন জীবন—নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত কর্ম্ম করিতে করিতে কিরূপে আসক্তি-শূন্য হওয়া যায় এবং অনাসক্ত হইলে কিরূপে শ্রীভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস লাভ করিয়া প্রকৃত শান্তির অধিকারী হইতে পারা যায় তাহাই গ্রন্থকার বিশদভাবে এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও আলোচিত হইয়াছে:—(১) সমাজ (২) ধর্ম্ম (৩) আদর্শ-শিক্ষা (৪) আদর্শ-জীবন (৫) মানবের জীবন-সংগ্রাম ও তাহার উদ্দেশ্য (৬) দয়া ও মনুষ্যত্বের বিকাশ।

গ্রন্থকার, নিষ্কাম কর্ম্মকে জ্ঞান-লাভের পথরূপে নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক বলিতেছেন, "কর্ম্মকে ভালবাসিবে, কর্ম্ম হইতেই তোমার প্রেমাস্পদ লাভ হইবে।" আবার ব্রহ্মচর্য্যকে ধর্ম্মলাভের ভিত্তিস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ না থাকিলে কি শারীরিক, কি নৈতিক কোন বিষয়েই উন্নতি-লাভ করা যায় না। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন ভিন্ন মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব।"

এরূপ গ্রন্থের প্রচার কল্যাণজনক। কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া শান্তির অধিকারী হউন—ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

সংঘ-বার্ত্তা

পাটনা—শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার-কার্য্যে বেলুড়-মঠ হইতে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন।

পুরী—রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী

স্বামী সিদ্ধানন্দের চেষ্টায় গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পুরীধামে 'রামকৃষ্ণ-লাইব্রেরী' নামে একটি সাধারণ-পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ঐ পাঠাগারের জন্য পাঁচ শতেরও অধিক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েক-খানি মাসিকপত্রও নিয়মিত ভাবে ঐ লাইব্রেরীতে আসিয়া থাকে। স্বামী সিদ্ধানন্দ লাইব্রেরীটিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার জন্য সাধারণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের পুস্তক এক খানি করিয়া ঐ পাঠাগারে দান করিলে পাঠাগারটি অচিরে বিরাট আকার ধারণ করিবে। আমরা আশা করি, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে ও পুরীর একটি প্রকৃত অভাব দূর হইবে। পুস্তক পাঠাইবার ঠিকানা—রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, পুরী।

উড়িষ্যায় এবং গুজরাটে বন্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের সেবাকার্য্য

উড়িষ্যায় এবং গুজরাটে ভীষণ বন্যার কথা সংবাদপত্র-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় ধামনগর থানার অন্তর্গত হাঁসপট গ্রামে একটি কেন্দ্র এবং ভোগরাই থানার অন্তর্গত ডেহুরদা গ্রামে অপর একটি কেন্দ্র খুলিয়া আমরা সেবা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। এই উভয় কেন্দ্র হইতে গত সপ্তাহে মোট

প্রায় ১৮৫ মন চাউল বিতরিত হইয়াছে। সাহায্য-প্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা ৮১।

গত জুলাই মাস হইতে আমাদের বোম্বাই এবং রাজকোট শাখা আশ্রম হইতে গুজরাটের ক্যাম্বে অঞ্চলে একদল সেবক সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা ৪টি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ৯২টি গ্রামে সাহায্য করিতেছেন। চাউল বিতরণ ব্যতীত ৩৮৪০ খানি কাপড়ও বিতরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সস্তা দরে চাউল বিক্রয় করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য পাইলে গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্যেও সহায়তা করা হইবে।

আমরা সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই বরাবর সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছি এবং শ্রীভগবানের কৃপায় বরাবরই আমাদের কার্য্য সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে। আশা করি, এবারও আমাদের আবেদন বিফল হইবে না। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

(১) প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন,
বেলুড়-মঠ পোঃ, জেলা হাওড়া।

(২) ম্যানেজার, উদ্বোধন-কার্য্যালয়,
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

(স্বাঃ) শুদ্ধানন্দ
সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন।

কথাপ্রসঙ্গে

সাহিত্যের কথা

একটু ভাবিয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, মহাযুদ্ধের পর হইতে বঙ্গসাহিত্যের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হওয়াই স্বাভাবিক। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে পুরাতন নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যায়, নানা নূতন সমস্যার উদয় হইয়া নব নব পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্মবিশ্বাস সকলই সময়ের উপযোগী হইয়া একটা বিশিষ্ট আকার ধারণ করে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন নিত্য নয়। যে প্রয়োজনে তাহার উদ্ভব সে প্রয়োজন চলিয়া গেলে পবিবর্ত্তনের আর কোন আবশ্যকতাই থাকে না। তথাপি যখন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় তখন যদি সমাজ, রাষ্ট্র বা সাহিত্য সে প্রয়োজনকে গ্রহণ করিতে না পারে, তবে তাহাদের জীবনী-শক্তি চলিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং যুদ্ধের পরেও এই পরিবর্ত্তনের জের বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছে।

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের মত সর্ব্বনাশকর যুদ্ধ পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এই যুদ্ধের সহিত অল্প বিস্তর জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং যুদ্ধের ফলাফল সকল দেশকেই কিছু না কিছু স্পর্শ করিয়াছে।

যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ইউরোপ। যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই সেখানে কতকগুলি সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকের মতে যুদ্ধের অন্যতম কারণও তাহারা। কারণ না হইলেও সেই সমস্ত সমস্যা যুদ্ধের গতিকে যে

অন্যদিকে লইয়া গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান—ধনিক ও শ্রমিক-সমস্যা। যুদ্ধ হইতেছিল রাজায় রাজায়, বা রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ধনিকগণের সহিত, কিন্তু লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোক এই যুদ্ধে মরিতেছিল, তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিয়া বাঁকিয়া বসিল, মধ্য পথে যুদ্ধ থামিয়া গেল, কয়েকটি প্রধান দেশের রাজতন্ত্র একেবারে বিনষ্ট হইল। ধনিক কোণ ঠেসা হইয়া শ্রমিকের প্রাধান্য বাড়াইয়া দিল। এই যুগ ধনিকের নহে—শ্রমিকের। তাই ইউরোপের বর্ত্তমান সাহিত্য শ্রমিকের বেদনা জানাইয়া তাহার মুক্তির গান গাহিয়াছে। সাহিত্যে এই সুর আনিয়াছে প্রধানতঃ রুসিয়া। রুষিয়ার উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য শ্রমিক প্রজাকুলের অশ্রুজল-নিসিক্ত। এই সাহিত্যই তথায় বিপ্লব আনিয়াছে, সেই বিপ্লব সাহিত্যের মধ্য দিয়াই জার্ম্মানী, তুরষ্ক ও নব্য চীনে প্রবেশ করিয়াছে। এখনও ধনিক ও শ্রমিক-সমস্যা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই প্রবল। তাই এই শ্রেণীর সাহিত্যেরও যথেষ্ট প্রচার হইতেছে।

ক্যাথলিক ধর্ম্ম, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীন মতবাদকে পিষিয়া মারিয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় প্রটেস্‌টাণ্ট ধর্ম্মের উদ্ভব। সেই প্রটেস্‌টাণ্ট ধর্ম্ম বর্ত্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা স্তরে রূপান্তরিত হইয়া Rationalism, Individualism, Communism প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এত প্রবল হইয়াছে যে, নব্যতন্ত্রী, চার্চ্চকে আর মানিতে চাহে না। তাই রুশিয়ায় চার্চ্চসমূহ আজ ফ্যাক্টারী, অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং কফিখানায় পরিণত হইয়াছে। তুরষ্ক, মোসলেম ধর্ম্মকে প্রায় অস্বীকার করিয়াছে; যেটুকু স্বীকার করিয়াছে তাহা না করিলেও চলিত। এই যে ধর্ম্মের অপ্রয়োজনীয়তা,—ইহা ইউরোপীয় সাহিত্যে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে; ধর্ম্মকে সেখানে কোন আমলই দিতে চাহে না। বলে—উহা অনাবশ্যক, মানুষের উন্নতির পক্ষে ধর্ম্মের convention ক্ষতিকর। তাই এই ভাবের সাহিত্য-স্রোতে ইউরোপ আজকাল ভাসিয়া যাইতেছে।

মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে আর একটি সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে—উহা বিবাহ-সমস্যা। লক্ষ লক্ষ যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য হেতু সকলে পরিণীতা হইতে পারিতেছে না। তারপর ইউরোপে বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। সুতরাং একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করিতে পারে না। তাই সমাজ-রক্ষা হেতু বাধ্য হইয়া স্ত্রীপুরুষের মিলনে স্বাধীনতা কিছু বাড়াইয়া দিতে হইতেছে, অথবা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিবাহের সীমা ছাড়াইয়া গিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতেছে।

সাময়িক প্রয়োজন হেতু ইউরোপের অনেক মনীষী বর্ত্তমানে ইহাকে তত দোষাবহ মনে করিতেছেন না—যদিও বিভিন্ন মতের বহু লোক এইরূপ আচরণ অতি দোষাবহ মনে করেন। যাঁহারা যৌন-মিলনের স্বাধীনতা দিতে চান তাঁহারা নিজেদের মত সমাজে প্রচার করিবার জন্য সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বহু চিন্তাপূর্ণ পুস্তক এবং উপন্যাস লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। সেই সমস্ত বহি ইউরোপ প্লাবিত করিয়া পৃথিবীর বহুদেশে ভাসিয়া আসিতেছে। এই কার্য্যের পশ্চাতে প্রভূত ধন, তীক্ষ্ণ মনীষা, প্রবল কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এবং বিরাট প্রচার-শক্তি রহিয়াছে। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁহা-দিগকেও বিপক্ষের সহিত লড়িতে হইলে মনীষায়, কর্ম্ম-ক্ষমতায় ও প্রচার-শীলতায় তাঁহাদের সমকক্ষ বা অধিক শক্তিশালী হইতে হইবে। এই যুদ্ধ মস্তিষ্কের—বাহুর নহে। সুতরাং সাহিত্যের মধ্য দিয়া নানা উপায়ে, নানা চিন্তা ও আলোচনার সাহায্যে প্রবল বিপক্ষকে দমিত করিতে হইবে। রুষিয়ায় এইরূপ প্রতিক্রিয়া কিছু আরম্ভ হইয়াছিল। ঋষি টলষ্টয় ছিলেন ইহার মূলে। তিনি তাঁহার কথা-সাহিত্যে ধর্ম্ম, নীতি ও চরিত্র-মাধুর্য্যকে অপূর্ব্ব মহিমায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যৌন-মিলনের উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে কদর্য্যতায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। টলষ্টয় যে-প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এখন প্রায় নিরর্থক হইয়া গিয়াছে। কারণ তাঁহার পর আর সেই পন্থীর কোন শক্তিশালী লেখক ইউরোপে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য নব্য তন্ত্রী বা নব্য সাহিত্যিকদের ভাবের প্রবাহ এদেশেও আসিয়া লাগিয়াছে। কিন্তু এই ভাবকে গ্রহণ করা উচিত কি না—ইহাই বিবেচ্য। প্রথম দেখিতে হইবে, যে সমস্ত সমস্যা হইতে এই ভাবের উৎপত্তি তাহা এদেশেও আছে কি না? ধনিক ও শ্রমিক-সমস্যা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই রহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্যার সমাধানের জন্য পাশ্চাত্য মনীষীর মতবাদ আমরা ওজন করিয়া দেখিতে পারি। গ্রহণ করা-না-করা পরে বিবেচ্য।

Rationalismএর উদ্ভব হইতে যে চার্চ্চ-হীন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা এখানে নিরর্থক। কারণ, ধর্ম্ম বিষয়ক এত স্বাধীনতা এদেশে আছে এবং অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, সাংখ্যমত, বৌদ্ধমত, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন, গাণপত্য, চার্ব্বাকবাদ ও নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতবাদসমূহের অসংখ্য পুস্তকাবলী এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এত অধিক প্রচারিত হইয়াছে যে, ধর্ম্ম বিষয়ক কোন কথাই এখানে নূতন নহে।

তারপর যৌন-স্বাধীনতার কথা। বর্ত্তমান কালে ইউরোপে এই সমস্যা প্রবল হইয়াছে সুতরাং ইহার সুমীমাংসাও সেখানে প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের কথা? যে-সমস্যা এখানে প্রবল নহে তাহাকে কল্পনায় টানিয়া আনিয়া তাহার সমাধানে সচেষ্ট হইবার আবশ্যকতা কি? তারপর ইউরোপীয় মনীষী যাহা বলিতেছেন তাহাই কি অভ্রান্ত?—ভাবিয়া, চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। কিন্তু এদেশের তরুণ মস্তিষ্ক এত তরল যে, কোন শক্ত জিনিষ সে ভাবিতে পারে না, কোন কঠিন জিনিষের ভার বহন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। ইহা বুদ্ধিবৃত্তির দীনতা। ইউরোপে যে-সমস্যা আজ প্রবল তাহা নিত্যকালের সমস্যা নয়। পূর্ব্বে ইহা ছিল না—পরেও থাকিবে না। সুতরাং এই সমস্যা-সমাকুল সাহিত্য নিত্য কালের সাহিত্য হইতে পারে না। হয় ত এক শতাব্দী পরে যখন ইউরোপের যৌন-সমস্যার সমাধান প্রকৃতি আপনি করিয়া দিবে, তখন আর এইরূপ সাহিত্যের

কোনই স্বার্থকতা থাকিবে না। 'Uncle Tom's Cabin' বা 'নীলদর্পণ' নিত্যকালের সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না। যাহা চিরকাল মানব-মনে কোন বিশেষ রস ঢালিয়া দেয়, তাহাই নিত্য-কালের সাহিত্য—যেমন রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ', Materlinck এর 'The Blue Bird,' এবং শরচ্চন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'। এই শ্রেণীর সাহিত্য চিরকাল মানব-সমাজে আদৃত হয়। ইহা গেল নিত্য ও অনিত্য-সাহিত্যের কথা। তারপর সুরুচি কুরুচির কথা। মানব-সমাজে এক শ্রেণীর লোক নাই। বিভিন্ন স্বভাবের লোক এখানে বাস করিতেছে, তাহাদের মনোবৃত্তিও বিভিন্ন রূপের। সুতরাং বিভিন্ন মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক নিজ নিজ শিক্ষা, সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন রূপের সাহিত্য সৃষ্টি করিবে,—ইহা একেবারে বন্ধ হইবে কিরূপে? তবে যদি দেখা যায়, কতকগুলি লোক এমন কিছু বলিতেছে বা লিখিতেছে, যাহা মানব-সমাজের এবং মানব-মনের ক্রমোন্নতির পরিপন্থী, তাহা হইলে দৃঢ় হস্তে তাহা দমন করিতে হইবে। কিন্তু তাহারও জন্য তীক্ষ্ণ মনীষা, প্রবল কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এবং প্রভূত অর্থের প্রয়োজন।

স্বামী সারদানন্দজীর সহিত কথোপকথন

১৩ই জুন, ১৩২৬

ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া শাস্ত্রাদি আলোচনা মনকে শাস্ত্রীয় তথ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল। বহুকালের যত্ন-পোষিত সংস্কারাবলীর মূলে আঘাত লাগায় মানসিক চাঞ্চল্য, শান্তি ও স্থৈর্য্যকে অতিক্রম করিল। অব্যবস্থিত মন লইয়া স্বামী সারদানন্দের সমীপস্থ হইলাম।

শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—তুমি দীক্ষা নিয়েছ কি?

উত্তর—আজ্ঞে, নিয়েছি।.........আমার গুরু।

স্বামিজী—তবে তোমার প্রশ্নগুলি তোমার গুরুকে জিজ্ঞেস্ করলেই সব চেয়ে ভাল হতো। আমায় জিজ্ঞেস্ করতে চাও, কর, আমি যা জানি বল্‌ছি।

প্রশ্ন—যখন দীক্ষা নিই, ইষ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগেনি। আজকাল জাগ্‌ছে।

উত্তর—সন্দেহ তো একটা রোগবিশেষ। ওটা তো মনের normal (সহজ) অবস্থা নয়। সন্দেহ জাগ্‌লে কি আর করা যায়! ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ যা বলে গেছেন, ঠাকুর নিজে যা বলে গেছেন, সে সবে যদি তোমার বিশ্বাস না জেগে থাকে, তবে আমার কথায় কি হবে বল?

প্রশ্ন—ওঁদের কথা কত রকম ভাবে represented (বর্ণিত) হয়ে এসেছে, কে জানে!—আমি আপনার কাছ থেকে আপনার নিজের কথা জান্‌তে চাই।

উত্তর—এই যে ঠাকুরের যে সব কথা আছে সে সব কি আমরা বানিয়ে লিখেছি?

প্রশ্ন—তা না হলেও, তাঁর সন্তানগণের তাঁর প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসার ফলে হয় তো তাঁরা প্রতি ব্যাপারকেই magnify (বড়) করে দেখ্‌তেন ও দেখেন। তাঁরা হয় তো তাঁদের এই mental process (মানসিক ক্রিয়া) সম্বন্ধে conscious (অবগত) নন।

উত্তর—দেখ, আমরা তো প্রথম থেকেই কিছু ভক্ত হয়ে তাঁর কাছে যাইনি। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলাম। নাস্তিকতা, অবিশ্বাস আমাদের ভেতর পুরোমাত্রায়ই ছিল। ঠাকুরকে এক অবতার খাড়া করবার জন্যে আমরা তাঁর কাছে যাইনি। ধীরে ধীরে বাধ্য হয়ে সব মেনে নিতে হয়েছে। যখন দেখ্‌লাম, আমরা নিজেরা নিজেদের সম্বন্ধে যা জান্‌তাম, উনি আমাদের সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী জান্‌তেন, আর তাঁর কথাই সব সময়ে ঠিক হতো, তখন কি আর করি! তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য হলাম।

প্রশ্ন—ঠাকুরের ideal existence (মানসিক সত্তা) ছাড়া real exsitence (বাস্তব সত্তা) কিছু আছে কি ?

উত্তর—হ্যাঁ, আছে বই কি ? অনেকে তাঁকে দেখ্ছে, কথা কইছে।

প্রশ্ন—আপনি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি ?

উত্তর—কিছু কিছু পেয়েছি বই কি ? নইলে কি এম্নি পড়ে আছি !

প্রশ্ন—যদি ঠাকুর আছেনই, তবে স্বামিজী (বিবেকানন্দ স্বামী) ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পার্তেন না কেন ?

উত্তর—কথাবার্ত্তা কইতেন বই কি। এই যেমন আমি তোমার সঙ্গে বসে কথা কইছি, ঠিক এম্নি ভাবে কথা বলতেন, আমরা জানি। তবে ইচ্ছামাত্রে হতো না। যেমন, তুমি শাঁখারিটোলায় থাকো, আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে, ট্রামে চড়ে বা বাসে চড়ে এখানে এসে দেখা করে, তবে কইতে হবে। স্বামিজী তো আর ঠাকুরের সমান plane এ (ভূমি) ছিলেন না। কর্ম্মের মধ্যে থাক্লে মন একটু নীচে থাকে। তাই কথাবার্ত্তা কইতে হলে মনকে সংযত করে উপরের plane এ (ভূমি) নিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন—আপনারা ইচ্ছামত দর্শন পান কি ?

উত্তর—ঐ যে বল্লাম, ঠাকুরের সমান plane এ (ভূমি) তো বাস করি না যে সব সময় কথাবার্ত্তা কইতে পারবো। তুমি প্রথম থেকে ভুল ধারণা করে রেখেছো। তাইতে এতো গোল হচ্ছে। তুমি ঠাওরেছো, তাঁর সন্তানগণ সব দিনরাত তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন, আলাপ করছেন, তা তো নয়।

প্রশ্ন—যদি আপনাদের তাঁর সঙ্গে communion (কথাবার্ত্তা) থাকে তবে আপনাদের মধ্যে মতের বৈষম্য হয় কেন ? যেমন স্বামিজীর মিশন সংগঠনের সময়ে।

উত্তর—মিশন গঠনের সময়ে কেউ তো ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করে কিছু করেনি। সবই অনুমানের উপর তর্কবিতর্ক হয়েছিল। কাজেই বৈষম্য ঘটেছিল। তাঁর সন্তানগণ সবাই যে তাঁর সঙ্গে

দেখাশোনা কথাবার্ত্তা কইতে পাচ্ছে, তাই তোমায় কে বল্‌লে? বিরূপ অবস্থাতে পড়ে অনেকেই হয় তো তাঁর দেখা পাচ্ছেন না। তবে কেউ কেউ পাচ্ছেন।

প্রশ্ন—কোন active real (সক্রিয় বাস্তব) ভগবানের অস্তিত্ব আছে কি?

উত্তর—আছে বই কি।

প্রশ্ন—তাঁর সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ সম্পর্ক হয় কি?

উত্তর—তাই যদি না হবে তবে এখানে পড়ে আছি কি কর্‌তে?

প্রশ্ন—এই সম্পর্কে যে সব কথা বইয়েতে, জীবনীতে পাই, সে সব নিরন্তর ভাবনার ফলে সংস্কারাবদ্ধ অনুমানও হতে পারে।

উত্তর—তা হতে পারে। তবে ঐ অনুমানের পেছনে একটি বাস্তব সত্তাও তো আছে। যেমন ধর, তুমি একজন স্ত্রীলোককে ভালবাস। প্রথমে তুমি তার সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ কর্‌লে। ধর, তার সঙ্গে পরে তোমার বিয়ে হলো। হলে পর দেখ্‌লে, তার সম্বন্ধে ধারণা অনেক বদ্‌লে যাচ্ছে—তুমি ক্রমেই disillusioned (নির্ম্মোহ) হচ্ছ। তাকে যত গুণবতী মনে কর্‌তে, আর তত কর না। এ ক্ষেত্রে কি হোল? object (বস্তু) ঠিকই আছে। কেবল তোমার মনের অবস্থা তাকে ভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপ দেখ্‌ল। ভগবান্ সম্বন্ধে exaggerated (অতিরঞ্জিত) ধারণা হতে পারে। তবে পেছনে যা হোক্ একটা কিছু আছে। স্বামিজী একটা উপমা দিতেন। ধর, এখান থেকে সূর্য্যের একটি ফটো নিলে, আর পনের হাজার ফিট উচ্চে উঠে আরো একখানি নিলে। দুখানিতে তাফাৎ হয়ে গেল। একখানি বড়, একখানি ছোট। ফটো কিন্তু দুখানিই ঐ একই সূর্য্যের, অবস্থাভেদে তফাৎ হয়ে গেল। তেম্নি এক এক plane (ভূমি) থেকে ভগবান্‌কে এক একজন এক একরূপ দেখে।

প্রশ্ন—বিশেষ শক্তির বিকাশ ছাড়া 'অবতার-বাদের' আর কোন অর্থ আছে কি? অর্থাৎ সত্যই কেহ অবতীর্ণ হন কি?

উত্তর—অবতীর্ণ হন বই কি ! ঠাকুরকে বল্‌তে শুনেছি—যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ। অর্থাৎ একই power (শক্তি) প্রয়োজন-মত বিকাশ প্রাপ্ত হন। আবার বলেছেন, দুশো বছর পরে আবার অবতীর্ণ হবেন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ;—বল্‌তে শুনেছি। কি জান, সমস্ত জীব-জগৎই তাঁরই বিকাশ বই তো নয় ! তবে প্রয়োজনমত কোন কোন সময়ে কোন কোন স্থলে বিশেষ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ পার্শ্বে আসনোপরি উপবিষ্ট শিষ্যত্বের মর্য্যাদা-প্রার্থীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবার জন্য আচার্য্যত্বের নিরহঙ্কার দাবী লইয়া মহামুনি বলিতে লাগিলেন,—

"দেখ, সন্দেহ যখন জাগে তখন কি আর করা যায় ! এখন হয় তো আমার কথা তোমার বেশ লাগ্‌বে, বাড়ী গেলেই আবার সন্দেহ হবে। ঠাকুর বল্‌তেন, কারো কারো জন্মাবধিই বিশ্বাস হয়, আর কারো কারো জন্মাবধিই সব তাতে সন্দেহ জেগে থাকে—তার সঙ্গে আর কোন মতেই পারা যায় না। অবশ্য তুমি সেরূপ নও, বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তোমার উপর তাঁর কৃপা রয়েছে। তবে এও একটি অবস্থা মাঝে মাঝে আসে। কদিন পর দেখ্‌বে, সন্দেহ যে-ভাবে এসেছে, সেই ভাবেই আবার চলে যাবে। ধরে রাখ্‌তে ইচ্ছে করলেও কিছুতেই পারবে না। চলে যাবেই। তাঁকে ডাক, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। সন্দেহ হয় বেশ তো, 'হে ভগবান্, তুমি যদি থাক, তবে আমার এই কর'—এই ভাবে প্রার্থনা করে যাও। তাতেও উপকার হবে। দেখ, উপাসনাতে objective (বাস্তব) কিছু লাভ যদি নাও হয়, subjective (মানসিক) একটা লাভ আছে। সেটা এই—তাতে করে মন স্থূল বিষয় ছেড়ে higher planeএ (উচ্চভূমি) উঠ্‌তে চেষ্টা করে। এই হিসাব থেকেও মনের একটি gain (লাভ) আছে।"

কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন যখন গভীর রাত্রে কিছুক্ষণ ধ্যানান্তে শয্যা গ্রহণ করিয়াছি, দেখিলাম, ঠাকুরের দীপ্তিমান্ মূর্ত্তি আমার প্রতি

অগ্রসর হইয়া আমার শিরোপরি হস্ত স্থাপন করিতেছেন। ভয়ে চমকিয়া উঠাতে সেই মূর্ত্তি তিরোহিত হন। সেই সম্পর্কে কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আপনাকে একখানি চিঠি দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উহা hallucination (ভ্রান্তি) কি-না। আপনি উত্তরে লিখেছিলেন, hallucination (ভ্রান্তি) হলেও ভাল।—কেন?"

উত্তর—ভাল এই হলো যে, দেবদেবীর স্থান যদি অন্যান্য সবের উপরে হয়, তবে অন্যান্য সবের স্বপ্ন অথবা দর্শন নিশ্চয়ই দেবদেবীর দর্শন সেটা hallucination (ভ্রান্তি) হলেও—তাহা অপেক্ষা নিম্নতর। তোমার চিঠিখানি মনে পড়ছে বটে।

অপর একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম,—একে একে অবতার পুরুষগণ দ্রুত আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমি তাঁহাদের পাদস্পর্শের চেষ্টা করিলাম। প্রথম কয়েকজনের চরণ স্পর্শ সম্ভব হইল না। শংকরের চরণ স্পর্শ করিলাম। অধিকতর সহজে শ্রীচৈতন্যের চরণ স্পর্শ করিলাম। আর সর্ব্বশেষ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শের চেষ্টা করায় তিনি উপবিষ্ট হইয়া প্রণত আমার মস্তকোপরি দুই পদ স্থাপন করিলেন। এই স্বপ্ন-ব্যাপার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"এই সম্বন্ধে আপনাকে পত্রে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে আপনি লিখেছিলেন,—ঠাকুর বলিতেন 'দেবস্বপ্ন সত্য।' হাজার স্বপ্নের ভিতর দেবস্বপ্ন সত্য হবে কেন?"

উত্তর—দেখ, স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার আছে। কতকগুলি স্বপ্ন, দেখ্‌বে, ঠিক ফলে যায়, আর কতকগুলি বাজে। বাজে স্বপ্নগুলি দেখে লোকে ঠাওরায় সব স্বপ্নই বাজে। কিন্তু যেগুলি ফলে যায়, তার সম্বন্ধে কি বল্‌বে? স্বামিজী বল্‌তেন, এরূপ স্বপ্ন মনের উচ্চতর অবস্থার vision (দর্শন) ছাড়া কিছুই নয়।

জনৈক ভদ্রলোক এই সময়ে একটি সংবাদ লইয়া আসায় আলোচনায় ব্যাঘাত হয়। তিনি চলিয়া গেলে পর জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"সংসার ত্যাগ করাতে মা বাপের যদি physical (শারীরিক) কোন অনিষ্ট হয়, তাতে কোন ক্ষতি হবে কি ?"

উত্তর—তাঁদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের তো অন্ততঃ বন্দোবস্ত করতে হবে।

প্রশ্ন—তা তাদের আছে। তবে দেখ্‌বার লোকেরই যা একটু দরকার।

উত্তর—তা দেখ না। দেখ, বেরিয়ে আস্‌লেই যে হবে, তার তো কোন মানে নেই। বরং সংসারে resistance (বাধা) থাকাতে তাঁর দিকে একটা টান থাকে। বেরিয়ে আস্‌লে resistance (বাধা) না থাকাতে সে টানটুকুও চলে যায়। কার যে কিসে হয় বলা তো যায় না। আর দেখ, plan (মতলব) করে বেরুনো হয় না। যখন ব্যাকুলতা জাগে, তখন কোন consideration (ভাবনা) মনে জাগে না। ওসব নিজে নিজে ঠিক কর্‌তে হয়। কারুকে জিজ্ঞেস্‌ করে কি হয় ? যেমন কর্‌ছো, করে যাও, যদ্দিন তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব না কর। সত্যিকার টান হলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুর জন্যে ভাবতে হবে না। আর অনেকের বেরিয়ে আসার সঙ্গে selfish motive (স্বার্থপরতা), ফাঁকি দেবার ভাব ইত্যাদি থাকে। তাতে তাদের অনিষ্টই হয়। আমরা কি আর plan (মতলব) করে বেরিয়েছি ? আমাদের ধারণা ছিল, সংসারে বড় হব, টাকা রোজগার কর্‌বো ; আর সাধ্যমত লোকের উপকার করা—এ ভাবও একটু আধটু ছিল। কিন্তু সব উল্‌টে পাল্‌টে গেল। এ কি আমরা plan (মতলব) করে করেছি ? কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না। টান এলে আর কিছুই ধরে রাখ্‌তে পারে না। ঐ যে চিঠিতে লিখেছো, "ধর্ম্মকর্ম্ম আগে কত সহজ মনে কর্‌তাম, এখন আর তা করি না।"—ঐ ঠিক কথা, ঐ ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছো। তিনটে পথ আছে—বিশ্বাস করে চলা, অবিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া, আর open mind (খোলা মন) নিয়ে সত্যানুসন্ধান করা। এই শেষটাই হলো

scientific spirit (বৈজ্ঞানিক বৃত্তি)—এই ভাবেই সাধন-ভজন করে যাও। আর জেনো, atheist (নাস্তিক) হওয়া সহজ নয়। ঠিক ঠিক atheist (নাস্তিক) হতে মনের খুব জোর দরকার।

মহারাজের শরীর ভাল নয়। কাজেই তাঁহাকে অধিকক্ষণ কষ্ট দেওয়া অনুচিত একথা বার বার মনে জাগিতেছিল। তাই এই বারে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—

"আশীর্ব্বাদ করুন, আমার এসব সন্দেহের ভাব যেন কেটে যায়।"

"হ্যাঁ বাবা, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি তোমার ওসব ভাব কেটে গিয়ে মন নির্ম্মল হয়ে যাক্। আস্‌বে? তবে এস। কোন ভাবনা করো না। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"মহারাজ, বহুদিন থেকে ঠাকুরকে জীবনের আদর্শ ধরে আস্‌ছি, আজ এই সব সন্দেহ জাগাতে মনে বড় কষ্ট হচ্ছে।"

"তা তো হবেই। তা কেটে যাবে, ঠিক কেটে যাবে। একমনে ডাক। সর্ব্বদা নিজের সম্বন্ধে বিচার করবে। যে যত জপতপ প্রার্থনা করবে সে ততই পাবে,—না করলে কে পায়? সর্ব্বদা বিচার করবে তা হলে কি রকম progress (উন্নতি) হচ্ছে-না-হচ্ছে নিজেই বুঝ্‌তে পারবে। তোমার গুরু তোমায় একটা কিছু দিয়েছেন তো—সেটা ধরে চলে যাও। করলেই তার ফল বুঝ্‌তে পারবে। এস, তবে এস। তোমার কল্যাণ হোক।"

শ্রী—

অযাচিত বন্ধু

আমি কি চাহিয়াছিনু ভুলিতে তোমায় ?
স্মরণের স্বর্ণ-পটে রত্ন-তুলিকায়—
আঁকা সে আলেখ্যখানি, ক্রমে বিমলিন
ভ্রান্তির তিমির-তলে হতেছিল লীন,
করিনি ভ্রূক্ষেপ তাহে, দিই নাই মন,
অযতনে হারাইতে দুষ্প্রাপ্য রতন,
চেয়েছিনু ভাগ্যহত। হেরি ক্ষুব্ধ চিতে,
কে তুমি আসিয়াছিলে ? কি কথা বলিতে ?
নিশার তমিস্রা মাঝে, নিদ্রাতুর তার
বিহ্বল নয়ন-পথে, পথিক আমার !
তোমার অনন্ত স্নেহ, অহেতু করুণা,
পূত প্রীতি-উচ্ছ্বসিত চরিত-বরুণা,
একদিন লভি যার স্নিগ্ধ সুধাধারা
পেয়েছিল পুনর্জন্ম কোন শান্তিহারা।
অমিয় বরষি দিঠি, স্নেহ সকরুণ,
গলিত নয়ন-পথে আশার অরুণ
কিরণে লাগায়েছিলে যেই প্রাণহীন
স্পন্দহীন দেহ মনে চৈতন্য নবীন।
পাসরিতে সে কাহিনী লাজ নাই যার,
তার কাছে কি উদ্দেশ্য দেবতা আমার ?
সেই দিব্য দেবমূর্তি, দীপ্তি সমুজ্জ্বল !
উদাস গভীর দৃষ্টি কল্যাণ-কোমল,
উদ্ভিন্ন অধরপুট নীরব ভাষায়,
কি কহি, চেতনা দিল মুমূর্ষু আশায়,
সঞ্জীবিল নব শক্তি, নবীন উৎসাহ
জড়ীভূত মনে, একি বহ্নি দাবদাহ ?
অবিশ্বাসী হৃদয়েরে করি তিরস্কার,
কোথা তুমি লুকাইলে, দয়িত আমার ?

ভেঙ্গে গেল সুখ স্বপ্ন আলোক উজ্জ্বল,
তন্দ্রা-নিমীলিত আঁখি আকুল চঞ্চল,
চেয়ে দেখে পূর্ব্বাকাশ উদয়-তোরণে
সমুদিত বালসূর্য্য, গলিত হিরণে
ভূষিতা কনক-উষা আজি ম্লান ভায়,
আমার নয়নে কেন ও-অঙ্গ প্রভায়,
প্রভাবতী রাত্রি ছিল এ হতে সুন্দরী,
আজি এ ধারণা কেন নিত্য ভাব দূরি,
জাগে মনে অপ্রমেয় প্রভাবে কাহার,
বহু বর্ষ ব্যবধানে হে বন্ধু আমার!—
জাগ্রতে যে আশা নভঃ-কুসুম-কল্পনা,
সুপ্তি তারে মূর্ত্তি দিল।—কৃতিত্ব আল্পনা,
সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, না চাহি নির্ণয়,
আশার অতীত এযে ইহা তো নিশ্চয়!
দিব্য দীপ্তিময় রূপে দিগন্ত উজলি,
হানি বজ্র, লুকাইল জলদে বিজলী,
ক্ষণে ক্ষণপ্রভা হায় হলো অন্তর্দ্ধান,
বেদনা-বিমূঢ় চিত স্তম্ভিত পরাণ;
নিভেছে অনল, দাহ জুড়ায়নি তার
জাগে হেন অনুভূতি হে বন্ধু আমার!
তবে তুমি ভোল নাই! রাখিয়াছ মনে,
কি বলিতে চেয়েছিলে ভাবিব কেমনে?
চির অপরাধী জনে, স্পর্দ্ধা এ অসহ,
ইহারি বিহনে, কিন্তু ভার দুরবহ
জীবনের, জান তাহা? কি কহিলে স্বামী?
তোমারো প্রেমের পাত্রী, আমি? এই—আমি!
তুচ্ছ—ক্ষুদ্র—চির ত্রুটি-ভ্রান্তি-সমাকুল,
এই প্রেম, এই আশা, পিপাসা বিপুল,

বাসনা-বারিধি বক্ষে তুলিছে জোয়ার
বহু বর্ষ ব্যবধানে হে বন্ধু, আমার !
বড় দুঃখে ওগো বন্ধু ! বড় বেদনায়
যে জন চাহিয়াছিল ভুলিতে তোমায়,
স্বেচ্ছায়, স্ববশে অধঃ অতল গহ্বরে
দ্রুত যে ডুবিছে হায় কেন তার তরে
এতো অনুকম্পা তব ? ওগো রাজরাজ !
দুরদৃষ্ট যেই প্রার্থী, অসমর্থ আজ
আনিতে প্রার্থনা তব অবারিত দ্বারে,
তুমি দায়ী ছিলে না তো রক্ষিতে তাহারে ;
নিজ পাপে আত্মঘাতী লভিছে নিরয়,
কেন তুমি আস তারে শোনাতে অভয় ?
কে রাখে মর্য্যাদা তব, কে করে সম্মান ?
অনাদৃত বারে বারে সহি অপমান
ফিরে যাও, কেন তবু করুণা অপার
সঞ্চিত তাহারি তরে বাঞ্ছিত আমার ?
দুলে মন নিদারুণ সংশয়-হিন্দোলে,
সান্ত্বনা করিব বন্ধু ! তাহারে কি বলে ?
এ কর্ম্ম কর্ত্তব্যে আমি বিধি-নিয়োজিত
নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ একান্ত পীড়িত
রহিব যেমন আছি ? কিংবা সর্ব্বনাশা
তোমার প্রবল প্রেম, বালুময় বাসা-
সম এ সংসার টুটে প্লাবনে যাহার—
প্রার্থনা করিব তারে, প্রার্থিত আমার।

শ্রীমতী নীহারিকা দেবী

ইউরোপে চার্চ্চিয়ানিটী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চার্চ্চিয়ানিটীর পরিণাম

বিজয়ী এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি পোপ ও যাজকমণ্ডলীর লক্ষ্য, আধ্যাত্মিক জীবন হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া পার্থিব জীবনের দিকে অত্যধিক পরিমাণে ঝুঁকিয়া পড়িল। ভগবৎ-করুণা-রস-অমৃতের যে-বিমল আনন্দ তাহা উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর রস-সৌন্দর্য্য-আহরণে তাঁহারা লালায়িত হইলেন। যাজকগণের ভোগ-লিপ্সা হারমিট্‌গণকেও গিয়া স্পর্শ করিল। যিশুর উপদেশমত চিরপবিত্র জীবন যাপন প্রণালী ক্রমশঃ বিস্মৃত হইয়া চার্চ্চকেই তাঁহারা সর্ব্বস্ব রূপে গ্রহণ করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ চার্চ্চের বা চার্চ্চিয়ানিটীর প্রভুত্ব, সংরক্ষণ ও বিস্তার তথা পোপ, আর্চ্চ-বিশপ, যাজক ও হারমিট্‌গণের ক্ষমতা খৃষ্টান-সমাজের উপর চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখাই তখন তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও প্রতিষ্ঠা সেই সময় এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল যে, বড় বড় জমিদার ও সামন্তরাজপুত্রগণ শুধু ভোগ করিবার জন্যই যাজকমণ্ডলী ভুক্ত হইতেন। তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা অনায়াসেই স্বল্পকাল মধ্যে আর্চ্চ-বিশপ এবং মঠাধ্যক্ষপদে তাঁহাদিগকে উন্নীত করিত। অবশ্য, যাজকমণ্ডলী ও হারমিট্‌গণের মধ্যে বিবাহ চিরকালই নিষিদ্ধ ছিল। বিবাহই নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু যে-পবিত্র জীবন যাপন উদ্দেশ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল সেই উচ্চাদর্শ তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন। খৃষ্টান-সমাজের পুরুষগণ ধর্ম্মজীবন যাপনের জন্য যেমন যাজকমণ্ডলী বা হারমিট্‌শ্রেণীভুক্ত হইতেন, নারীগণও সেইরূপ ঐ একই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিতেন। তাঁহারাও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন না। এই সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণা স্ত্রীলোকগণ 'নানারী'

(Nunnery) বা স্ত্রীমঠে থাকিতেন। 'নানারী'ও বিশপ এবং আর্চ্চ-বিশপগণের অধীনে পরিচালিত হইত। অবশ্য স্ত্রীমঠাধ্যক্ষগণই 'নানারী' পরিচালনা করিতেন তবে পোপের নির্দ্দেশমত তাঁহারা চলিতেন। প্রথমে উচ্চবংশীয়া উন্নতহৃদয়া মহিলাগণই ভগবৎ-সেবার ব্যাকুলতায় এই সমস্ত 'নানারী'তে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবনের যশঃপ্রভা সমগ্র খৃষ্টান-সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া বহু নারী 'নানারী'তে আসিয়া যোগদান করিতে লাগিলেন। ফলে দেশের সর্ব্বত্র 'নানারী'র প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু কালপ্রবাহে ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নির্ব্বিচারে সকলকে যাজক ও হারমিট্-শ্রেণীভুক্ত করায়, পোপ হইতে আরম্ভ করিয়া একজন অতি সাধারণ যাজকও যেমন ভোগলিপ্সায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, 'নানারী'র অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল। সেই সময় সমগ্র খৃষ্টান-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর যে অনাচার-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল—তাহা বর্ণনাতীত।

যাজকমণ্ডলীর ভোগ-জীবন যেরূপ বাড়িয়া গেল, ভোগের উপকরণের জন্য তদনুযায়ী অর্থেরও তাঁহাদের আবশ্যক হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইটালীতে এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতি তাঁহারা ছিলেন; ফ্রাঙ্করাজ উহা জয় করিয়া চার্চ্চকে দিয়াছিলেন। তাহার বিপুল আয়েও যাজকমণ্ডলীর আর ব্যয়সঙ্কুলান হইত না; তাঁহারা অর্থাগমের নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন, মানবের অর্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হয় না। পুণ্যের বিনিময়ে স্বর্গসুখ লাভ করা যায়। যাঁহারা বহু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যত পরিমাণ পুণ্যের প্রয়োজন তদতিরিক্ত পুণ্য এক বিরাট্ ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে, তাহার চাবি পোপের নিকট আছে, উপযুক্ত মূল্যে সেই পুণ্য কিনিতে পারা যায়। চিরকাল সর্ব্বপ্রকার পাপানুষ্ঠানের পর অর্থের বিনিময়ে যদি পাপের ফল-ভোগ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে যাওয়া যায় তবে মন্দ কি? মানব-সাধারণের এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া স্বর্গের ছাড়পত্র বিক্রয় করিয়া পোপ অপরিমিত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাক্ষরিত স্বর্গের ছাড়পত্রসমূহ যাজকগণ নগরে

নগরে ও গ্রামে গ্রামে লইয়া যাইত। বাকাচ্ছটায় সকলকে আকৃষ্ট করিয়া, স্বর্গের লোভ দেখাইয়া দরিদ্রগণের আজীবনের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ অর্থও এইরূপে তাহারা অপহরণ করিত। ইউরোপীয় ইতিহাসে এই ছাড়পত্রের বিক্রয় 'Sale of Indulgences' নামে পরিচিত। পাপানুষ্ঠান করিলে নরকে ভীষণ যন্ত্রণা পাইতেহইবে—এই বিশ্বাস খৃষ্টানগণকে এতদিন পাপাচরণ হইতে কথঞ্চিৎ বিরত করিত, কিন্তু যখন হইতে অর্থের বিনিময়ে স্বর্গে যাইবার ছাড়পত্র পাওয়া যাইতে লাগিল তখন হইতে নরকের ভয় কাটিয়া যাওয়ায় খৃষ্টান-সমাজ সর্ব্ববিধ পাপে কলঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া চার্চ্চের ভিতর বিশপ, আর্চ্চ-বিশপ, যাজকমণ্ডলী, হারমিট্‌ ও নান্‌দের ব্যভিচার তো ছিলই। এইরূপে সেই যুগের খৃষ্টান-ধর্ম্মসম্প্রদায় ও খৃষ্টান-জনসমাজ অনাচারে পূর্ণ হইয়াছিল।

স্বর্গের ছাড়পত্র লাভ করিবার পূর্ব্বে খৃষ্টানগণকে বিশপ বা আর্চ্চ-বিশপের কাছে 'Confession' বা 'পাপ-স্বীকারোক্তি' করিতে হইত। পাপের গুরুত্ব বুঝিয়া তাঁহারা ছাড়পত্রের মূল্য ধার্য্য করিতেন। বড় বড় রাজা-মহারাজা বা জমীদারদের নিকট হইতে তাঁহারা সুযোগ বুঝিয়া মোটা মোটা টাকা দাবী করিতেন। না দিতে চাহিলে সকলের কাছে তাঁহাদের পাপের কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে—এইরূপ ভয় দেখান হইত, সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া যাজকমণ্ডলীর দাবী রাজা-মহারাজাদিগকে বাধ্য হইয়া পূরণ করিতে হইত। হয় তো কোন সরলা বালিকা কাহারো প্রলোভনে বা ষড়যন্ত্রে পড়িয়া বাধ্য হইয়া কোন অন্যায় আচরণ করিয়া ফেলিয়াছে, তারপর অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া পাপমুক্তির জন্য বিশপ অথবা আর্চ্চ-বিশপের শরণাপন্ন হইল। বালিকা হয় তো পাপমুক্তি-পত্রের অর্থ দিতে অক্ষম, সে তখন ধর্ম্ম-যাজকের নিকট দেহ-বিক্রয় করিয়া সেই ছাড়পত্র ক্রয় করিত।—এরূপ কার্য্যও বিরল ছিল না। অন্যের স্পর্শে পাপ হইলেও বিশপ বা আর্চ্চ-বিশপের স্পর্শে কোনরূপ পাপ হয় না—এই বিশ্বাস তখনকার দিনে খৃষ্টান-মহিলাগণের ভিতর ছিল, কারণ তাঁহারা যে ভগবানের প্রতিনিধি; এই দেহ-মন সবই ভগবানের সুতরাং তিনি বা তাঁহার প্রতিনিধি ইহাকে যথেচ্ছা ব্যবহার

করিতে পারেন তাহাতে পাপ তো হয়ই না, বরং পুণ্যই অর্জ্জিত হয়।

যাজকমণ্ডলী যে এই সমস্ত অনাচার করিতেন তাহাও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া করিতেন। ধর্ম্মের দুইটি দিক আছে—Creed এবং Ritual (তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনাঙ্গ)। যাজকগণ কতকগুলি ধর্ম্মমত ছকিয়া দিয়াছিলেন, খৃষ্টান-জনসাধারণকে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইত, তাহার নাম ছিল 'Doctrines of Faith.'। এই 'Doctrines of Faith' এর উপর বিশ্বাস করিতে বাধ্য করাই বিশপ ও আর্চ্চ-বিশপগণ স্বর্গের ছাড়পত্র দিয়া টাকা আদায় এবং Confessionএর (পাপ-স্বীকারোক্তি) সুযোগ লইয়া ব্যভিচার করিতেন। যাজকমণ্ডলী-প্রবর্ত্তিত এই সমস্ত Doctrine বিশ্বাস করিতেই হইত, কারণ তাহারা ছিল চার্চ্চিয়ানিটীর অঙ্গ। খৃষ্টানগণের ধর্ম্মজীবন যাপনের জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিধি ছিল, তাহার নাম Ritual। সর্ব্বদেশে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই কতকগুলি Creed এবং Ritual থাকে। সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সকলকেই তাহা মানিয়া চলিতে হয়; তাহা না হইলে সংহতি স্থায়ী হয় না। চার্চ্চিয়ানিটীর দৃঢ়তার জন্য চার্চ্চকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত Creed এবং Ritual সকলে মান্য করিয়া চলে কি-না যাজকমণ্ডলী তাহা অতি সাবধানতার সহিত লক্ষ্য রাখিতেন এবং যেখানেই দেখিতেন তাহার কিছুমাত্র বিচ্যুতি হইয়াছে অথবা কেহ তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছে বা করিয়াছে অমনি দৃঢ় হস্তে তাহাকে দমন করিতেন। এই অপরাধকে খৃষ্টানমণ্ডলী 'Heresy' (ধর্ম্মদ্রোহ) এবং অপরাধীকে 'Heretic' (ধর্ম্মদ্রোহী) বলিতেন। অপরাধের শাস্তিও অতি গুরুতর ছিল—জীবন্ত দগ্ধ করা। চার্চ্চ বলিত, পোপ ভগবানের প্রতিনিধি। তৎপ্রবর্ত্তিত খৃষ্টানধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য তিনিই পোপ-শরীরে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার আদেশ লংঘন বা অবিশ্বাস করা এবং সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী অগ্রাহ্য করা—একই জিনিস। ভগবানের আদেশ অমান্য করিলে অনন্ত নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। তাহার যন্ত্রণা

কিরূপ? না—ইহ-জীবনে জীবন্ত দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা উহা শত সহস্র গুণে অধিক। সেই যন্ত্রণার আংশিক নমুনা Hereticদের পূর্ব্বেই দেখা উচিত। সেইজন্য ধর্ম্মদ্রোহী বা Hereticদের পোড়াইয়া মারা হইত।

অবশ্য যাজকগণ যে এই সমস্ত অনাচার ও অত্যাচার করিতেন 'Bible' (বাইবেল) তাহা অনুমোদন করিত না। Bible পাঠ করিলে সকলেই ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিবে, তাঁহাদের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া যাইবে, চার্চ্চিয়ানিটী ভাঙ্গিয়া পড়িবে—এইজন্য চার্চ্চ হইতে জনসাধারণের Bible পাঠ নিষিদ্ধ হইল। যাজকমণ্ডলী বলিতেন,—Bible এর ধর্ম্মতত্ত্ব অতি নিগূঢ়, তাহা বুঝিবার মত মস্তিষ্ক সকলের নাই, উহা পড়িয়া ভুল বুঝিয়া অনেকের জীবনে ঘোরতর অনিষ্ট হইতে পারে, সেইজন্য উহা কেহই পড়িতে পারিবে না। যে পড়িবে সেই Heretic বা ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহারও শাস্তি হইবে জীবন্ত-অনল-দাহন। শুধু তাহাই নহে, অন্য ভাষায় Bibleএর অনুবাদও নিষিদ্ধ হইল। কেহ গোপনে Bible পড়ে কি-না, কেহ কোন ভাষায় উহার তর্জ্জমা করে কি-না, চার্চ্চিয়ানিটীর নির্দ্দিষ্ট Creed এবং Ritual ব্যতীত কেহ অন্য কিছু মতবাদ পোষণ করে কি-না, তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলে কি-না, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য চার্চ্চকর্ত্তৃক একটি 'Inquisition' বা অনুসন্ধান-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিভাগের গুপ্তচরেরা যাহাকে সন্দেহ করিত, তাহাকেই কারারুদ্ধ করা হইত। এইরূপ অনেক অপরাধী একত্র হইলে তাহাদের নামমাত্র বিচার করিয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে শত শত নরনারীর সমক্ষে তাহাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। সকলের সমক্ষে তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভয়ে এরূপ আচরণ আর কেহ যেন না করে। এই জীবন্ত-অনল-দাহন অনুষ্ঠানটির নাম ছিল—'Auto-da-fe', Act of Faith বা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

বিশপ ও আর্চ্চ-বিশপগণ চার্চ্চের আয় বৃদ্ধির জন্য স্বর্গের ছাড়পত্র বিক্রয় করিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উহা

ছাড়া তাঁহাদের অন্য স্থায়ী উপায়ও ছিল। ইউরোপের সর্ব্বত্র খৃষ্টান-সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার আয়ের দশমাংশ ভাগ চার্চ্চকে দিতে হইত। এই করের নাম ছিল 'Tythe' ('টাইথ' বা দশমাংশ)। তবে ফ্রান্সের ব্যবস্থা ছিল অন্যরূপ। তথাকার প্রজাসাধারণকে আয়ের চতুর্দ্দশ অংশ চার্চ্চের প্রতি-পালনের জন্য দিতে হইবে—এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ ছিল। ইহা হইল চার্চ্চিয়ানিটীর বাহিরের বিকৃত রূপ। ধর্ম্মের আদর্শ চার্চ্চের অভ্যন্তরে কিরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার সামান্য আলোচনা করিলেও আরো কিছু বলা প্রয়োজন। চার্চ্চ হইতে যাজকমণ্ডলীর পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল; Purity (পবিত্রতা) বা Celebacy (ব্রহ্মচর্য্য) চার্চ্চিয়ানিটীর অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত। কালপ্রবাহে যাজক-সমাজের অনেকখানি অংশ হইতে Purity বা পবিত্রতার আদর্শ একেবারে চলিয়া গিয়াছিল।

দশম শতাব্দীতে চার্চ্চের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা জনৈক সমসাময়িক ইটালিয়ান ধর্ম্মযাজকের লেখনী হইতে প্রকাশ পাইবে,—

"If he were to enforce the canons against unchaste people administering ecclesiastical rites, no one would be left in the church except the boys, and if he were to observe the canons against bastards, these also must be excluded."

মধ্যযুগের পাশ্চত্য ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন,—

"Nunneries were like brothels * * the vast multitude of infanticides within their walls."

—History of European Morals.

কেন এরূপ হইল? চার্চ্চিয়ানিটী যাজকমণ্ডলীর জন্য যে-Celebacyর নিয়ম করিয়াছিল তাহা তো অতি মহৎ, কিন্তু উহা এরূপ অনাচারে পরিণত হইল কেন? উত্তরে, William Edward Hartpole Leckyর উক্তি প্রণিধান-যোগ্য,—

"Vast Societies living in enforced celebacy, exercising an unbounded influence, and possessing enormous wealth must necessarily have become hot-beds of corruption when the enthusiasm that had created them expired."

(ক্রমশঃ) চন্দ্রেশ্বরানন্দ

সরল বেদান্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধিকারি-নির্ণয়

[পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আত্ম-সাক্ষাৎকার বা জ্ঞান-লাভের দ্বারাই আমরা আমাদের যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণা ও অশান্তি হইতে চিরকালের জন্য অব্যাহতি পাইতে পারি।]

এই জ্ঞান-লাভের অধিকারী কে? যিনি সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন তিনিই এই জ্ঞান লাভের অধিকারী। সাধন-চতুষ্টয় বলিতে নিম্নলিখিত চারিটি সাধন বুঝায়:—(১) নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক (২) ইহামুত্র-ফল-ভোগ-বিরাগ (৩) শমদমাদি-ষট্‌ক-সম্পত্তি ও (৪) মুমুক্ষুত্ব।

১। নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক—কি নিত্য, এবং কি অনিত্য তাহা বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করাই নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক। অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য, এতদ্ব্যতীত সমস্তই অনিত্য—ইহা দৃঢ়রূপে ধারণা করা।

২। ইহামুত্র-ফল-ভোগ-বিরাগ—ইহলোক এবং পরলোকের সমস্ত ভোগ্য বিষয় ভোগ করিবার প্রবল অনিচ্ছা। এই লোকের রূপরস-গন্ধাদি যে সমস্ত ভোগের বিষয় আছে তাহাতে এবং স্বর্গলোকাদিতে যে সমস্ত সুখ আছে তাহাতে কাক-বিষ্ঠার ন্যায় বিতৃষ্ণা।

৩। শমদমাদি-ষট্‌ক-সম্পত্তি—শমদমোপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধা। অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের নিগ্রহকে 'শম' বলে। বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে 'দম' বলে;—বহিরিন্দ্রিয় দশটি, যথা:—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় —(১) চক্ষু (২) কর্ণ (৩) নাসিকা (৪) জিহ্বা ও (৫) ত্বক্; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—(১) বাক্ (২) পাণি (৩) পাদ (৪) পায়ু ও (৫) উপস্থ। বিষয় হইতে মনকে নিগ্রহ করাকে 'উপরতি' বলে। চিন্তা ও বিলাপ-রহিত হইয়া অপ্রতিকার-পূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ সহন করার নামই 'তিতিক্ষা'। নিত্য বস্তুতে মন স্থির করার নামই 'সমাধান'। সৎ শাস্ত্র ও গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করার নাম 'শ্রদ্ধা'।

৪। মুমুক্ষুত্ব—মুক্তি লাভ করিবার প্রবল ইচ্ছাকে 'মুমুক্ষুত্ব' বলে।

বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্গম হইল। অঙ্কুরটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; শাখা-প্রশাখা ও ফল-পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হইল। কাল-স্রোতে সুশোভিত বৃক্ষটি রূপান্তরিত হইতে হইতে একদিন শুষ্ক কাষ্ঠ অবশিষ্ট রাখিয়া অদৃশ্য হইল।

যে বস্তু তিনকালে একই রূপ থাকে তাহাকে 'নিত্য' বলা হয়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালে যে পদার্থের অভাব বা পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাই নিত্য-পদ-বাচ্য। অতএব যে সমস্ত পদার্থ বিকারী অথবা যাহাদের কখনও ভাব এবং কখনও অভাব হয় তাহারা অনিত্য। উপরের দৃষ্টান্তে বৃক্ষটি বিকারী এবং তাহার অভাবও হইল; এই জন্য উহা অনিত্য। বিকার ছয় প্রকার, যথা:—(১) জন্ম বা উৎপত্তি (২) বিদ্যমানতা (৩) বৃদ্ধি (৪) পরিণাম-প্রাপ্তি (৫) ক্ষয় ও (৬) নাশ। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থমাত্রেই এই সকল বিকার অল্পাধিক সংখ্যায় লক্ষিত হয়; এই জন্য উহারা অনিত্য।

পরিবর্ত্তনকেই বিকার বলা হয়। পরিবর্ত্তন গতি হইতে হইয়া থাকে; অর্থাৎ যাহা গতিশীল তাহাই পরিবর্ত্তনীয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মধ্যে এমন কোনও বস্তুই পাওয়া যায় না যাহার গতি নাই। পূর্ব্বে জ্যোতির্বিদ্গণ মনে করিতেন যে, সৌরজগতে সূর্য্য স্থির থাকে, উহার গতি নাই;

গ্রহ ও উপগ্রহেরা ঐ গতিহীন সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সূর্য্যেরও গতি আছে; উহা 'ভেগা' নামক একটি নক্ষত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সৌরজগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, অন্যান্য সৌর জগৎ-সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এইজন্য সমস্ত নক্ষত্রও গতিশীল; কারণ, নক্ষত্রেরা অন্যান্য সৌরজগতে এক একটি সূর্য্য।

পদার্থসমূহের অনিত্যতা আমরা আর এক দিক দিয়া দেখিতে পাইব। দুই বা ততোধিক বস্তুর সংমিশ্রণে কোন বস্তুর উৎপত্তি হইলে, শেষোক্ত বস্তুটিকে 'যৌগিক' বস্তু বলে। যাহা যৌগিক নহে অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি বস্তুসমূহের সংমিশ্রণ-জনিত নহে তাহাকে 'মৌলিক' বলে। যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই নাশ আছে। যৌগিক বস্তুর উৎপত্তি আছে, অতএব উহা নাশশীল। যে সমস্ত বস্তুর সমবায়ে যৌগিক বস্তুর উৎপত্তি তাহারা কোন কারণে পৃথক হইলেই যৌগিক বস্তুটির ধ্বংস হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, আজ পর্য্যন্ত যত বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে উহাদের সমস্তই যৌগিক। সুতরাং উহারা সমস্তই নাশশীল, অতএব অনিত্য। তাঁহারা বলেন যে, মৌলিক পদার্থ যদি কোন কিছু থাকে তবে উহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, ইন্দ্রিয়াতীত।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক রাজ্যে বিচরণ করিতেন তাঁহাদের ধারণা ছিল যে 'দেশ' ও 'কাল' মৌলিক পদার্থ, অতএব উহারা নিত্য। তাঁহারা বলিতেন, 'দেশ' ও 'কাল' এক একটি নিরপেক্ষ সত্তা; অর্থাৎ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছে যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই সাপেক্ষিক। ইন্দ্রিয়-রাজ্যে এমন কোনও জিনিষই নাই যাহার সহিত অপর কোন জিনিষের কোন সম্বন্ধ নাই; অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষই অপর কোন না কোন জিনিষের সহিত সম্বন্ধ। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এই মতকে 'আপেক্ষিক-বাদ' বলে। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টিন এই বাদের প্রবর্ত্তক। এই মত অনুসারে 'দেশ' ও 'কাল' পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। এই মত

প্রবর্ত্তিত হইবার পর বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, 'যদিও ইন্দ্রিয় দ্বারা সাপেক্ষ ব্যতীত কোনও নিরপেক্ষ সত্তার সন্ধান পাইতেছি না, তথাপি আমরা যাবতীয় পদার্থের সাপেক্ষিকত্ব হইতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, কোন এক নিরপেক্ষ সত্তা আছে যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সাপেক্ষ পদার্থসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে সে সত্তার কি করিয়া উপলব্ধি হইতে পারে সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও নীরব। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সহযাত্রী হইয়াও আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহারা বলেন, "নিরপেক্ষ সত্তা ত আছেই এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ঐ সত্তা উপলব্ধি করিবার একমাত্র পথ।"*

বাসনা বা বিষয়ভোগের ইচ্ছা বন্ধনের কারণ। যেমন একটি বস্তুর উপর শক্তিসমূহ প্রযুক্ত হইলে, উহার গতি উৎপাদিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও বাসনারূপ শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া জন্ম-মৃত্যুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। এই বাসনা-সমূহের ধ্বংস করিতে পারিলে, জন্ম-মৃত্যু-রূপ গতিও রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহলোকের বাসনাসকলকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়:—(১) পুত্রৈষণা (২) বিত্তৈষণা ও (৩) লোকৈষণা। মান-যশ লোকৈষণার অন্তর্গত। উপরি উক্ত বাসনা তিনটিকে আবার মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা:—(১) শরীর-সুখের ইচ্ছা ও (২) মানযশের স্পৃহা। শরীর-সুখ বলিতে রূপরস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি-বিষয়ভোগ-জনিত সুখ বুঝায়। এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু অনিত্য, অতএব হেয়। জন্ম-মৃত্যু ও অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, এই ভোগ্য বস্তু-সমূহের ভোগকামনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যমরাজ যখন নচিকেতাকে এই সকল প্রলোভনের বস্তুর দ্বারা প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন নচিকেতা বলিলেন, "এই সকল ভোগ্য বিষয় অনিত্য, ইহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে নিত্য সুখ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, বিষয়ভোগে ইন্দ্রিয়সমূহ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায়। অতএব আমি এই বিষয়সকল চাহি না।

---

* Vide Kant's Critique of Pure Reason.

যাহাকে লাভ করিলে অমৃতত্ব পাওয়া যায়, আপনি তাহার বিষয় আমাকে বলুন।"

বিষয় সুখ ক্ষণিক, এবং আপাতঃ-মধুর হইলেও পরিণামে দুঃখপ্রদ। আরও একটু স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে সুখ নাই। বিষয়ের নিজের যদি কোন আনন্দ থাকিত, তবে উহা সব সময়েই আনন্দপ্রদ হইত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, উহারা সব সময়ে আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। একবার তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করিলে, তখন উত্তম ভোজ্য দ্রব্যও আনন্দদায়ী হয় না, পরন্তু নিরানন্দজনকই হইয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বিষয়ের নিজস্ব সুখ কিছুই নাই, অপর কোন বস্তুর আনন্দের আভাস উহাদিগকে আনন্দজনক বলিয়া বোধ করাইয়া দেয়। কস্তুরী মৃগ যেমন সুগন্ধের প্রকৃত উৎপত্তি-স্থান কোথায় তাহা না জানিয়া ঘাসের মধ্যে উহার অন্বেষণে বৃথা ক্লেশ পাইয়া থাকে, তদ্রূপ বিষয়কামী জীবও প্রকৃত আনন্দের খনি কোথায় তাহা না জানিয়া বিষয়ের মধ্যে উহাকে অন্বেষণ করিতে যাইয়া হাহাকারে জীবন আহুতি দিয়া থাকে। অথবা যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা, পিপসার্ত্ত পথিক ও মৃগপ্রভৃতি জন্তুসমূহকে আকৃষ্ট করিয়া উহাদিগকে বৃথা ক্লেশ দিয়া পরিশেষে উহাদের প্রাণ-নাশের কারণ হয়, সেইরূপ বিষয়সমূহ জীবগণকে আকৃষ্ট করিয়া অযথা ক্লেশ প্রদান-পূর্ব্বক উহাদিগকে প্রকৃত আনন্দ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। এইজন্য বিষয়-ভোগের কামনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শাশ্বত আনন্দ-লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকাই বিবেকী ব্যক্তির মুখ্য কর্ত্তব্য।

ইহলোকের বাসনা-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, পরলোকসমূহের বাসনা সম্বন্ধে উহাই প্রযোজ্য। উহারাও ক্ষণিক, অনিত্য ও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া দূরে পরিহর্ত্তব্য। ইহলোকের ও পরলোকের এই উভয়বিধ বাসনাকেই কাকবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-চিন্তায় রত থাকাই কল্যাণকামীর একান্ত কর্ত্তব্য। অনাদি-সংস্কারজনিত এই বাসনাসমূহ আমাদের হৃদয়ে এরূপ দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ যে, উহাদিগকে নিঃশেষে উন্মূলিত করা কষ্টসাধ্য ও

সময়সাপেক্ষ। দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে তবে ঐ কার্য্যে সফলকাম হওয়া যায়।

যেখানে সত্য, সেইখানেই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ। আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, যাঁহারা সত্য-বাদী, সর্ব্বদা সত্যের পথে বিচরণ করেন তাঁহারাই শান্তি ও আনন্দে থাকেন; পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদীরা অশান্তি ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পূর্ণ শান্তিতে বিরাজমান থাকিতে আমাদের সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু কি করিলে ঐরূপে থাকা যায়—তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। যিনি নিত্য, সত্য-স্বরূপ,—তিনিই শান্তি ও আনন্দের খনি। অতএব তাঁহার চিন্তায় যিনি রত থাকিবেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবেন। কিন্তু আমাদের অনাদি সংস্কার আমাদিগকে সর্ব্বদাই বিষয়াভিমুখী করিয়া আমাদিগকে নিত্য বস্তু হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করে। সুতরাং বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়সমূহকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে অন্তর্মুখী করিতে হইবে। ইহাই হইল শম-দমের কার্য্য; মনকে বিষয় হইতে উপরত করিয়া নিত্য-বস্তুতে নিযুক্ত করিতে হইবে। চিত্ত হইতে বিষয়-সংস্কার যতই মুছিয়া যাইবে, ততই উহা ব্রহ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন হইবে, এবং শান্তি ও আনন্দ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বিষয়াভিমুখী চিত্তকে ব্রহ্মাভিমুখী করিতে যাইয়া নানা বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। ঐ বিঘ্নসমূহকে পর্য্যুদস্ত করিতে না পারিলে উদ্দেশ্য সফল হয় না। প্রথমতঃ, শারীরিক বিঘ্ন, যথা—ব্যাধি, শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ ইত্যাদি; দ্বিতীয়তঃ, মানসিক বিঘ্ন, যথা—সংশয়, উদ্যম-হীনতা প্রভৃতি। প্রথম প্রকার বিঘ্নসমূহের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রবল সহন-শক্তির আবশ্যক। শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও অস্থির হওয়া উচিত নহে; যখন যেরূপই শরীর থাকুক না কেন, সর্ব্বদাই যতটা সম্ভব মনকে সত্য-বস্তুর ধ্যানে নিমগ্ন রাখিতে হইবে। শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব আগমাপায়ী; উহারা আসে, আবার চলিয়া যায়; এইজন্য ধীরভাবে উহাদিগকে সহন করাই বুদ্ধিমানের

কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় প্রকার বিঘ্নের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে সৎশাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অচল অটল বিশ্বাসের আবশ্যক। সরল বালকের মাতৃবাক্যে যেরূপ বিশ্বাস সেইরূপ গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হইলে পারমার্থিক পথে চরম উন্নতি লাভ করা অসম্ভব। যিনি সত্যদেবে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান্ এবং স্বীয় গুরুকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারই হৃদয়ে সত্যের বিকাশ হইয়া থাকে :—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

[শ্বেত, উপ, ২৩।৬]

উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন কার্য্যে উৎসাহ হয় না। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ প্রভৃতি দুষ্কর কার্য্যে যদি কোন একটা মহদুদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে কাহারও ঐ কার্য্য করিতে প্রবৃত্তিই হইবে না। এখন প্রশ্ন এই যে, উপরি উক্ত সাধনত্রয়ের অন্তরালে কোন মহদুদ্দেশ্য নিহিত আছে কি ? হাঁ, অবশ্যই আছে। মুক্তিই উহাদের চরম উদ্দেশ্য। মুক্তি বলিতে মোটামুটি কি বুঝায় দেখা যাউক। আমরা যে ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিতে থাকি উহাদের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ উহাদের হাত হইতে চিরকালের জন্য অব্যাহতি-লাভই মুক্তি। ত্রিবিধ যন্ত্রণা, যথা :—(১) আধিভৌতিক,—(২) আধিদৈবিক ও (৩) আধ্যাত্মিক। সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এবং চৌর, শত্রু প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহাকে 'আধিভৌতিক' তাপ বলে। বজ্রপাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দৈব-দুর্ঘটনা হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায় তাহাকে 'আধিদৈবিক' তাপ বলে। আধি-ব্যাধি-জনিত এবং কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নাবশতঃ যে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহাকে 'আধ্যাত্মিক' তাপ বলে। এই ত্রিবিধ তাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার প্রবল ইচ্ছা জন্মিলে তবেই উক্ত সাধনত্রয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়।

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ বা ত্রিবিধ তাপ হইতে চিরকালের জন্য অব্যাহতি-লাভ একমাত্র

জ্ঞান-লাভের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে; এবং ঐ জ্ঞান-লাভের অধিকারী হইতে হইলে সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। উক্ত চারিটি সাধনের কোনটিরই প্রয়োজনীয়তা কম নহে। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে উহাদের প্রত্যেকটিরই সম্যক পরিপুষ্টি বা বিকাশ আবশ্যক।

(ক্রমশঃ) নিঃসঙ্গানন্দ

সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ

"মহাবেগে ধায় সে তরঙ্গরাজি
অনন্ত অনন্ত খণ্ড তার
উৎসারিত প্রতিঘাত বলে,
ছোটে শূন্যপথে খগোলমণ্ডলীরূপে,
ধায় গ্রহ তারা,
ফেরে পৃথ্বী মনুষ্য আবাস।"

স্বামী বিবেকানন্দ

১

সৃষ্টি এবং ক্রমবিকাশের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই একটি মূল কার্য্যপদ্ধতির রূপান্তর মাত্র এবং আমরা সংযত ও একাগ্র চিত্ত হইয়া ঐ কার্য্যপদ্ধতি আংশিক ভাবে মাত্র বুঝিতে পারি।

আমরা যদি এই বহির্জগৎই দেখি, তবুও এই বিশাল জগৎ দেখিয়া মুগ্ধ ও ভয়াবিষ্ট হইতে হয়। সৃষ্টি অনাদি; এবং অনন্তকাল ধরিয়া উহা চলিবে। আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ইতিহাস ঐ অনন্তকালস্রোতে ক্ষুদ্র এক তরঙ্গ মাত্র। বর্ত্তমানে যে সকল আবিষ্কার

হইতেছে তাহা আরও আশ্চর্য্যজনক। পূর্ব্বে যে সকল মহর্ষিরা দর্শনশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, মনে হয় তাঁহারাই যেন এ যুগে পদার্থতত্ত্ববিদ্ বা জ্যোতির্বিদ্রূপে আসিয়া এক নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রমাণ করিতেছেন। এই নূতন দর্শনশাস্ত্রে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের একাধিপত্য রাজত্ব। যতই আমরা আলোচনা করি ততই আমরা দেখিতে পাই এক মহতী শক্তি পশ্চাতে থাকিয়া এই বিশ্ব জগৎ নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ঐ শক্তির ইচ্ছা-প্রভাবে নূতন জগৎসকল সৃষ্ট হইতেছে এবং পুরাতন জগৎ ধ্বংসের পথে যাইতেছে। তবে সম্ভবতঃ কিছুই একবারে লোপ পাইবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা বস্তুর পুনঃ সৃষ্টি বা শক্তির পুনঃ প্রকাশ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতে পারি না।

গ্রীকদার্শনিক হেরাক্লিটাস বলিতেন, "কিছুই স্থির হইয়া নাই এবং প্রত্যেক বস্তুই অবিরাম গতিশীল।" অণু ও পরমাণুদের কর্ম্মপ্রবণতা দেখিলে ভীত ও স্তম্ভিত হইতে হয় এবং অণু ও পরমাণু হইতে বর্ত্তমানের পদার্থতত্ত্ববিদেরা সৃষ্টিসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

প্রথমে, নিয়ত প্রবাহমান ব্যোম।

পরে, ব্যোমের অংশবিশেষ জমাট বাঁধিয়া বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি।

ইহার পরে, বৈদ্যুতিক শক্তির সমাবেশে পরমাণুর সৃষ্টি

অনন্তর, জড়পদার্থের মিলনে অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত ও ঘূর্ণ্যমান বস্তুর উদ্ভব।

তৎপর, ঘূর্ণ্যমান গতির ক্রমশঃ বৃদ্ধির ফলে সম্মিলিত জড়সমষ্টি হইতে জড়স্রোত বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে; ঐ বিক্ষিপ্তাংশ হইতে বিভিন্ন মাত্রায় উত্তাপবিশিষ্ট নক্ষত্রের জন্ম হয়; কালক্রমে উহাদের উত্তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায় উহা আরও ঘনীভূত অবস্থায় উপনীত হয় এবং উহা হইতে গ্রহাদির সৃষ্টি হয় এবং ঐরূপ গ্রহেই প্রাণশক্তির আবির্ভাব হয়।

---

* Sir Oliver Lodge প্রণীত 'Evolution and Creation' অবলম্বনে লিখিত।

অবশেষে, নক্ষত্ররাশি চতুর্দ্দিকে বস্তু ও শক্তি বিকীর্ণ করার ফলে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং জ্যোতিঃবিহীন হয় এবং খুব সম্ভবতঃ পরে বিলীন হইয়া যায়—অবশিষ্ট থাকে ব্যোম এবং বিক্ষিপ্ত শক্তি। উহাদের সহায়তায় পুনরায় স্বষ্টি-কার্য্য চলিতে পারে।

অনন্তকাল ধরিয়া এই ক্রীড়াই চলিতেছে। জগতের প্রত্যেক অবস্থাই পুনরাগমনশীল। তবে একটি জিনিষ কেবল ক্রমশঃই উন্নতি প্রাপ্ত হয়। উহা হইতেছে জগতের আধ্যাত্মিকতা। ঐ আধ্যাত্মিকতা কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। জগতের প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার ক্ষমতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জগতে আধ্যাত্মিকতা একমাত্র অবিনশ্বর।

২

ডারুইন ক্রমবিকাশ বাদের জন্মদাতা। প্রাণী-জগতে ক্রমবিকাশের ফল তিনিই প্রথমে বুঝিতে পারেন। হারবার্ট স্পেন্সারের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ক্রমবিকাশবাদ কেবল প্রাণী-জগতেই আবদ্ধ রাখিবেন না, পরন্তু উহা জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য করিতে পারেন কি-না চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের দৃঢ় ধারণা যে, এই জগৎ হঠাৎ একজনের আদেশে সৃষ্ট হইয়াছিল; হারবার্ট স্পেন্সার মনে করিতেন যে, তিনি ঐ বিশ্বাস সমূলে বিনষ্ট করিবেন। তাঁহার ধারণা, জগৎ অতি ধীরে এবং ক্রমশঃ পরমাণু ও অণু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং ঐরূপে সরল হইতে অসরলের উৎপত্তি এবং অণু ও পরমাণুতে যে শক্তি লুক্কায়িত ছিল তাহা ক্রমশঃ নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বষ্টির ঐরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এই স্বষ্টির পশ্চাতে থাকিয়া যে শক্তি—যে বুদ্ধিশক্তি, যে চিন্তা-শক্তি, যে মনঃশক্তি—নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া আমরা এক মনঃশূন্য জগতের কথাই কল্পনা করিব। এই প্রসঙ্গে কিংসফোর্ড রহস্য করিয়া বলিয়াছেন, "এই জগত অণু, পরমাণু এবং ব্যোমে পরিপূর্ণ,—অশরীরী কাহারও ইহাতে স্থান হইবে না।"

কিরূপে প্রাণ-শক্তি ও মানবীয় বিবেক এই জগতে সম্ভব হইয়াছিল এই বিষয়ে উপরি উক্ত মতাবলম্বীরা একবারে নীরব। নিম্নস্তরের প্রাণীতেও কিরূপে প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাও এ পর্য্যন্ত কেহ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই খুব চেষ্টা হইয়াছিল, তন্মধ্যে লণ্ডনে কিংস-কলেজের চার্লটন্ বাষ্টিয়ানের চেষ্টাই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেহই প্রাণ-শক্তির প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। সুতরাং হাক্সলে প্রমুখ সকলকেই অবশেষে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, পূর্ব্বতন প্রাণ-শক্তি হইতে অন্যান্য প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে এবং জগৎ হইতে যদি প্রাণশক্তির বীজাণু অন্তর্হিত হয়, তবে কোন নিম্নস্তরের প্রাণীরও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। এই সকল গবেষণার ফলেই স্বনামধন্য পাস্তার রসায়নশাস্ত্র হইতে প্রাণি-বিদ্যায় মনোনিবেশ করেন এবং ঐ গবেষণার উপরেই তাঁহার রোগ সম্বন্ধে অনুশীলনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ অনুশীলনের ফল লিষ্টার অস্ত্রবিদ্যায় প্রয়োগ করেন। এই ভাবে বিভিন্ন দিকে অনুশীলনের ফলে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, প্রাণই প্রাণ সৃষ্টি করিতে পারে।

প্রাণের সৃষ্টির কথা স্বীকার করিলে প্রাণী-জগতের বিভিন্ন কার্য্যাবলী রাসায়নিক এবং পদার্থীয় বলিয়া বুঝান যাইতে পারে। অনুশীলন-কারীরা প্রাণের সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারা একবারে নিরাশ হইলেন না, তাঁহারা আশা করিতে লাগিলেন যে, ভবিষ্যতে কোন বৈজ্ঞানিক উহা আবিষ্কার করিবেন। এবং কয়েক যুগ পরে প্রাণ হইতে মনের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাও প্রমাণিত হইবে, তাঁহারা অনুমান করেন।

এই সকল গবেষণার ফলে মূল বিষয়ে উন্নতি না হইলেও প্রাণি-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ব-বিদেরা কার্য্য করিবার পথ পাইলেন এবং পূর্ব্বে প্রাণী-জগতের যে সকল জিনিষ বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে হইত, তাহাদের মধ্যে সুশৃঙ্খলা

দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের মত এই যে—প্রাণ-শক্তির কার্য্য রাসায়নিক ও পদার্থীয় প্রক্রিয়া ভিন্ন কিছুই নহে; দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রতঙ্গ একটি যন্ত্র এবং প্রাণীর জীবনযাত্রার মধ্যে কোন অজ্ঞাত বা অলৌকিক শক্তি নিহিত নাই।

তাঁহাদের মতকে একবারে ভুল বলা যায় না, তবে উহা অসম্পূর্ণ ইহা স্বীকার করিতে হয়। মতের প্রবর্ত্তকেরা এবং মতাবলম্বীরা ক্রম-বিকাশবাদকে সৃষ্টির বিপরীত ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন। ক্রম-বিকাশ যে সৃষ্টির একটি গোপন রহস্য এবং উহার মূলে যে একটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাঁহারা উহা ধরিতে পারিতেছেন না।

প্রাচীনেরা মনে করিতেন যে, ভগবানের আদেশে হঠাৎ একদিন এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা মনে করিতেন এই সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা সকল বা কিরূপে উহা হয়—তাহা মানুষের অগম্য এবং সৃষ্টি কার্য্যে ভগবানের বেশী সময় লাগে নাই। এই অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যেও কিছু সত্য নিহিত আছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

প্রাচীন মতাবলম্বীদের ও আধুনিকদের মধ্যে সৃষ্টি লইয়া বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। আধুনিকেরা বলেন যে, বিশ্বজগতের আদি অন্ত জড়বিজ্ঞানের সহায়তায় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় এবং জড়বস্তুর মধ্যেও প্রাণ, মন ও শক্তি নিহিত আছে *। যাঁহারা বর্ত্তমান শাস্ত্রের আদি জন্মদাতা তাঁহাদের মত ঐরূপ কি-না বলা কঠিন। হাক্সলে নিজেও বলিয়াছেন যে, জড়দর্শনশাস্ত্রের সীমা আছে এবং জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে মন, বিবেক এই সকল বুঝান যায় না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় নীতির সঙ্গে বর্ত্তমান ক্রমবিকাশ মতের মিল হয় না বলিয়া ঐ বিরোধ সাধারণের মনে কোন কোন স্থলে প্রবল বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে এবং আমেরিকার কয়েকটি রাজ্যে আইনের সহায়তায় বিরুদ্ধ মতানুশীলন বন্ধ করা হইয়াছে। ঐ প্রকার গোঁড়ামিকে আমরা কৌতূহল ও সহানুভূতির চক্ষেই দেখিব। স্বাধীনতাই জ্ঞানের প্রাণ। ভুল বুঝিবার ও ভুল

* বাংলার গৌরব আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু কৃত 'Response in living and non-living' দ্রষ্টব্য।

করিবার এবং সত্য বুঝিবার ও সত্যানুসারে কার্য্য করিবার, সকল বিষয়েই স্বাধীনতা থাকা উচিত।

মহাচিন্তাশীল ব্যক্তি, দূরদর্শী সাধু মহাপুরুষেরা যে সকল অনুপ্রেরণা আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যে উপনীত হইবার পথ বলিয়াই আমাদের ধারণা। বিজ্ঞানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাঁহারা প্রকৃতি-রাজ্যের বিভিন্ন সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও একই সত্যে পৌঁছিবার জন্য ভিন্ন পথে চলিতেছেন।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র বি-এ, বি-এস সি

কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩রা আগষ্ট সোমবার ১২টার সময় খাওয়াদাওয়ার পর আমরা গার্ব্বিয়াং হইতে উপরের দিকে যাত্রা করিলাম। এখান হইতে রাস্তার জন্য রসদ, যথা—আটা, চাল, ডাল, ছাতু, গুড় ইত্যাদি এবং এক লণ্ঠন কেরোসিন তৈল কিনিয়া লওয়া হইল। এখানে, জিনিষ-পত্রের দাম অত্যন্ত বেশী, বিশেষতঃ কেরোসিনের দাম। জিনিষপত্র কেনা সম্বন্ধে পোষ্টমাষ্টার আমাদিগকে সাহায্য করেন। উপরে যাওয়ার কুলীও তিনিই ঠিক করিয়া দেন। কুলী আমাদিগকে তাক্‌লাকোট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে এই চুক্তি হয়। তিব্বতে নোট ভাঙ্গান মুস্কিল বলিয়া, আমরা পোষ্টআফিস হইতে নোট ভাঙ্গাইয়া লইলাম। এখান হইতে বাবাজী আনন্দসিং আমাদের সঙ্গী হইলেন। আমাদের পরের ষ্টেজ কাওয়া এখান হইতে ৪ মাইল। রাস্তা কালীনদীর পুল পর্য্যন্ত খুব উৎরাই। পুল পার হইয়া নদীর ধার দিয়া অনেকটা পথ চলিতে হয়। তারপর সামান্য চড়াই। এই রাস্তায় বুদ্ধানন্দজীর একটা পা মচকাইয়া যাওয়ায় তাঁহার

চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমাদের সঙ্গে যাইবেন—কি ফিরিবেন। রাস্তায় ঘোড়ার সন্ধান করা গেল, কিন্তু পাওয়া গেল না। তিনি কষ্ট করিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। এতটা রাস্তা আসিয়া ফিরিয়া যাইবেন, কৈলাস দর্শন হইবে না, ইহা কখনও হইতে পারে না। এই রাস্তায় স্বামী জ্ঞানানন্দের (আমাদের মিশনেরই একজন সন্ন্যাসী) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি কৈলাস দর্শন করিয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে উপরের রাস্তার অনেক খবর পাওয়া গেল। লিপুলেক পাশ (Pass) পার হইয়া ফিরিবার সময় তাঁহার এক মহা বিপদ ঘটিয়াছিল। কোনরূপে প্রাণে প্রাণে ফিরিয়াছেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিলেন। পাশে (Pass) জোর বৃষ্টি এবং হাওয়া থাকার দরুণ ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। ঠাণ্ডায় তাঁহার হাত পা অসাড় হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে কোন রকমে তাঁহাকে চলিতে হইতেছিল। খানিকটা রাস্তা আসিয়া তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ঘোড়া হইতে বরফের উপর পড়িয়া যান। পরে কুলী আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে। এই কথা শুনিয়া আমাদের সকলেরই একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। ইতিপূর্ব্বে গার্ব্বিয়াং-এ শুনিয়াছিলাম যে, কিছুদিন পূর্ব্বে কৈলাস-যাত্রী একজন সাধু ঐ পাশে চিরদিনের জন্য বিশ্রামলাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ নাকি তাঁহার মৃতদেহ বরফের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। না জানি আমাদের কপালে কি আছে। জ্ঞানানন্দজী আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিলেন, "বৃষ্টি এবং হাওয়া থাকিলে কিছুতেই আপনারা পাশ অতিক্রম করার দুঃসাহস করিবেন না।" তাঁহার সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। বেলা ৪টার সময় আমরা ব্যাসপট্টির অন্তর্গত কাওয়ায় পৌঁছি। এখান হইতে বরফের দৃশ্য অতি সুন্দর। মাঝখানে খানিকটা স্থান সমতল। পাশ দিয়া কালীনদী বহিয়া যাইতেছে। চুপ করিয়া শুনিলে মনে হয়, যেন কালী "হর হর" বলিতে বলিতে চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে গাছের মধ্যে সুদৃশ্য দেওদার এবং চিড়ই (Pine) প্রধান। কাওয়ায় পাথরের বহু ছোট ছোট একচালা ঘর আছে। শুনিলাম, ভোটিয়ারা তিব্বত



ব্যাসপটি হইতে বরফের দৃশ্য

যাতায়াতের সময় এখানে তাহাদের গরু, ঘোড়া, ছাগল এবং মালপত্র লইয়া বিশ্রাম করে। আমরা একটা ভাল দেখিয়া ঘর বাছিয়া লইয়া নিজেদের আসন করিয়া বসিলাম। এখান হইতে উপরের জন্য জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া লওয়া ভাল। উপরে জ্বালানী কাঠের অত্যন্ত অভাব। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিয়া স্থানটিকে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় মনোরম করিল। চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক যেন হাসিতে লাগিল। বুদ্ধানন্দজী সময়োপযোগী কয়েকটি গান গাহিয়া সেখানকার সৌন্দর্য্য এবং নিস্তব্ধতা আরও বাড়াইয়া দিলেন। তিনি গাহিলেন,—

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব-শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়

* * * *

গান শুনিয়া মনে হইল—এই জগৎ-সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা যিনি, না জানি তিনি কত সুন্দর! উপনিষদের ঋষিরা তাঁহাকে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" (?) বলিয়াছেন। সেই পরমপুরুষই রসস্বরূপ। তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছায়া বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একমাত্র তিনিই সত্য, আর সব মিথ্যা। তারপর বুদ্ধানন্দজী গাহিলেন,—

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব-চরাচর॥

* * * *

কাওয়ায় রাত্রিটি বড় আনন্দে কাটিল।

৪ঠা আগষ্ট মঙ্গলবার সকালে আমরা আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের পরের ষ্টেজ ভাঙ্গাং, কাওয়া হইতে ৭ মাইল। রাস্তায় চড়াই উৎরাই কম। তবে অত্যন্ত পাথর থাকায় পথ চলিতে বড় অসুবিধা বোধ হইতেছিল। রাত্রে লবণ-মিশ্রিত গরম জলের সেক দেওয়ায় বুদ্ধানন্দজীর পা অনেকটা ভাল হইয়া গিয়াছিল। তিনি খুব সাবধানে পা ফেলিয়া চলিতেছিলেন। প্রথম খানিকটা যাইয়া একটা পুল দিয়া আমাদিগকে কালীনদী পার হইতে হইল। তারপরও দুই এক জায়গায় আমাদিগকে নদী পার হইতে হইয়াছে। এই রাস্তায় প্রথম দেওদার এবং চিড়ের (Pine) জঙ্গল পাওয়া যায়, তারপর গাছপালা এমন কি ঘাস পর্য্যন্ত আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এদিকে লোকালয় নাই বলিলেই হয়। নাভি এবং কালাপাণি নামক দুইটি স্থান রাস্তায় পড়ে। নাভি হইতে উপরের জন্য জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কালাপাণিতে রাস্তার ধারেই দুই তিনটি ঘর আছে। ইচ্ছা করিলে যাত্রীরা এখানে রাত্রিযাপন করিতে পারেন। ৩টার সময় আমরা ভাঙ্গাং-এ পৌঁছি। এখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্মশালায় ছোট ছোট কয়েকটি কামরা আছে।

আমরা একটি কামরায় আশ্রয় লই। এখানে কয়েকজন ভোটিয়া এবং তিব্বতী হুনিয়ার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহারাও এখানে রাত্রিবাস করিবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা আহারাদি শেষ করিয়া ফেলিলাম।

৫ই আগষ্ট বুধবার আমাদের কৈলাস-যাত্রার একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। ঐ দিন আমরা লিপুলেক পাশ দিয়া হিমালয় অতিক্রম করি।



লিপু-পথে ভারবাহী ঝব্বু

গত রাত্রে আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ভয় হইতেছিল—না জানি পাশে কি অবস্থা হইবে। সকালে চতুর্দিক কুয়াশাচ্ছন্ন দেখিয়া মনে

হইল আর বৃষ্টি হইবে না, রোদ উঠিলে শীঘ্রই সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আমাদের পরের ষ্টেজ পালা ৭ মাইল। মাঝখানে লিপুলেক। গরম জামা কাপড় ইত্যাদি দ্বারা শরীর ভাল করিয়া আঁটিয়া সাঁটিয়া আমরা বাহির হইলাম। পাশে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তিন চারটি ছোট নদী পার হইতে হয়। চড়াই খুব বেশী নয়। তিন মাইলের পর পাশ। চারিদিকে বরফের পাহাড়। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় বেশ বরফ আছে। আমাদিগকে সেই সব স্থান পার হইয়া যাইতে হয়। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। তাহার সঙ্গে অল্প অল্প হাওয়া এবং কুয়াশা। ঠাণ্ডায় আমাদের হাত পা অসাড় হইয়া যাইতেছিল। শ্বাস-কষ্টও বেশ বোধ করিতেছিলাম। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে দম লইবার জন্য দাঁড়াইতে হইতেছিল। পাশের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬,৮০০ ফিট। এত উঁচুতে বায়ুর অল্পতার জন্য শ্বাস-কষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। চারিদিকের নিস্তব্ধতা অসাধারণ। সেই নিস্তব্ধতা অনুভব করিবার জিনিষ। ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। পাশের সর্ব্বোচ্চ অংশে নিশান উড়িতেছ—দেখিলাম। স্থানে স্থানে পাথরের স্তূপ আছে। পাশটি বাস্তবিক অত্যন্ত দুর্গম। পার হইতে আমাদের দুই ঘণ্টার উপর লাগিয়াছিল। ভগবানের কৃপায় জোর বৃষ্টি ও হাওয়া না থাকায় এবং তুষারপাত না হওয়ায় আমরা নিরাপদে পাশ অতিক্রম করিলাম। পাশে কয়েকজন ভোটিয়া এবং তিব্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের সঙ্গে ঘোড়া, ঝব্বু, গরু ইত্যাদি ছিল। কুয়াশা থাকায় চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হয় নাই। তারপর ঠাণ্ডায় এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখা অপেক্ষা আত্ম-রক্ষার দিকেই আমাদের দৃষ্টি বেশী ছিল। বৃষ্টিতে আমাদের জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল। পাশ ছাড়িয়া খানিকটা রাস্তা উৎরাই। তারপর অনেকটা রাস্তা সমান। দুই একবার আমাদিগকে নদী পার হইতে হয়। এই ভাবে চলিয়া বেলা তিনটার সময় আমরা পালায় পৌঁছি।

এইবার আমরা লামাদের দেশ তিব্বতে পড়িলাম। হিমালয়, বৃটিশ-

ভারত এবং তিব্বতের মধ্যখানে থাকিয়া দুইটি দেশকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। পালায় পাশাপাশি দুইটি ধর্ম্মশালা আছে। আমরা একটি ধর্ম্মশালার একটি কামরায় আশ্রয় লইলাম। সারাদিন পথ চলিয়া আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। নড়িবার পর্য্যন্ত ইচ্ছা হইতেছিল না। মাথাও বেশ ধরিয়াছিল। কেই বা বিছানা পত্র গুছায়, কেই বা রান্না করে? কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চা পান করা গেল। চা পানে শরীরে একটু জোর আসিল। বুদ্ধানন্দজী রান্নার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আহারাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর আমরা শয়ন করিলাম।

পরদিন ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার সকালে আমরা তাক্‌লাকোটের দিকে যাত্রা করি। পালা হইতে তাকলাকোট ৪ মাইল। তাক্‌লাকোট দূর হইতে সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত একটি দুর্গের মত দেখায়। কর্ণালীনদী যেন পরিখার ন্যায় স্থানটিকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। রাস্তা বেশ সমতল। তিব্বতের প্রায় সর্ব্বত্রই রাস্তা এইরূপ। খানিকটা পথ চলিয়া আমরা একটি ছোট নদী পার হইলাম। নদীর জল এক হাটুর উপর নয়। কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা বলিয়া পার হইতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। ঠাণ্ডায় পা কামড়াইতেছিল। আবার জুতা মোজা পরিয়া পা কতকটা গরম হইলে আমরা সুস্থ হইলাম। রাস্তায় স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অক্ষর পড়িতে পারি নাই। অক্ষর অনেকটা বাঙ্গালা অক্ষরের মত। সব পাথরেই প্রায় একই কথা লেখা। এই সব পাথরে আমাদের পবিত্র মন্ত্র—'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' কি লেখা? এদিককার দেশ একদম উষর, না আছে এখানে গাছপালা, না আছে শস্য। তবে তাকলাকোটের নিকট কর্ণালীনদীর আশেপাশের জমিগুলি মোটামুটি উর্ব্বর। সেই সব জমিতে যাস এবং মটর উয়া প্রভৃতি ফসল হইয়া থাকে। তিব্বতে আসিয়া প্রথম লোকালয় বলিতে তাক্‌লাকোট এবং তৎসন্নিকটস্থ পল্লী আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার ঘরবাড়ী এক নূতন রকমের। বাড়ী খুব উঁচু, কখনও দুতলা হইতে তেতলা পর্য্যন্ত। পাথর এবং

মাটির প্রস্তুত দেওয়ালের উপর সমতল ছাত। ঘরে দরজা জানালা কম এবং আকারে অতি ছোট। অনেক বাড়ীতেই মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছোট উঠান আছে। প্রত্যেক বাড়ীতে প্রায় দুই একটা নিশান উড়িতেছে দেখা যায়। গৃহস্থের রক্ষকস্বরূপ প্রত্যেক বাড়ীতেই দুই একটি করিয়া কুকুর আছে। তাহাদের আকার ভীষণ, আওয়াজ গুরুগম্ভীর, স্বভাব অত্যন্ত হিংস্র। কুকুর থাকিলে অপরিচিত লোকের পক্ষে বাড়ীতে প্রবেশ করা নিরাপদ নহে। মনে হয়, এক একটা কুকুরের এত শক্তি যে, প্রয়োজন হইলে বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে পারে। তিব্বতের অধিবাসীদের চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব অদ্ভুত। ইহাদের গায়ের রং তাম্রবর্ণ। লামা ছাড়া সকলেরই মাথায় লম্বা চুল, চোখ ছোট, নাক চ্যাপটা এবং আকার দীর্ঘ। গোঁফ দাড়ি প্রায় কাহারও নাই। পোষাক-পরিচ্ছদ স্ত্রীপুরুষ সকলেরই এক প্রকারের। সুতরাং অনেক সময় স্ত্রী কি পুরুষ বোঝা মুস্কিল। ইহাদের গায়ে আলখাল্লার মত লম্বা জামা, মাথায় কিম্ভূতকিমাকার টুপি এবং পায়ে পশমের বুট্ থাকে। ইহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার। স্নান ইহাদের কোষ্ঠীতে লেখা নাই। অনেক সময়ে দেখা যায়, ইহাদের গায়ের চামড়া এবং পোষাকের উপর ময়লার একটা স্তর পড়িয়া গিয়াছে সুতরাং দূর হইতে দেখিলে অনেক সময় ঘৃণা অথবা ভয়ের সঞ্চার হয়। অবশ্য তিব্বতে সুসভ্য সমাজে মিশিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। খুব সম্ভব সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তরের লোকদিগকেই আমরা বেশীর ভাগ দেখিয়াছি। সুতরাং আমাদের মন্তব্য একদেশী হইতে পারে। নিকটস্থ একটি ছুনিয়ার পল্লীর মধ্য দিয়া, কর্ণালীনদী পার হইয়া দুপুর বেলা আমরা তাক্‌লাকোটে পৌঁছি। তাক্‌লাকোট তিব্বতের একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানকার উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৫০০০ ফিটের কম হইবে না। কর্ণালীনদীর দক্ষিণ তীরে ভারতবাসী ভোটিয়া ব্যবসায়ীদের আড্ডা। আড্ডাটি বেশ বড়। বহু দোকানপাট এখানে আছে। দোকানপাট সব দেখিতে এক রকমের—দুচালা ছোট ঘরের মত। কাপড়ের ছাউনী। এই আড্ডায় সাধারণতঃ চৌদাস এবং ব্যাসপট্টির ভোটিয়ারাই বেশীর ভাগ আছে।

তাক্‌লাকোটে ক্রয়-বিক্রয় সাধারণতঃ জিনিষের বিনিময়ে হইয়া থাকে। পশম এবং সোহাগা তিব্বতের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। পৃথিবীর অপর কোথাও বোধ হয় এমন চমৎকার পশম পাওয়া যায় না। তিব্বতী গৃহস্থের প্রধান সম্পত্তি মেষ। এই মেষের লোম হইতে যেমন মূল্যবান্ পশম পাওয়া যায়, তেমনই ইহার মাংস তিব্বতীদের প্রধান খাদ্য। তিব্বতী সওদাগরগণ ভোটিয়াদের নিকট হইতে পশম এবং সোহাগার বিনিময়ে কাপড়, ষ্টেশনারী, চাল, ডাল, গুড়, চিনি, কিশমিশ, মনাক্কা ইত্যাদি জিনিষ কিনিয়া থাকে। জুন মাস হইতে নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় চলে। যখন শীত অত্যন্ত বাড়ে এবং ভীষণ ভাবে বরফ পড়িতে আরম্ভ করে তখন ভোটিয়ারা দোকানপাট বন্ধ করিয়া পশম এবং সোহাগা লইয়া ভারতে ফিরিয়া আসে। ভোটিয়াদের আড্ডার ঠিক উপরেই একটি উঁচু পাহাড়ে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার (জুংপন) বিচারালয় এবং বাসস্থান। তাহার নিকটেই তাক্‌লাকোটের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠ—সিঙ্গোলী গোম্ফা।

তাক্‌লাকোটে আমরা পরিচিত এক ভোটিয়া সওদাগরের দোকানে আশ্রয় লইলাম। সওদাগরটি আমাদের যথোচিত আদর যত্ন করেন, আমাদের কুলী, ঘোড়া ইত্যাদি ঠিক করিয়া দেন। ইনি ছাড়া আরও দুই এক জন ভোটিয়া আমাদিগকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাক্‌লাকোটে আমরা দুই দিন দুই রাত্রি ছিলাম। এখানেই আমরা প্রথম তিব্বতী চা পানকরি। সে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। চা এবং গরম জলের সঙ্গে লবণ এবং মাখন মিশাইয়া অদ্ভুত কৌশলে উহা প্রস্তুত হয়। যদিও আমরা ইহার স্বাদ খুব পছন্দ করি নাই, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, পরিশ্রমের পর ইহা পান করিলে শরীরে একটা সজীবতা আসে। ভোটিয়ারা এই চা খুব পছন্দ করে। এখানকার জল-বায়ুর এমনই গুণ যে, যাহা খাওয়া যায় তাহাই অতি সহজে হজম হইয়া যায়। সেইজন্য সাধারণ খাবার খাইয়াও আমাদের শরীর তিব্বতে বেশ ছিল। কি রাক্ষসী ক্ষুধাই সেখানে হইত!

৭ই আগষ্ট শুক্রবার বিকালবেলা পরিচিত এক ভোটিয়াকে সঙ্গে লইয়া আমরা সিঙ্গোলী গোম্ফা দেখিতে যাই। ভোটিয়াটির তিব্বতী এবং হিন্দী দুইই জানা ছিল বলিয়া তাঁহাকে দিয়া দোভাষীর কাজ হইবে মনে করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লওয়া গেল। গোম্ফায় ভেট চড়াইবার জন্য কিছু টংকা (তিব্বতী মুদ্রাবিশেষ, মূল্য চারি আনার সমান) লইলাম। ভোটিয়াদের আড্ডা হইতে গোম্ফা (তিব্বতী মন্দির) সামান্য দূরে এক উঁচু পাহাড়ে। দূর হইতে গোম্ফাটি একটি দুর্গের মত দেখায়। রাস্তা বেশ চড়াই এবং খারাপ। রাস্তায় কাঁকর এবং বালি থাকায় পা অতি সহজে সরিয়া যায়। গোম্ফাটি বেশ বড়। ওখান হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি চমৎকার। নীচেই ভোটিয়াদের আড্ডা। তারপর কর্ণালীনদী। নদীর অপর তীরে তুনিয়া পল্লী। পল্লীর আশেপাশে সবুজ ফসলের ক্ষেত। ক্ষেতগুলি দেখিতে মসৃণ, সবুজ ভেলভেটের মত। অদূরে যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেইদিকেই শুভ্র-কিরীট বরফের পাহাড়ের শ্রেণী ; তন্মধ্যে গুরলা মান্ধাতা পর্ব্বতের দৃশ্য অতি চমৎকার, ইহার উচ্চতা ২৫,৩৫০ ফিট।

আমরা অনুমতি লইয়া মঠের ফটকে লাঠি রাখিয়া অতি কৌতূহলের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী—তেতলা। বহু লামা রহিয়াছেন। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দ্রষ্টব্য সব দেখিতে লাগিলাম। ভিতরে স্থানে স্থানে অত্যন্ত অন্ধকার। একজন লামা একটি ঘীয়ের বাতী লইয়া সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখাইয়া চলিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা অনেক কিছু দেখিলাম। এখানে যাহা যাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহাই বলিব। গোম্ফায় একটি প্রকাণ্ড হলঘর আছে। হলঘরেই বোধ হয় সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে প্রার্থনাদি করেন। হলের একধারে বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড ধ্যানমূর্ত্তি। মূর্ত্তির সম্মুখে ছোট ছোট পিতলের বাটি আছে এবং কয়েকটি ঘীয়ের বাতী জ্বলিতেছে। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া বহুলোক একসঙ্গে যাহাতে ভজন প্রার্থনাদি করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা আছে। বসিবার জন্য লম্বা লম্বা সারি সারি গদিযুক্ত আসন



গুরলা মান্ধাতা পর্ব্বতের দৃশ্য

রহিয়াছে। হলঘরটি অনেকটা রোমান ক্যাথলিকদের গির্জ্জার মত। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ছাড়া, দেব-দেবী এবং প্রাতঃস্মরণীয় সিদ্ধ লামাদের মূর্ত্তিও অনেক আছে। গোম্ফায় ছোট বড় প্রার্থনা-যন্ত্রও বহু আছে। প্রার্থনা-যন্ত্র এক অদ্ভুত আবিষ্কার। ইহা তিব্বতীদের পেটেণ্ট। পরশুরাম-বিরচিত "গড্ডলিকা"য় শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্ নামক গল্পটি বোধ হয় আপনারা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। তাহাতে "দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ্" নামক শ্রমহারক যন্ত্রটির কথা বোধ হয় আপনাদের মনে আছে। উহাতে ষ্ট্যাম্পে ১২ লাইন "শ্রীশ্রীদুর্গা" খোদিত আছে। উহা ৯ বার ছাপিলে ১০৮ বার দুর্গা নাম লেখা

হইয়া যায়। এই যন্ত্র সাহায্যে প্রতিদিন সকালে কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শ্যামবাবু ১০৮ বার দুর্গা নাম লিখিতেন। লামাদের প্রার্থনা-যন্ত্র ইহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই প্রার্থনা-যন্ত্র এমনই কৌশলে প্রস্তুত যে, একবার ঘুরাইলে সহস্রবার প্রার্থনা আপনাপনি হইয়া যায়। যন্ত্রটির মধ্যে কাগজের কুণ্ডলীতে সহস্র অথবা ততোধিক প্রার্থনা-মন্ত্র লেখা থাকে। হ্যাণ্ডেল ঘুরাইলে ভিতরকার কুণ্ডলী ঘুরে। যতবার হ্যাণ্ডেল ঘুরান হইবে তত সহস্রবার প্রার্থনা-মন্ত্র জপ করার কাজ হইবে। অদ্ভুত আবিষ্কার বটে! সিঙ্গোলী গোম্ফায় হাতে-লেখা বহু প্রাচীন পুঁথি আছে। আমার দুই এক খানা পুঁথি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিবার কৌতূহল হইয়াছিল। লামারা রাজী না হওয়ায় আমার সে কেতূহল অপূর্ণ রহিল। আমরা শুনিলাম, এই মঠে প্রায় ১৫০ জন তিব্বতী ছেলেমেয়ে আসিয়া লামাদের নিকট বিদ্যাভ্যাস করে। এক কালে হয় ত এই মঠটি ছোটখাট বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ছিল। আমরা যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছিলাম তখন কয়েকটি ছেলে (বোধ হয় আমাদিগকে শুনাইবার জন্য) খুব চীৎকার করিয়া পড়িতে থাকে। একটি কক্ষে এক বৃদ্ধ লামাকে দর্শন করিলাম। তিনি বোধ হয় এখানকার অধ্যক্ষ। আমরা মাথা নত করিয়া নমস্কার করিলে তিনি আমাদিগকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ফুল বেলপাতার পরিবর্ত্তে প্রসাদী নানা রং-এর কাপড়ের টুকরা উপহার দিলেন। এই সব টুকরা ধারণ করিলে নাকি শরীর ভূত, প্রেত এবং ব্যাধি হইতে মুক্ত থাকে। আর একটি কক্ষে যাইয়া দেখিলাম ঘীয়ের বাতী জ্বলিতেছে। বাতীর আলোকে কয়েকজন লামা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুঁথি খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছেন। অবশ্য আমরা উঁহাদের কথার একবর্ণও বুঝিলাম না। ভোটিয়াটির উপদেশ মত আমরা স্থানে স্থানে ভেট চড়াইলাম। অল্প সময়ের মধ্যে সব দেখিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা আমাদের আস্তানায় ফিরিলাম।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র যেমন ধর্ম্মের নামে দোকানদারী, এই বৌদ্ধ মঠেও

তাহাই দেখিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই, মনে হইল, ভগবান্ বুদ্ধদেবের অলোকসামান্য ত্যাগ এবং পবিত্রতার আদর্শ ভুলিয়া গিয়া বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া পড়িয়া আছেন। অধিকারি-নির্ব্বিশেষে সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় এককালে ভারতে যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম কুফল প্রসব করিয়াছিল, তিব্বতেও তাহাই হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অবশ্য তিব্বতে উন্নত চরিত্রের সিদ্ধ মহাপুরুষও অনেক আছেন শুনা যায়। তাঁহাদের দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই।

৮ই আগষ্ট শনিবার আমাদের তাক্‌লাকোট হইতে কৈলাসের দিকে যাত্রা করিবার কথা। সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া আমরা প্রস্তুত হইয়া থাকি। আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য একজন কুলী (তিব্বতী) এবং হিন্দী ও তিব্বতী ভাষা জানে এবং রান্না করিতে পারে এমন একজন ভোটিয়া দোভাষী ইতিপূর্ব্বেই ঠিক হইয়াছিল। কুলী, মালের জন্য একটি এবং চড়িবার জন্য একটি ঘোড়া আনিবে। রাস্তার প্রয়োজনীয় রসদও কিনিয়া ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। রাস্তায় কোথাও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নাই শুনিয়াছিলাম। সুতরাং এখান হইতে সকল জিনিষ কিনিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাক্‌লাকোটে গার্ব্বিয়াং অপেক্ষাও জিনিসপত্রের দাম বেশী। যাঁহারা পারেন অনেক জিনিষ নীচে হইতে কিনিয়া আনিবেন। রাস্তায় ব্যবহারের জন্য একটি ঐ দেশী ছোট তাঁবুও ভাড়া করা গেল। তিব্বতে স্থানে স্থানে অত্যন্ত দস্যুর উপদ্রব। আত্মরক্ষার জন্য আমাদের আশ্রয়দাতা ভোটিয়া সদাগরের দোনালী গাদা বন্দুকটি এবং কিছু গুলী বারুদ ধার করিয়া লওয়া গেল। জিনিষপত্র গুছাইয়া আন্দাজ ১২ টার সময় আমরা যাত্রা করিলাম। বাবাজী আনন্দ সিং এবং ৬০ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে চলিলেন। আমাদের পথের ষ্টেজ রুণ, তাক্‌লাকোট হইতে অনুমান ৮ মাইল দূরে। সেখানে পৌঁছিতে আমাদের ছয়টা বাজিয়া গেল। রাস্তা মোটামুটি সমতল। কর্ণালীনদী পার হইয়া আমাদিগকে যাইতে হয়। স্থানে স্থানে

রাস্তার ধারে শিলালিপির স্তূপ এবং মটর উয়া প্রভৃতি ফসলের ক্ষেত পাওয়া যায়। ক্রমে আমরা আমাদের কুলীর পরিচিত এক তিব্বতী গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। দূরে আমাদিকে দেখিয়া লম্বা লোমওয়ালা একটি ভীষণাকৃতি কুকুর বাঘের মত গর্জ্জন করিতে করিতে গ্রামে ঢুকিবার নিষেধাজ্ঞা জানাইল। আমরা কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া আস্তে আস্তে লাঠি হাতে গ্রামে প্রবেশ করিলাম। এই গ্রামে মাত্র দুই তিনটি পরিবার বাস করে। বাড়ী দূরে দূরে। আমরা যে বাড়ীতে উঠিলাম সেই বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক এবং দুই তিনটি অপোগণ্ড শিশু সন্তান ছাড়া অপর কেহই ছিল না, পুরুষগণ বোধ হয় ব্যবসা-ব্যপদেশে অন্যত্র গিয়াছে। আমরা বেশ স্বচ্ছন্দে এক রাত্রি ঐখানে কাটাইলাম।

(ক্রমশঃ) বিবিদিষানন্দ

মৃত্যু-রূপসী

পশ্চিমের মহাকাশে আলোক নিবিয়া আসে
ম্লান সন্ধ্যা পরকাশে
ছায়ার মতন,
রাত্রি আসে, যায় দিন সুখহীন, শান্তিহীন
যেন অতি ক্লান্ত ক্ষীণ
বিগত চেতন।
অন্ধকারে ঢাকে মেঘ নাই গতি, নাই বেগ
চারিদিকে কি উদ্বেগ
বিষাদ-বিধুরা,
যেই দিকে ফিরে চাই তুমি নাই, তুমি নাই,
তোমারে তো নাহি পাই
হে মোর মধুরা!

হে মধুরা-বিষাদিনী এই চিত্ত-নিবাসিনী
বল হৃদি-উন্মাদিনী
পাব কি তোমায় ?

আসন্ন আঁধার-তীরে অবসন্ন দিবা-নীড়ে
তুমি কি এসেছ ধীরে
বিহঙ্গিনী প্রায় ?

করুণা-বিমুখ ওগো, মৃত্যুরূপা জাগো জাগো,
এই কূলে দেখে যা গো
শ্মশানের রেখা !

সম্মুখেতে অন্ধকার আসে মেলি জিহ্বা তার
গ্রাসিবারে চারিধার
দিয়াছে সে দেখা ।

হে করালী কালী মোর ছড়ায়ে চিকুর তোর
প্রলয়ের একি ঘোর
সৌন্দর্য্য আবার ?

আমার তো নাই হাসি কি লইতে চাস্ গ্রাসি
নিতে চাস্ সর্ব্বনাশী
শান্তি কি আমার ?

হের সন্ধ্যা তারকার ছল ছল অশ্রুভার
কি অসীম করুণার
অপার মহিমা !

তার মাঝে হে ভয়ালি, ভালবাসা দিয়ে ডালি
ছিনাইয়া নিবি খালি
স্নেহ-মাধুরিমা ।

একে একে ফুটিতেছে একে একে উঠিতেছে
একে একে জ্বলিতেছে
নক্ষত্রের মালা,

মেঘ্নার কূলে কূলে তরঙ্গেতে ফুলে ফুলে
একি রঙ্গ হেলে দুলে
খেলিতেছ বালা।

উল্‌কা খসিয়া পড়ে তোমার বুকের পরে
স্তব্ধ হয়ে আছে ধরে
ধরণী তোমার!

হাস তুমি খল্ খল্ হায় তব একি ছল
কি আনন্দ আছে বল
মরণ-চুমায়?

নাই আলো, নাই দিবা অদূরে ডাকিছে শিবা
নিশাচর কাঁদে কিবা
সভয় তরাসে।

দ্বারে দ্বারে কর হেনে বায়ু যেন যায় জেনে
আজি কা'র দুনয়ানে
গাঢ় নিদ্রা আসে?

নিশীথের নিস্তব্ধতা যেন আজ ধ্যানরতা
অন্তরের কাতরতা
শান্ত হয়ে আসে,

পর্ণ কুটীরের তলে যে মৃণ্ময় দীপ জ্বলে
কি রহস্য দেয় বলে
ঈষৎ আভাসে,

দীপশিখা অগ্রভাগে পবনের স্পর্শ লাগে
কম্পিত কামনা জাগে
শঙ্কিত জনের,

মৃত্যুরূপা হে রূপসী, এ নিভৃত চিত্তে বসি
কোন্ রসে উঠ রসি
আমার মনের?

যার লাগি কেঁদেছিনু যার লাগি সেধেছিনু
যার লাগি রেখেছিনু
অমিত জীবন ;—
পায়ে দলি গিয়াছে সে বিদ্রূপের উপহাসে
আঁখিপাতে ঢুলে আসে
তাইতো মরণ।
অর্দ্ধ-মধু অর্দ্ধ-বিষ ছড়াইয়া দশদিশ
ঢালিছ কি শুভাশীষ
ভীষণা রূপসী !
তামসী রজনী আনি ঢেকে দিয়ে জনপ্রাণী
গাহিছ কি শেষ বাণী
নীরবে উছসি ?
আজি অমা রাত্রিশেষে এই মোর দ্বারদেশে
এলি কি গো মৃত্যু-বেশে
হে অভিসারিকা !
কোন্ রক্তজবা আনি সাজাইয়া ডালাখানি
উপহার দিব আমি
প্রণয়-মালিকা।
আমি ভিন্ন কে তোমারে ছিন্ন হৃদি উপহারে
পূজা আজ দিতে পারে
নির্ভয় সাহসে ?
কে তোমারে বল প্রিয়া প্রাণমন সমর্পিয়া
তুলিতেছে মুঞ্জরিয়া
সঙ্গীতের রসে ?
জানি এই গীতধ্বনি হবে মৃত-সঞ্জীবনী
যামিনীর অন্ধখনি
জাগিবে আলোকে,
আজন্ম সন্ন্যাসী আমি শব-সাধনার স্বামী
দিনু তোমা এ প্রণামী
মৃত্যুহীন শ্লোকে।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

মাধুকরী

ঋষি টলষ্টয়ের একখানি চিঠি

(রমাঁ। রলাঁ।)

মহাত্মা টলষ্টয়কে আমি প্রথম চিঠি লিখি সে আজ চল্লিশ বছর আগেকার কথা, ১৮৮৭ সালের মে মাসে তাঁকে চিঠি লেখবার একটা তাগিদ আসে; তরুণ যৌবনের সংশয়-সন্দেহের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা নির্ভর ভূমি খুঁজিতেছিলাম। আমি আছি—কারণ আমি অনুভব করিতেছি—এই অপরোক্ষ অনুভূতির উপর ভূমায় আমার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম—সেই প্রচেষ্টার ইতিহাস আমার Credo Zunia Verum শীর্ষক প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে। ("আত্মদর্শন" প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২ দ্রষ্টব্য)।

সে সময় টলষ্টয় 'শিল্প বস্তুটা কি ?' (What is Art) লিখিয়াছেন। শিল্পীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া মনের মধ্যে বিষম একটা খট্‌কা লাগিল; টলষ্টয়কে আমি বুঝিতে পারিলাম না। সেই সময় তাঁকে যে চিঠিখানি লিখি তার দুই চারিটি টুকরা মাত্র আমার ডায়েরীতে টোকা ছিল। তার সাহায্যে আমার মনের অবস্থাটার কিছু আভাস দিই :—

আমার চিঠি

মহাত্মন্! আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমায় আপনাকে চিঠি লিখিবার দুঃসাহস দিয়াছে। অপরিণতমতি এই দীন ভক্ত আপনাকে কতকগুলি নিরর্থক উচ্ছ্বাস শুনাইতে আজ আপনার সম্মুখে আসে নাই। সে ভাবে আপনার প্রতি অমর্য্যাদা দেখাইতে আমি পারি না, কারণ আমি আপনাকে নিবিড় ভাবে চিনি··· ······

মৃত্যু আমার চারিদিকে যেন এক কুহকজাল বিস্তার করিয়াছে;

আপনার গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অনুভব করিয়াছি যেন প্রতি ছত্রে মৃত্যুর ছায়াপাত—বিশেষতঃ আপনার আইভান ঈলিচ (Ivan Elitch) পাঠে আমার মন যেন অস্থির হইয়াছে।·········আমি বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছি এই যে প্রতিদিনের কেজো জীবন এটা আমাদের সত্য জীবন নয়·········। এক দিকে জীবে জীবে স্বার্থঘটিত সংঘর্ষ, অন্যদিকে এক অখণ্ড শাশ্বত জীবনের মধ্যে গভীর সমন্বয়; সংঘর্ষ কমাইয়া এই সমন্বয়ের দিকে যতই অগ্রসর হইব জীবন ততই সত্য হইয়া উঠিবে। আমাদের খণ্ড সত্তাকে অখণ্ড অসীম প্রাণের সাগরে ডুবাইয়া বিলীন করিয়া দিতে হইবে—ইহাই ত আপনার বাণী। এ বাণীকে আমার সমস্ত প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমার সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা আপনার পদাঙ্কানুসরণ করিতেছে······। আমি বুঝিয়াছি আমাদের স্বার্থ আমাদের অহংবোধকে দূর করিতে হইলে, সেই মহান্ ত্যাগটি সত্য করিতে হইলে একটি জিনিষ প্রয়োজন—সমস্ত সৌখীন কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস দূর করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ-ব্রতে নিযুক্ত হওয়া। আপনি বলিয়াছেন চিন্তার ক্ষমতা, হৃদয়ের প্রশান্তি আনিতে হইলে আমাদের একমনে পর-সেবায়, লোকহিতকর কার্য্যে শারীরিক শ্রমসাধনে লাগিতে হইবে। সেই ত জীবনের পরম আশীর্ব্বাদ ক্ষুদ্র আমিকে ভুলিয়া যাওয়া। মাহাত্মন্! আমি প্রাণপণে ভুলিতে চাই—আমি বিশ্বাস করি ক্ষুদ্র আমিকে ভুলিতে পারিব।

কিন্তু একটি প্রশ্ন কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছি না, তুচ্ছ অহমিকার কবল হইতে মুক্তি কেবল হাতের কাজের ভিতর দিয়া হইবে একথা এতটা জোরের সঙ্গে আপনি কেন বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এই প্রশ্ন আমার সমস্ত হৃদয় মনকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। শিল্পের প্রতি আপনি নির্দ্দয় হইয়াছেন কেন? শিল্প কি আত্মোৎসর্গ-সাধনের একটি প্রকৃষ্ট উপাদান নয়? আপনার নূতন প্রবন্ধ 'কি করা দরকার?' পাঠ করিয়া দেখি তার মধ্যে শিল্পের স্থান সব কিছুর নীচে! শিল্প-সৃষ্টিকে আপনি আক্রমণ করিয়াছেন অথচ আপনার বিরুদ্ধতার কোন কারণ দেন নাই। যদি আমি আপনাকে কারণ জিজ্ঞাসা করি, আমার বাচালতা ক্ষমা করিবেন। বুঝিতেছি,

আপনি শিল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা ও ভোগলিপ্সা দেখিয়াছেন; আপনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে শিল্প যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে শিল্প-মাদকতা ততই আমাদের স্বার্থপরতাকে বাড়াইয়া চলে! হায়, স্বীকার না করিয়া উপায় নাই! তথাকথিত শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই কাছে শিল্প আভিজাত্যগর্ব্বী ইন্দ্রিয়লিপ্সা মাত্র। কিন্তু শিল্প কি ইহা ছাড়া আরও কিছু নয়? ক্ষুদ্র একদল সত্য শিল্পীর কাছে ইহা কি সব নয়? তাহাদের কাছে একমাত্র শিল্পই যে স্বার্থকে ভুলিতে, ভূমার মধ্যে ডুব দিয়া সৃষ্টির অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে দেয়। সেই অবস্থায় মৃত্যুই বা আমাদের কি করিতে পারে? মৃত্যু যে তখন মরিয়াছে, শিল্পী যে মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে।

আমি কি ভুল বকিতেছি? যদি ভুল করিয়া থাকি আমায় শুধরাইয়া দিন।

আমি শিল্পের প্রেমে ডুবিতে চাই—কারণ উহার সাহায্যে আমার এই দীনহীন 'আমি'র কারা-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া শাশ্বত প্রাণের সঙ্গে এক হইয়া মিলিতে পারি। যে সব কালবৃদ্ধ জাতি সভ্যতার চাপে মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে তাহাদের আরোগ্যের একটি বড় উপায় কি খাঁটি শিল্প নয়?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিব। হাতের কাজকে আপনি মস্ত বড় স্থান দিয়াছেন, কিন্তু সেই কাজের সঙ্গে যদি মনের যোগ না থাকে আপনি কি তাহাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন? চিন্তাকে বলি দিতে, শিল্পকে অস্বীকার করিতে আপনার কি কোন অনুশোচনাই হইবে না? আর শুধু আমরা চাহিলেই কি চিন্তাকে ও শিল্পকে উড়াইয়া দিতে পারি? আমার দেশ ফ্রান্সে এবং ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র দেখি অবিশ্বাসীদের ভিড়, পল্লবগ্রাহীদের কড়কড়ানি—চারিদিকেই ঔদাসীন্যের অন্ধকার! ইহার মধ্যে একজনকেও পাইতেছি না—যিনি গুরু হইয়া হাত ধরিয়া লইয়া যান। আপনার উপদেশ আমার বিশেষ প্রয়োজন।

রমঁ্যা রলঁ্যা

টলষ্টয়ের চিঠি

সোদর-প্রতিমেষু—

রমাঁ রলাঁ! তোমার প্রথম পত্রখানি পাইয়াছি; ইহা আমার হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বেই উত্তর দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু সময় পাই নাই। তাহা ছাড়া ফরাসী ভাষায় জবাব লিখিতে আমার বেশ পরিশ্রম হয়। বড় করিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কারণ আমার বক্তব্যটি ভাল করিয়া না বুঝার দরুণই তোমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা।

প্রশ্ন করিয়াছ—আমাদের স্থায়ী সুখের জন্য হাতের কাজ একান্ত প্রয়োজন কেন? সেই কাজের সঙ্গে যে-সব জিনিষের ঘনিষ্ঠ যোগ নাই—যেমন শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি—সেই সব মানসিক ক্রিয়া-কর্ম্ম কি তাহা হইলে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইবে?

এই ধরণের প্রশ্নের জবাব আমার সাধ্যমত আমার ('What to do?') গ্রন্থে দিয়াছি; সে বইখানির ফরাসী অনুবাদ বাহির হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। শারীরিক শ্রম বা হাতের কাজকে আমি একটা নূতন ধর্ম্ম বলিয়া খাড়া করিতে চাই নাই; শুধু ইহা যে একটি সহজ প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রকার-ভেদ এবং ইহার প্রয়োগ যে সকল অকপট মানুষের কাছেই প্রথম হইয়া দেখা দেয়, সেই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের সভ্যতাস্পর্দ্ধী সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বার্থ ও নীচতায় ধ্বংসোন্মুখ; ইহার মূল কারণ এই যে, দীন-দরিদ্রের পরিশ্রমের সুযোগ লইয়া আমরা ভদ্রদল অধিকাংশই সকল শ্রমের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া বসিয়াছি; শুধু এই মারাত্মক ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্যই শ্রমভার সকলেরই স্বীকার করা উচিত। অশিক্ষিত মন্দভাগ্য যে অগণ্য মানুষ পুরাকালের ক্রীতদাসের মত আমাদের জন্য প্রাণপাত করিতেছে তাহাদের আত্মবলিদানের তুলনায় আমরা ভদ্রসভ্যেরা কতটুকু করি তাহা ভাবি কি?

এই মূলগত বৈষম্য দূর করিতে যদি চেষ্টা করি তবে বুঝা যাইবে আমরা কতটা সবল এবং খৃষ্টের ধর্ম্ম (দার্শনিক দিকেই হোক, আর লোকহিতের দিকেই হোক) আমাদের জীবনে কতটা সত্য হইয়াছে।

এই বৈষম্য-নিবারণে সফল হইতে হইলে প্রথমেই এই উপায় এই ব্রত লইতে হইবে যে, আমাদের নিজের কাজের ভার অপরের ঘাড়ে না চাপাইয়া যেন নিজে করিতে চেষ্টা করি। শারীরিক নানা হেয় কার্য্যে অন্যের সাহায্য আমরা লইতে যত দিন দ্বিধা বোধ করিব না, ততদিন কি দার্শনিক কি হিতানুষ্ঠানিক কোন ধর্ম্মই আমাদের সত্য হইয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিব না।

অপরের সেবা যথা সম্ভব কম গ্রহণ করা এবং যতটা বেশী অপরকে সেবা করা যায় তাহার বিধান করা, সর্ব্বাপেক্ষা কম দাবী করা ও সর্ব্বপেক্ষা বেশী দান করা, ত্যাগ করা ইহাই আমার কাছে সহজতম সরলতম নীতি।

এই নীতিই আমাদের জীবনকে একটি সুসঙ্গত তাৎপর্য্য দেয়। ইহা হইতে যে সুখ আসে তাহা সকল দ্বিধা বাধা ও সন্দেহকে ভাসাইয়া দেয়। মানুষের মানসিক বৃত্তি শিল্প-বিজ্ঞানাদির স্থান লইয়া তোমার মনে যে সমস্যা জাগিয়াছে তাহাও একদিন ঐ অনুপম তৃপ্তির প্লাবনে ভাসিয়া যাইবে। সুতরাং ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যতক্ষণ না আমরা আমাদের কাজে অপরকে উপকৃত দেখি ততক্ষণ আমরা সত্য সুখ ও তৃপ্তি অনুভব করিতে পারি না।। যাহাদের জন্য আমরা কাজ করিতেছি তাহারা যদি সুখী হয় তাহা হইলে সুখের উপর সুখ হইল। কিন্তু তাহারা যদি হুঁস নাও বা করে তাহা হইলে ও আমাদের সেবা করিয়া যাইতে হইবে। আমার আত্মতৃপ্তির ভিত্তিই যে ঐখানে—আমার কাজ অপরের কাছে নিরর্থক নয়, অকল্যাণকর নয় এই বিশ্বাসেই যে আমার সুখ।

শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কাজ ছাড়িয়া মানুষ যদি এই সাধারণের সেবার কার্য্যে নামিয়া আইসে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার সরল নৈতিক দায়িত্ববোধ আপনা হইতেই তাহাকে টানিতেছে। গ্রন্থকার বই লেখেন, ছাপিতে ছাপাখানায় মানুষদের খাটাইতে হয়; সুরজ্ঞ সংগীত

রচনা করেন, সেগুলির প্রচার করিতে কত ওস্তাদ বাজনদারকে খাটান প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবেন তাঁর যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে খাটিবে কত লোক; চিত্রী ছবি আঁকিবেন তার জন্য তুলি রং পট প্রস্তুত করিতে হাজার লোক ব্যস্ত। এই সব শিল্প-বিজ্ঞানের কাজ মানুষের কাজে লাগিতে পারে, আবার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়—অনেক সময় অকল্যাণকরও হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমার একদিকে এই সব কাজ যাহার জন্য অপরকে খাটাইতে হয় অথচ যাহার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সন্দেহজনক; অন্যদিকে আর একশ্রেণীর কাজ যাহার জন্য কাহাকেও খাটাইতে হয় না, অথচ যাহার সবগুলিই মানুষের উপকারে আসিবে। এমনি কত কাজ চারিদিকে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের টানিতেছে! ঐ দেখ, কে একজন শ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতেছে—উহার বোঝাটা খানিক বও; গরীব চাষী রোগে অকর্ম্মণ্য তার ক্ষেতের খানিক কাজ করিয়া দাও;—এমনি কত সহস্র ছোটখাট সেবার আহ্বান চারিদিক হইতে আসিতেছে, সেগুলি করিতে কারো সাহায্য দরকার নাই। একা করিয়া যাও। তখনি যে সেবা করিল এবং যাহার সেবা করা হইল দুজনেই পরম তৃপ্তি পাইবে। নিজের হাতে গাছ পোঁতা, পশুদের সেবা করা, কূপ পরিশোধন করা এই সব কাজে মানুষের উপকার যে হইবে তার সন্দেহ নাই; সুতরাং এ রকম কাজে প্রত্যেক খাঁটি মানুষের আগেই যাওয়া উচিত। অনেক কাজই সবার সেরা বলিয়া বড় গলায় প্রচার করা হয়, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়, তাহার অনেক-গুলাই ভুয়ো।

ভবিষ্যদ্দর্শী ঋষিদের স্থান আমাদের মাথার উপরে; কিন্তু ঐ নামটায় যথেষ্ট সুবিধা হয়। যে-সব ধর্ম্মব্যবসায়ী ঋষিত্বের মুখোস পরিয়া ভাবে—তাহারা সত্যই ঋষি হইয়াছে বলিয়া তেমন লোকের অভাব এ জগতে নাই এবং তাহারা বেশ ঋষির ব্যবসা চালাইতেছে।

শিক্ষার বলে কেহ ঋষি হইতে পারে না। যাঁহার গভীর বিশ্বাস আছে যে, সত্য তাঁহার ভিতর দিয়া প্রকাশ হইবেই, সত্যের বাহন না হইয়া, তাঁর উপায় নাই—এমন মানুষই ঋষি হন। এই বিশ্বাস কম মানুষের

মধ্যেই দেখা যায় এবং এই বিশ্বাসসিদ্ধ হইতে হইলে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। খাঁটি শিল্প, খাটি বিজ্ঞান এই ত্যাগ আত্মোৎসর্গের উপর গড়িয়া উঠে। প্রসিদ্ধ গুণী লুল্লী (Lulli) যখন পাচকের স্থায়ী কাজ ছাড়িয়া, বেহালা হাতে করিয়া অনিশ্চয়তার বুকে ঝাঁপ দেন, কত বিপদ কত দুঃখ তাঁকে ঘিরিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যেই সংগীততত্ত্বের আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিয়া সহস্র ত্যাগের দ্বারা তিনি তাঁহার গুণী নাম স্বার্থক করিয়াছেন, তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু সংগীতপরিষদের যে মামুলী ছাত্র মামুলী গৎ বাজাইয়া তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল ভাবে, কোথায় তার ত্যাগের অবকাশ? তাহার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ত দেখি না, শুধু দেখি বেশ আরামে তার সৌখীন অবস্থাটি উপভোগ করিয়াই সে খুসী।

হাতের কাজ, একদিকে প্রত্যেক মানুষের একটি কর্ত্তব্য, অন্যদিকে সেটি বহুলোকের জীবনে আশীর্ব্বাদের মত হইয়া আছে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে মস্তিষ্কের কাজ অল্পসংখ্যক লোকের অধিকার ও কল্যাণের আধার। কাহার উহাতে অধিকার আছে, কাহার নাই তাহার বিচার হইবে ত্যাগের দ্বারা। শিল্পী বা পণ্ডিত তাহার আদর্শ স্থাপনের জন্য তাহার অবকাশ ও তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য কতটা উৎসর্গ করিয়াছে? যে মানুষ হাতের কাজ করিয়া আপনার ও স্বজনবর্গের জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং সেই সঙ্গে তাঁর ক্ষুদ্র বিশ্রামক্ষণ, তার নিদ্রার সময়টুকুও চিন্তা ও সৃষ্টিকর্ম্মে নিয়োজিত করে সেই সত্য মানসিক ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার অধিকারটি প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু যে মানুষ সহজ নৈতিক দায়িত্ব এড়াইয়া, শিল্পবিজ্ঞান-প্রীতির অছিলা করিয়া সমস্ত তরুর পরগাছা হইয়া বাঁচিতে চায়, সে শুধু মেকীশিল্প ও ঠুঁটো বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি করিবে। খাটি শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস সুখ সুবিধা নয়—আত্মদান।

"কিন্তু তাহা হইলে শিল্পবিজ্ঞানের দশা কি হইবে?" এই প্রশ্ন কতবার শুনিয়াছি! এমন লোকেরা প্রশ্ন করেন যাঁদের না আছে শিল্প-বিজ্ঞানের বালাই না আছে উহাদের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারনা। প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয় যেন বিশ্ব-মানবহিত ছাড়া তাঁহাদের অন্য চিন্তা নাই—

যেন তাঁহাদের মনগড়া শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি ছাড়া মানব সভ্যতার আর উন্নতি নাই। শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, এমন সুবুদ্ধি মানুষের অভাব নাই, আবার এমন মজার লোকও আছে যে সেটা স্বীকার করানই জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে! এমন মতভেদ হয় কেন? ঐ ত চাষী চাষ করিতেছে, মজুর খাটিতেছে, কৈ তাহাদের কাজের আবশ্যকতাটা অস্বীকার ত কেউ করে না। আবার তাহার প্রয়োজনীয়তাটা প্রমাণ করিতেও কেউ ক্ষেপে না। কাজ হইয়া যায়—কাজটা দরকারী এবং সকলেরই তাহাতে উপকার এটা আমরা বুঝি, ইহার আবশ্যকতায় আমরা সন্দিহান হই না, সেটা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হওয়া ত দূরের কথা! শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কর্ম্মীদেরও ঠিক এক অবস্থা, তবু তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তাটা প্রমাণ করিতে এত লোক এত গলদঘর্ম্ম হয় কেন?

আসল কথাটা এই:—খাঁটি কর্ম্মী শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ অধিকারের দাবী করে না, তাহারা সৃষ্টি করিয়া যায়, সেই সৃষ্টিতে সকলের কল্যাণ হয় সেই যথেষ্ট; তাহার জন্য কোনও দাবী দাওয়া অথবা তার দলিল ও প্রমাণের দরকার আছে তাহা ভাবে না। কিন্তু তথাকথিত অনেক পণ্ডিত ও শিল্পী যাহারা জানে যে, সমাজের যত জিনিষ গ্রাস তাহারা করে তার তুলনায় তাহাদের সৃষ্টি একেবারেই নগণ্য, তারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, তাহাদের কাজ ছাড়া বিশ্ব-মানবের কল্যাণ আর নাই! এই জায়গায় বুজরুকদের দলের সঙ্গে ওদের একটা মিল দেখা যায়। খাঁটি শিল্প খাঁটি বিজ্ঞান মানুষের অন্য কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মতন চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা বা অপ্রমাণ করা দুই নিরর্থক। বিজ্ঞান ও শিল্প যে আজ সমাজের মিথ্যার মুখোস পরিয়া ভণ্ডামি করিতেছে তাহার একটা গুরুতর কারণ এই যে শিল্পী জ্ঞানী প্রভৃতি তথাকথিত "সভ্য" দল সকলে মিলিয়া একটা নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্মান্ধ বুজরুকদের মত গর্ব্বান্ধ এই দলটি আভিজাত্যের মোহে অধীর! এদের জাতটা মামুলী জাতের মতই অশুভকর, কারণ যে আদর্শের দোহাই দিয়া এরা জাতিভেদ সৃষ্টি

করে সেই আদর্শই ইহাতে ধূলায় লুটাইতে থাকে। সেই জন্যই খাঁটি ধর্ম্মবিজ্ঞানের জায়গায় মেকিতে সমাজ ভরিয়া যাইতেছে।

শিল্প ও সাহিত্য এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অপরাধ করিয়াছে; যে বস্তু সাধারণ মানুষকে পৌঁছাইয়া দিবার ব্রত লইয়া শিল্প ও সাহিত্য আবির্ভূত হয় এবং যাহা প্রচার করিতে মহা ব্যস্ত বলিয়া ভাণ করে ঠিক সেই বস্তু হইতে শিল্প ও সাহিত্যই মানুষকে কতটা বঞ্চিত করিয়াছে ভাবিলে লজ্জা হয়। অথচ অন্ততঃ মুখেও যে দায়িত্বটা স্বীকার করে তাহাতেই প্রমাণ হয় তথা-কথিত শিল্প ও সাহিত্য কত অপরাধী ও নৈতিক দায়িত্ব-বোধে কত দুর্ব্বল। "শিল্পের জন্যই শিল্প" "বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান" বলিয়া একদল লোক কত বুলিই কপ্‌চাইল। কিন্তু এখন মানুষ বুঝিয়াছে, তাদের সার্থকতা এইখানে যে শিল্প-বিজ্ঞান নিখিল মানবের চিরন্তন উত্তরাধিকারী, সকল মানুষেরই উহাতে অধিকার আছে এটি সভ্যতার পাণ্ডাদের স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কখন ঐ বস্তুগুলি কি মানবের চিরন্তন সম্পত্তি হইয়া উঠে? আসল আর ঝুটোর মধ্যে প্রভেদটা ধরা যায় কিরূপে? এসব প্রশ্নের জবাব ত বড় একটা দেন না! বরং তাঁহারা চাল দিয়া বুঝাইতে চান যে, সত্য সুন্দর ও কল্যাণ যে আসলে কি তাহা প্রকাশ করা যায় না; তাহাদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা শক্ত। কিন্তু এটা মিথ্যা কথা। যুগে যুগে বিশ্বমানব তার অপরিসীম বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যদি কিছু করিয়া থাকে ত সে এই সুন্দর ও কল্যাণের ধ্যান ও ধারণা। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি সভ্যতার পাণ্ডাদের পক্ষে সুবিধার হয় না, কারণ ইহা প্রমাণ করিয়া দেয় যে সুন্দর ও কল্যাণকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের জায়গায় শিল্প ও বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা শুধু নিরর্থক নয়—অনিষ্টকর। যুগে যুগে মানুষ শিবসুন্দরের রূপটি নির্দ্ধারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সাধকগণ, চীন ইহুদী ও মিশর-দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানীর দল, গ্রীক দর্শন ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রত্যেকই স্পষ্টভাবে শিবসুন্দরের ধ্যান-ধারণার সাক্ষ্য দিতেছেন। যাহা কিছু মানুষকে মানুষের সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া মিলিতে সাহায্য করে তাহাই শিব-সুন্দরের দান; যাহা কিছু ভেদের সৃষ্টি করে তাহাই অশিব, তাহাই অসুন্দর। এই অমোঘ মন্ত্রটি সকল জীবই জানে, সকলের প্রাণে ইহা গ্রথিত আছে। টলষ্টয়

(ক্রমশঃ)   (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের সেবাকার্য্যের হিসাব

(১৯২৬ সালের জুন হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত)

সাঁওতাল পরগণায় দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্য (জুন হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত)—

জামতাড়ায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ৩৩টি গ্রামের ৭১৯ জন দুঃস্থ অধিবাসীকে ২২৩ মণ ২৬ সের ৮ ছটাক চাউল, ৩ মণ ডাল, ১২২ মণ চানা, ৬০ মণ বীজধান্য এবং ২০ মণ লবণ বিতরণ করা হইয়াছে। নূতন বস্ত্র ৫০ এবং পুরাতন বস্ত্র ৭৫২ খানাও বিতরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পানীয় জলের জন্য ২২টি কূপ খনন এবং একটি পুষ্করিণী খনন এবং একটি পুষ্করিণীর সংস্কার করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে দুঃস্থ লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়া চাউল দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে।

মেদিনীপুর দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্য (জুলাই)—

পাইকমাঝিটা নামক স্থানে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ৪৫টি গ্রামের ১০৭৭ জন দুঃস্থ অধিবাসীকে ১৩৬ মণ চাউল বিতরণ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত কেন্দ্রদ্বয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব :—

চাঁদা দ্বারা প্রাপ্ত—১৫৯০॥৵১৫, দ্রব্য-বিক্রয়—৪৸৶০, রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রভিডেণ্ট রিলিফ ফাণ্ড হইতে প্রাপ্ত—২৪০১॥৫, মোট আয় ৩৯৯৭৶০।

খরচ—চাউল খরিদ—২৩১২॥/০, অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য খরিদ—৬৩০৸/১৫, বস্ত্র খরিদ—৪৯।/০, মাল সরবরাহ খরচ—৬৮।৶০, পাথেয় এবং পরিদর্শন খরচ—১৬৬৸/১৫, সাজসরঞ্জাম খরচ—৬॥৵১০, সেবকদিগের খরচ (৯ জন সেবক)—১০১৸৫, পাচক প্রভৃতির বেতন—১৯৶১০, ষ্টেশনারি—৫৸৵১৫, ডাক খরচ—২৫৸০, ছাপাইবার খরচ—৬৵০, আর্থিক সাহায্য—৫৭॥১০, ঔষধ ইত্যাদি—৮৵৫, পানীয় জলের জন্য ব্যয়—১৫।৫, কৃষিকার্য্যের জন্য সাহায্য—২৪১৲, গৃহ নির্ম্মাণের জন্য দান—২৬৮৲, থলে—৭৸/০, বিবিধ—৫৸৶১০ ; মোট খরচ—৩৯৯৭৶০।

মেদিনীপুর বন্যা-সেবাকার্য্য (২২শে আগষ্ট হইতে ১৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত)—

মেদিনীপুর জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৫টি কেন্দ্র হইতে ১১০টি গ্রামের ৫২১৮ জন দুঃস্থ অধিবাসীকে ২১০৬ মণ ২৭ সের চাউল, ২৫ মণ ১৫ সের চিড়া এবং ১ মণ লবণ বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৪০৫ খানা নূতন এবং ১৯৭১ খানা পুরাতন বস্ত্রও বিতরণ করা হইয়াছে।

মেদিনীপুর বন্যা-সেবাকার্য্যের আয়-ব্যয় :—

প্রাপ্ত চাঁদা—১৫৮২৪৸৴২॥, দ্রব্য বিক্রয়—৫১৯।৫, রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রভিডেণ্ট রিলিফ ফাণ্ড হইতে প্রাপ্ত—২১০০৵৫ ; মোট—১৮৪৪৪।১২॥০ ।

খরচ—

চাউল খরিদ—১৪৭০০৴৫, অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য—৪১৩৶১৫, বস্ত্র খরিদ—৯৭০৸০, থলে খরিদ—২৩১৶১৫, মাল সরবরাহ খরচ—৬১০।৫, পাথেয় এবং পরিদর্শন খরচ—৪৬৭৲১০, সাজসরঞ্জাম—২২৩॥৶৫, সেবকদিগের খরচ (২০ জন সেবক)—৬১৯৸১২॥, পাচকাদির বেতন—৭০।৶১৫, ষ্টেশনারী—১১৸৵৫, ডাক খরচ—৭০।৴০, আর্থিক সাহায্য—২৫॥৴০, ঔষধাদি—৩৲, বিবিধ খরচ—২৭৶৫ ; মোট—১৮,৪৪৪।১২॥০ ।

এই হিসাব, গভর্ণমেণ্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম, এ, মহাশয়ের দ্বারা ১৯২৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং নির্ভুল সাব্যস্ত হইয়াছে।

আমরা নানা কারণে এই হিসাব যথাসময়ে প্রকাশিত করিতে পারি নাই।

(স্বাঃ) শুদ্ধানন্দ
সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন

সংঘ-বার্ত্তা

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

আগামী ২৯শে অগ্রহায়ণ ইং ১৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথিতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পঞ্চসপ্ততিতম জন্ম-তিথি। বেলুড়-মঠে এবং কলিকাতা, বাগবাজার, বসুপাড়া, ৫নং নিবেদিতা লেনস্থ নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়-বাটীতে তদুপলক্ষে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হইবে। পুরুষ-ভক্তগণ ঐ দিবস বেলুড়-মঠে এবং স্ত্রী-ভক্তেরা উক্ত বিদ্যালয়-বাটীতে আগমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর পুণ্য-দর্শন ও প্রসাদ-লাভে ধন্য হইবেন।

স্বামী সুরেশ্বরানন্দ

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী সুরেশ্বরানন্দ বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ অনুমান ষাট বৎসর বয়ঃক্রমে বহরমপুরে শরীর ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর অভয়-পদে লীন হইয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান—মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা (কলিকাতা)। পিতার নাম (স্বর্গীয়) পরমেশ্বর বসু; জ্যেষ্ঠতাত অমৃতলাল বসু মহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজের সভ্য ছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। বেলুড়-মঠের প্রথম সময়ে পূজ্যপাদ স্বামিজীর জন্মোৎসবের সমস্ত কার্য্যভার স্বামী সুরেশ্বরানন্দ বহন করিতেন।

সমালোচনা

সরল মহাভারত—শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—শ্রীসুখদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ৩নং সুরাফার্ষ্ট লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা।

বালক-বালিকাদের উপযোগী সরল ভাষায় সুললিত ছন্দে মূলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া ইহা রচিত। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। কয়েকখানি ছবিও পুস্তকের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে।

হালুম বুড়ো—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল্য দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান—'প্রবাসী' কার্য্যালয়। ৯১ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। কবি, শিশুদিগকে আনন্দ দিবার জন্য এই

কবিতার বহি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে 'শিবের বিয়ে', 'ঘুম-পাড়ানি গান', 'বারো মাসের পেট-পুজো', 'দুষ্টু মেয়ের দুষ্টু পুতুল', 'খাটের তলায় ব্যাং', 'বর্ষার চড়ুই' প্রভৃতি অনেকগুলি মজার কবিতা আছে। 'হালুম বুড়ো'র একটু নমুনা দিই,—

"এক যে আছে হালুম বুড়ো নাকটা যে তার থেঁদা,
সেই নাকেতে আছে একটা মস্ত বড় ছেঁদা,
সেই ছেঁদাতে ঝুলছে যে এক বাল্‌তি এত বড়,
বাল্‌তি-ভরা আছে তিনটে কাঁকড়া করা জড়ো।

* * * *

বাল্‌তি থেকে কাঁকড়া তখন কামড় লাগায় কট্‌,
ঘুমোও ঘুমোও দুষ্টু ছেলে ঘুমোও গো চট্‌ পট্‌।
না না না দুষ্টু ত নয় লক্ষ্মী ছেলে যে,
পালা হালুম, এই ত খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে॥"

পুস্তকের প্রচ্ছদপট শিশুদের ভয়োদ্দীপক, ভিতরে অনেকগুলি হাস্যোদ্দীপক ছবিও আছে।

কার্য্য-বিবরণী

রামকৃষ্ণ-মিশন-আশ্রম (সারিষা—ডায়মণ্ড হারবার)-এর ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সালের কার্য্য-বিবরণী। আশ্রমে একটি প্রাইমারী স্কুল আছে, ছাত্র সংখ্যা ৭৫ জন। ছাত্রগণকে বস্ত্রবয়ন-শিল্পও শিক্ষা দেওয়া হয়। পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত অভাব। তাই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে আশ্রম একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। ছাত্রী-সংখ্যা বর্ত্তমানে ৫৫ জন। একটি স্থায়ী এবং বড় স্কুলগৃহ নির্ম্মিত হইলে ছাত্রীসংখ্যা ন্যূনপক্ষে ১০০ জন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, আশ্রমকর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ আশা করেন।

১৯২৫ সালে ৮৪৭ জন এবং ১৯২৬ সালে ১৪৪৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। আশ্রম হইতে কয়েকটি দরিদ্র বালকের স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা হয়। ১৯২৫ সালে ১২৭ খানি এবং ১৯২৬ সালে ১৬৬ খানি কম্বল দুঃস্থ নরনারীগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। আশ্রম-কর্ম্মিগণ কয়েকটি বসন্ত রোগীর সেবা করিয়াছেন। পুস্তকাগারে ৭০০ পুস্তক আছে এবং অনেকগুলি ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক ও মাসিকপত্র নিয়মিতরূপে আসে। আশ্রমের অধ্যক্ষ পল্লীবালকগণের মধ্যে বয়-স্কাউটের দল গঠন করিয়াছেন। ১৯২৫ সালে আশ্রমের আয় এবং ব্যয় ৩৭৫৪৷৷০ আনা এবং ১৯২৬ সালে আয় এবং ব্যয় ৪৭৪৬৷৵০ আনা।

শেষ নিবেদন

আজ শেষ ;
জীবনের যত কাজ, পৃথিবীর যত সন্তাপেরে
আপনার বক্ষভরে হাসিমুখে সকলি গ্রহণ,
অশ্রুধারা-সিক্ত এই মেদিনীর দুঃসহ বেদন,
আপনার করে নিয়ে জুড়াবার যত আকিঞ্চন,
সবি শেষ ; প্রভুপদে যোগ-মগ্ন, হে তাপস,
শেষ এই আত্ম-সমর্পণ
নেহারি অধীর বিশ্ব খোঁজে তোমা শোকেতে মগন।

পূরবে পশ্চিমে যেথা শুয়ে আছে অতল পাথার
তাদেরো কেঁপেছে বুক, খোঁজে তোমা ধূ ধূ পারাবার,
ব্যথিত ক্রন্দন-ভরা 'রোদসী'র ভাষা নাহি আর
হিমালয়-শৃঙ্গ-চূড়ে কাঁদে থির বরণ-বিথার।

ওগো মহারাজ,
জানি মোরা নাই শোক, নাই তাপ, এই তব শেষ
অভিসার, মরণের যেথা পরাজয়, যেথা তার লয়,
দরদী পথের পানে যেথা চেয়ে স্তব্ধ নির্নিমেষ,
—এ পূজা তাঁহার, শেষ অর্ঘ্যভার, মৃত্যু কভু নয়।

তবুও মোদের
এই হাহাকার, শোক, চিরন্তন চাহে করিবার
এ আকাঙ্ক্ষা—বার বার অমৃতের সঙ্গ লভিবার ;
বার বার এ কামনা ও-পদাঙ্ক বক্ষে বহিবার ;
হে জীবন-মরণ-সম্রাট্ ! এ জগৎ চাহে শুধু তাই
বিদায়ের ভাষা তার নাই।

আবার যখন
আসিবে আঁধার রাত, ভুলে যাবো জীবনের ভাষা
যেদিন পথের পরে ঘনাবে বিপদ ঘোর পুনঃ
সেদিন চাহিয়া দেখো, ওগো স্বামি, হে মোদের আশা !
এই শেষ চাহি মোরা—এই শুধু শেষ নিবেদন।

শ্রীদয়াময় মিত্র

6৭১ ·১ ——

Printed by: MANMATHA NATH DASS,
SRI GOURANGA PRESS, 71/1, Mirzapur Street Calcutta
Published by: BRAHMACHARI KAPILA,
Udbodhan Office 1, Mukharji Lane, Calcutta